প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমন্মথনাথ পান কর্তৃক কে. এম. প্রেস
১।১ দীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

ভূমিকা

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমাদের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছি। তাহাদের মূল্য যাহাই হউক বন্ধুবান্ধবদের আগ্রহে বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলিকে একত্র করিতে উৎসাহিত হই। উহাদের মধ্য হইতে কতকগুলি প্রবন্ধ বাছিয়া লইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইল। শিক্ষা ও ধর্মকর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বর্তমান গ্রন্থে ঠিক প্রাসঙ্গিক হইবে না বিবেচনা করিয়া সেগুলিকে ছাপাখানা হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছি। সুযোগমত সেগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

প্রবন্ধগুলি পত্রিকায় যে ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল সেইভাবেই গ্রন্থমধ্যে প্রকাশিত হইল—স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন করা হইয়াছে। এক বা অনুরূপ বিষয়-অবলম্বনে বিভিন্ন সময়ে লিখিত প্রবন্ধে মাঝে মাঝে কিছু কিছু পুনরুক্তি পরিলক্ষিত হইবে। পুনর্লিখিত না হইলে ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই। আশা করি, পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া এই ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

বাংলা ভাষা ও প্রাচীন বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে যাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা আছে প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসার নিবৃত্তি হইবে না সত্য, কিন্তু আলোচনার কিছু নূতন উপাদান সংগৃহীত হইতে পারিবে মনে হয়। তাহা সম্ভবপর হইলেই গ্রন্থপ্রকাশের চেষ্টা সার্থক বলিয়া মনে করিব।

গ্রন্থের প্রকাশক কল্যাণভাজন শ্রীমান্ প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক অগ্রণী হইয়া গ্রন্থ-প্রকাশ ত্বরান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মিণী আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্রী শ্রীমতী কল্যাণীর নীরব আগ্রহও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আমি সর্বান্তঃকরণে তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করি।

বর্ষারম্ভ
১৩৬৭

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বিষয়সূচী

পত্রিকাসূচী

সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা

ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা	১৩৩৭ চতুর্থ সংখ্যা
বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ	১৩৩৯ চতুর্থ সংখ্যা
বঙ্গে সূর্যপূজা ও সূর্যের নূতন পাঁচালি	১৩৪০ প্রথম সংখ্যা ১৩৪১ তৃতীয় সংখ্যা
সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা	১৩৪৪ প্রথম সংখ্যা
চোরের পাঁচালি	১৩৪৫ চতুর্থ সংখ্যা
পাঁচুঠাকুরের পাঁচালি	১৩৪৬ দ্বিতীয় সংখ্যা
বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ	১৩৪৯ চতুর্থ সংখ্যা
ত্রিনাথ	১৩৫২ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা
বাংলার পুরাণকাহিনী	১৩৫৬ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা
বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	১৩৫৭ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা
পুথির শেষ কথা	১৩৫৭ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা

প্রবাসী

বর্তমান বাংলা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ	১৩৩৯ .বশাখ
বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মুসলমানী রূপ	১৩৪০ শ্রাবণ
সেকালে পণ্ডিতের আদর	১৩৪০ কার্কিক
পুথির কথা	১৩৪৬ শ্রাবণ
স্বাধীন দেশে বাংলা ভাষা	
'প্রবাসী'তে নাম ('স্বাধীনতা ও বাংলা ভাষা')	১৩৫৪ কার্তিক
ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ	১৩৫৪ মাঘ
বাংলা পরিভাষা	১৩৫৫ শ্রাবণ
শুভারম্ভ	১৩৫৯ বৈশাখ
আধুনিক বাংলা ভাষা	১৩৬০ আষাঢ়
প্রকীর্ণ কোষ	১৩৬২ শ্রাবণ
বাংলা অভিধান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	১৩৬৩ শ্রাবণ

মাসিক বসুমতী

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য — ১৩৬১ কার্তিক

দেশ

বিজ্ঞাপনে বাংলা শব্দ — ১৩৪২, ২৬ পৌষ

সাহানা

রেল ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র — ১৩৪৪ পৌষালী সংখ্যা

সাহিত্যপত্রিকা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য চর্চা — তৃতীয় বর্ষ (১৩৬৬) দ্বিতীয় সংখ্যা

শতবর্ষোৎসব স্মারক গ্রন্থ (কৃষ্ণনগর কলেজ)

উনবিংশ শতাব্দী ও বাংলা ভাষা — ১৯৪৮

শতদল (কৃষ্ণনগর সাহিত্যসঙ্গীতি)

সাহিত্যে শিক্ষানবিশি — ১৩৪৯

বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ ও রামেন্দ্রসুন্দর স্বতন্ত্র বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন[১]। এই ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণকে সর্বথা উপেক্ষা করিবে না সত্য, তবে অন্ধভাবে হুবহু অনুকরণও করিবে না। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'বাংলা ভাষা বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে চলে এবং সে-ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা শাসিত নহে' (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২।৫৭৮)। বস্তুতঃ 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ কিয়দংশে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ, কিয়দংশে নহে'[২]। মোটামুটি ভাবে, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে সংস্কৃতের নিয়ম চলিবে ; সে নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।...কিন্তু বাঙ্গালা শব্দের প্রয়োগে বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়ম চলিবে। সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণ অগ্রাহ্য।'[৩] তবে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগেও বাংলা ভাষায় সকল ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রাচীন নিয়ম যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হইবে, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। নানা প্রসঙ্গে সংস্কৃতের নিয়ম উপেক্ষিত ও লঙ্ঘিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই নিয়মলঙ্ঘন অবশ্যই নিছক যথেচ্ছচারিতার পরিচায়ক নহে। অজ্ঞতা ইহার মুখ্য কারণ সন্দেহ নাই—তবে অনেক ক্ষেত্রে ইহার অন্তরালেও যে একটা ভাষাতত্ত্ব-সম্মত যুক্তি, শৃঙ্খলা ও নবীন নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারা যায়, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেবল দোষদর্শন বৈয়াকরণের কার্য নহে—বহুল প্রচলিত প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে যতই নিয়ম-বিরুদ্ধ হউক না কেন, প্রাচীন নিয়মকে একটু ব্যাপক ও শিথিল করিয়া বা নূতন নিয়ম আবিষ্কার করিয়া তাহার সমর্থনের চেষ্টা বৈয়াকরণের অবশ্যকর্তব্য

১। রবীন্দ্র-রচনাবলী—দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ৫৬৪, ৬৩১। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১, ২০১।

২। যোগেশচন্দ্র রায়—বাঙ্গালা ভাষা, পৃঃ ১০৮।

৩। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—শব্দকথা, পৃঃ ১৫৭।

কর্ম। ইহা ব্যক্তিগত মতবাদ মাত্র নহে, ইহা সর্ববাদিসম্মত সত্য। তাই প্রাচীনেরা বলিতেন 'স্থিতের্গতিশ্চিন্তনীয়া'—যাহা বর্তমান, যাহা প্রচলিত তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জন্যই দেখা যায়—অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের নূতন নূতন প্রয়োগ সমর্থনের জন্য বিভিন্ন বৈয়াকরণ অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, নানারূপ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—সহসা কোন প্রয়োগকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন নাই। এ বিষয়ে বাংলা ব্যাকরণ-রচয়িতার কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বাংলা ব্যাকরণের লক্ষ্যনির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'[বাংলা ভাষা] সংস্কৃত ও অন্য ভাষার আমদানিকে কি ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য বাংলা ব্যাকরণ' (রবীন্দ্র-রচনাবলী—১২।৫৬৯)।

দুঃখের বিষয়, প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলিতে এ দিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। সংস্কৃত নিয়মানুসারে খাঁটি বাংলা প্রয়োগের বিশ্লেষণেও অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের তাৎপর্য উপেক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলা ব্যাকরণের এইরূপ কয়েকটি প্রসঙ্গের প্রতি বৈয়াকরণ-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা যাইতেছে। সংস্কৃত ব্যকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যে সকল শব্দ গঠিত হইয়াছে, তাহাদের পূর্ণ সমর্থন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণকে উপেক্ষা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন করাই আমার কার্য। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই ব্যাকরণবিরোধী শব্দ চালাইতে পারিবেন, এমন কথাও বলা চলে না। বহুপ্রচলিত শব্দগুলিই আমার আলোচনার বিষয়। বৈয়াকরণ বা আভিধানিক কেহই এগুলি উপেক্ষা করিতে পারেন না। বস্তুতঃ উপেক্ষিত হইলেই যে সেগুলি আর ব্যবহৃত হইবে না, এমনও বলা চলে না। কয়েক বৎসব পূর্বে (১৩৫০ শ্রাবণ) 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমি এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলাম। বর্তমান ক্ষেত্রে নূতন উপাদান-সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য।

ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রকরণ অনুসারে আমার বক্তব্যগুলি সজ্জিত করিয়াছি। প্রত্যেক প্রকরণে এতদতিরিক্ত খুঁটিনাটি আরও অনেক বিচার্য বিষয় আছে। একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরের মধ্যে তাহাদের সকলের স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। অথচ বাংলা ব্যাকরণকে তাহার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার প্রয়োজন। বিভিন্ন লেখকের লেখা বাংলা

ব্যাকরণের মধ্যে যে পারস্পরিক বিরোধ ও অনৈক্য রহিয়াছে, তাহাদেরও সুমীমাংসার চেষ্টা করার সময় আসিয়াছে। এ জন্য বাংলা ভাষারসিক ব্যক্তি-মাত্রের আগ্রহ ও সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

সন্ধি।—উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংস্কৃতের সন্ধির নিয়ম অনেক ক্ষেত্রে বাংলায় উপেক্ষিত হয়। সমাসবদ্ধ পদসমষ্টির মধ্যে সকল স্থানে পরস্পর সন্ধি না করার একটা প্রথা বর্তমানে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ আধুনিক বাংলায় এরূপ স্থলে সন্ধি করিলেই যেন বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। সত্য সত্যই ব্যাকরণের শাসন সত্ত্বেও 'প্রতিষ্ঠা-উৎসব', 'প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষ্যে' না বলিয়া 'প্রতিষ্ঠোৎসব', 'প্রতিষ্ঠোপলক্ষ্যে' বলিলে কানে ঠেকিবে। অন্য দিকে সন্ধি না করিলে শব্দের আয়তন সংক্ষেপ না হওয়ায় উহার ধ্বনিগাম্ভীর্য সুরক্ষিত হয়।

বিসর্গ স্থানে 'র' প্রভৃতির ব্যবস্থা বাঙালির নিকট অনেক ক্ষেত্রে শ্রুতিকটুতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। খাঁটি বাংলা শব্দে বিসর্গ নাই—শব্দের অন্তে বিসর্গের উচ্চারণ দুঃসাধ্য। তাই বিসর্গ এখন বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হইতেছে। চক্ষুদান, চক্ষু চিকিৎসা, চক্ষুগোচর, চক্ষুরোগ, জ্যোতি-ভূষণ, তেজী, মনান্তর প্রভৃতি বহু শব্দে বাঙালি বিসর্গকে বেমালুম বাদ দিয়া দিয়াছে। 'মনঃকষ্ট' বিসর্গের সহিত উচ্চারণ করা কঠিন বলিয়া বাঙালি উহাকে 'মনোকষ্ট' করিয়া লইয়াছে। মনোমোহন, জগন্মোহন, জগদ্‌বন্ধু উচ্চারণের সুবিধার জন্য তাহাঁর কাছে মন্‌মোহন, জগমোহন, জগবন্ধু রূপ ধারণ করিয়াছে। সাহিত্যের ভাষায় সর্বত্র এরূপ লেখার ব্যবহার না থাকিলেও শব্দগুলি বাংলা ভাষার প্রকৃতি নির্দেশ করে সন্দেহ নাই।

সমাস।—প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলিতে বাংলা পদের সমাস নিরূপণে সাধারণতঃ সংস্কৃত নিয়মই অনুসৃত হইয়াছে সত্য, তবে খুঁটিনাটি বিষয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত যে বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা অবশ্যকরণীয়। এই প্রসঙ্গে তৎপুরুষ সমাসের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৎপুরুষ সমাসের বিভিন্ন বিভাগে যে সমস্ত উদাহরণ সাধারণতঃ প্রদত্ত হইয়া থাকে, সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিলে সেগুলি ঠিক সেই সমস্ত বিভাগের মধ্যে পড়ে কি না, তাহা বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। খাঁটি বাংলা শব্দের প্রসঙ্গে তৎপুরুষের শ্রেণী-বিভাগের সমস্যা কঠিন। বাংলায় প্রথমা, দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি না থাকায় দ্বিতীয়ান্তাদি পদের সহিত বিহিত

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ এ জাতীয় নির্দেশে অসুবিধা আছে। এই অসুবিধা এড়াইবার জন্যই বোধ হয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় এরূপ নামকরণ করেন নাই। বস্তুতঃ তিনি কোনও নামই দেন নাই—পূর্ব-পদের কারকের নাম উল্লেখ করিয়া কর্মকারকে, করণকারকে, সম্প্রদানকারকে প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে তৎপুরুষের উদাহরণ দিয়াছেন (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ ২১৫)। কিন্তু সমস্যার সমাধান ইহাতেও হয় নাই—এ পদ্ধতি অন্য কেহ অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়াও জানি না। কারক বা বিভক্তি যে অনুসারেই শ্রেণী-বিভাগ করা হউক না কেন, প্রচলিত ব্যাকরণগুলিতে যে সব উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের অনেকগুলি সংস্কৃত নিয়মবিরোধী—কোন কোন স্থলে বাংলা বিশ্লেষণেও তাহাদের অসঙ্গতি ধরা পড়ে। দ্বিতীয়া তৎপুরুষের দৃষ্টান্তগুলির ব্যাসবাক্য বাংলা ভাষায় একরূপ অচল—কাপড়কে ধোয়া, ভাতকে খাওয়া, বাসনকে মাজা আমরা কখনও ভাষায় ব্যবহার করি না। পক্ষান্তরে সাধু ভাষায় পরিবর্তিত করিলে এই শব্দগুলিকে আর দ্বিতীয়া তৎপুরুষের দৃষ্টান্ত বলা যায় না—'বস্ত্রধাবন' নিঃসন্দেহে সকলেই ষষ্ঠীতৎপুরুষনিষ্পন্ন বলিবেন। অবশ্য কাপড়ের ধোয়া, বাসনের মাজা এরূপ কথাও আমরা ভাষায় ব্যবহার করি না। তবে ঐরূপ ব্যাসবাক্য দেখাইয়া ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস বলিলে যুক্তি-সঙ্গত হয় এবং সাধু ভাষার সহিত সামঞ্জস্য বজায় থাকে। চতুর্থী তৎপুরুষরূপে নির্দিষ্ট বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত নিয়মানুসারে ষষ্ঠীতৎপুরুষনিষ্পন্ন। সুতরাং বাংলায়ও সেইরূপ বলাই সঙ্গত। গৃহহারা, ঘরছাড়া, গোলাভরা প্রভৃতি শব্দগুলিকে তৎপুরুষ-নিষ্পন্ন না বলিয়া বহুব্রীহিনিষ্পন্ন বলিলেই শোভন হয় বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ, 'গোলাভরা'কে সপ্তমীতৎপুরুষ বলিলে প্রকৃত তাৎপর্যই পরিস্ফুট হয় না। 'গোলায় ভরা' যে কোন পরিমাণের ধানকেই আমরা 'গোলাভরা ধান' বলি না—ভরা বা পরিপূর্ণ গোলা যাহার দ্বারা, তাহাকেই 'গোলাভরা' বলিয়া থাকি। সুতরাং এস্থলে বহুব্রীহি সুস্পষ্ট। বিশেষণের পরনিপাতও সংস্কৃত নিয়মসিদ্ধ এবং বাংলা প্রয়োগের সর্বথা অনুকূল। ঘোমটা-পরা মেয়ে, আলপনা-আঁকা দেয়াল, ফুলতোলা রুমাল, ঘরছাড়া ছেলে প্রভৃতি চলতি ভাষার শব্দ ছাড়া পট্টবস্ত্র-পরিহিত, আত্মবিস্মৃত, মতিচ্ছন্ন, নদীজপমালাধৃত প্রভৃতি সাধু ভাষার শব্দেও এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যানিধি মহাশয় তাই স্পষ্টতঃ নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন—'বাঙ্গালাতে বহুব্রীহি সমাসে বিশেষ আছে, কৃৎপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণপদ বিশেষ্যের

পরে যায়' (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ ২১৭)। এতৎসত্ত্বেও বিভিন্ন ব্যাকরণ গ্রন্থে এ জাতীয় শব্দকে যে বিভিন্ন সমাসের মধ্যে ফেলা হইয়াছে, তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ তাহাতে অর্থের সুসঙ্গতি করাও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। সমাসনিরূপণের সময় অর্থের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার[৪]—অর্থসঙ্গতি থাকিলে একই পদকে বিভিন্ন সমাসসিদ্ধ বলিতেও কোন আপত্তি নাই।

যত দিন সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞাগুলি ব্যবহৃত হইবে, তত দিন সংস্কৃতের নিয়ম একেবারে উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। সংস্কৃত নিয়মানুসারে প্রভাকর, বিভাকর প্রভৃতি শব্দে ষষ্ঠীতৎপুরুষ না বলিয়া উপপদ তৎপুরুষ বলিবার কি কারণ থাকিতে পারে? উপপদ তৎপুরুষ করিলে সংস্কৃতে এগুলির রূপ দাঁড়াইবে কর্মকার, চর্মকারের মত প্রভাকার, বিভাকার। অবশ্য ধনহীন প্রভৃতি শব্দের বেলায় হয়ত আমরা সংস্কৃত নিয়ম যথাযথ অনুসরণ না করিতেও পারি। 'ধনের দ্বারা হীন' এরূপ ব্যাসবাক্য বাংলায় অতিশয় বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। এস্থলে 'ধনে হীন' বলিয়া সপ্তমীতৎপুরুষ করিলে শোভন হইতে পারে। বক্তার অভিপ্রেত অর্থানুসারে সংস্কৃতে যখন কারক ও বিভক্তি ব্যবহারে স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে (বিবক্ষাতঃ কারকাণি ভবন্তি), তখন ইহা একেবারে সংস্কৃত-বিরোধীও হইবে না। বাংলা সমাসের বহু স্থলে এইরূপ খুঁটিনাটি আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

এইবার আপাতদৃষ্টিতে সংস্কৃত-নিয়মবিরোধী বহুলপ্রচলিত কতকগুলি শব্দের আলোচনা করিব। নির্দোষী, নিরপরাধী প্রভৃতি শব্দ বাংলা ব্যাকরণে সাধারণতঃ অশুদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। অথচ এজাতীয় অজস্র প্রয়োগ লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়—সাহিত্যিকদের লেখায়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইতে পারে—নিষ্করুণ, নির্ভাবনা, নিরাশা, নিরভিমানী, নির্লিপ্ত, নির্বিরোধী, নিরুদ্বিগ্ন, নিরুদ্দিষ্ট, নিঃসঙ্গী. নিরলস, নির্বিবাদী, নির্বারিত, নিরাসক্ত, নিশ্চঞ্চল (রবীন্দ্রনাথ)। নিরবচ্ছিন্ন, নিরবস্ত্র,

৪। যথাসম্ভব সমস্যমান পদের সাহায্যে এই অর্থ নিরূপণের চেষ্টাই ব্যাসবাক্যের কার্য। এজন্য ব্যাসবাক্যে সমস্যমান পদাতিরিক্ত নূতন পদসন্নিবেশ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। বস্তুতঃ 'খাইখরচে'র ব্যাসবাক্য 'খাওয়ার খরচ' না করিয়া 'খাইর খরচ' বলা উচিত। (খাওয়া-অর্থে খাই শব্দের প্রচলন উত্তরবঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়)। অন্যত্রও এইরূপ।

নিরশন প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতেও একেবারে অপরিচিত নয়। এরূপ ক্ষেত্রে এতগুলি শব্দকে ভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়া লাভ নাই। বরঞ্চ 'নিঃ' শব্দ এখানে অভাবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করিয়া এগুলিকে নঞ্‌ তৎপুরুষ বা প্রাদিতৎপুরুষের রূপভেদ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

সচল, সচকিত, সশঙ্কিত, সক্ষম, সঠিক, সকাতর, সকরুণ, সচঞ্চল (আনন্দের সচঞ্চল লীলা রত্নাকর—নবীনচন্দ্র) প্রভৃতি শব্দও সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অশুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বাংলায় বহুল ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদেরও একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। বস্তুতঃ এসকল স্থানে সংস্কৃত নিয়মানুসারে বহুব্রীহি সমাস হয় নাই—এখানে সংস্কৃতের মত 'স' 'সহ'র বিকৃতি নয় - ইহা বাংলায় আতিশয্যবাচক স্বতন্ত্র শব্দ বা অর্থহীন ধ্বনি মাত্র। চলতি ভাষার 'সাবকাশ' শব্দেও এই 'স'-এরই সন্ধান মিলে। বলরাম কবিশেখর তাঁহার কালিকামঙ্গলে 'সাদর করিয়া' প্রয়োগে এই 'স'ই ব্যবহার করিয়াছেন।

বাংলা শব্দে গঠিত বহুব্রীহি সমাসে অনেক স্থানে পরপদে আকারযোগের যে প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলায় ব্যবহৃত কতকগুলি সংস্কৃত শব্দেও সেই নিয়ম অনুসৃত হইতেছে দেখা যায়। অভাগা, হতভাগা, দুর্ভাগা, নির্জলা, নিষ্ফলা প্রভৃতি শব্দে ইহার দৃষ্টান্ত মিলে। অথচ সংস্কৃতমতে যেখানে আকার অভিপ্রেত, সেখানে 'ঈ'কার ব্যবহারের ঝোঁক দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সহকর্মী, স্নেহধর্মী, বিধর্মী, জীবাণুনাশধর্মী প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য ঈ-কার সংস্কৃত-মতে সমর্থন করা কঠিন। অবশ্য সংস্কৃতেও সহধর্মিণী শব্দের প্রয়োগ আছে। সমাসান্তবর্তী বিশেষণ মহৎ শব্দকে মহারূপে পরিবর্তনের বিধান সংস্কৃতে থাকিলেও বাংলায় এখন অনেকেই মহদুপকার, মহদাশয় বা মহদন্তঃকরণ ব্যক্তি লিখিতে দ্বিধা বোধ করেন না। অবশ্য এখনও কেহ মহৎপুরুষ শব্দ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন নাই। পক্ষান্তরে সংস্কৃতমতে অকারান্ত মহারাজ শব্দই বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইলেও বাংলায় রাজার সাদৃশ্যে মহারাজা শব্দ ব্যবহার করিতে অনেকে সঙ্কোচ বোধ করেন না। বাংলায় পন্থা একটি স্বতন্ত্র শব্দরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় কর্মপন্থা প্রভৃতির প্রয়োগ চলিতেছে। ভাষার ঐ বৈচিত্র্য প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মতই দুরবগাহ।

অনুবাদমূলক বিলাতিগন্ধি কতকগুলি শব্দের সন্তোষজনক বিশ্লেষণ দুঃসাধ্য। ইহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক, প্রাগৈতিহাসিক প্রভৃতি শব্দ উল্লেখ-

যোগ্য।[৫] বস্তুতঃ এগুলি ইংরাজির আক্ষরিক অনুবাদ—শব্দগুলির বিশ্লেষণের দ্বারা অভিপ্রেত অর্থ পাওয়া যায় না। জন্মবার্ষিকী, শতবার্ষিকী প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। মনোমুগ্ধকর, আইন অমান্যকারী, সাধ্যাতীত, সহ্যশক্তি প্রভৃতি স্থানে বিশেষণ পদগুলি বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ধরিতে হইবে। বস্তুতঃ চলতি গ্রাম্য ভাষায় কোথাও কোথাও মান্য, অমান্য ও সাধ্য স্বতন্ত্রভাবেও বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কৃৎপ্রত্যয়।—কৃৎপ্রত্যয়ের মধ্যে শতৃ, শানচ্ ও ক্ত প্রত্যয়ের ব্যবহারের বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। চলতি বাংলায় শতৃ প্রত্যয়ের বাংলা রূপের নিদর্শন উঠন্ত, পড়ন্ত, বাড়ন্ত, জ্বলন্ত, চলন্ত, ঘুমন্ত, পড়তি বেলা, উঠতি বয়স, বহতা নদী প্রভৃতি শব্দের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাহিত্যে বা সাধু ভাষায় এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয় না। তাহার স্থলে শানচ্ প্রত্যয়ের বা তাহার 'মান'রূপের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে এই প্রত্যয় কেবল আত্মনেপদী ধাতুর পরই ব্যবহৃত হইতে পারে। বাংলায় কিন্তু ইহা নির্বিচারে ব্যবহৃত হইতেছে। এমন কি, শব্দের পরও এই প্রত্যয়ের ব্যবহার করিয়া 'অস্তমান' শব্দ সৃষ্টি করা হইয়াছে। এইরূপ অবাধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হিসাবে চলমান, ভ্রাম্যমাণ, মুহ্যমান, রুধ্যমান, ভাসমান, মজ্জমান, প্রশংসমান, স্ফুটমান প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বক্ষ্যমাণ শব্দটী উল্লেখযোগ্য। আকৃতি দর্শনে কেহ কেহ ইহাকে চলমানাদি শব্দের মতই ব্যবহার করিয়া থাকেন সত্য, তবে ইহার আসল অর্থ—'যাহা বলা হইতেছে' নয়, কিন্তু 'যাহা বলা হইবে।'

ক্ত প্রত্যয় ব্যবহারে বাংলায় যে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় তাহার মধ্যে বাংলা শব্দে ধ্বনিগৌরববৃদ্ধির উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে মনে হয়। তাই মূল ধাতুকে অকারণে ণিজন্ত করা হয় এবং প্রত্যয়ের পূর্বে ই-কার যুক্ত হয়। ফলে বিস্তৃত স্থলে বিস্তারিত, প্রস্তুত স্থলে প্রস্তাবিত, অনূদিত স্থলে অনুবাদিত, খাত স্থলে খনিত, স্পৃষ্ট স্থলে স্পর্শিত, কৃষ্ট স্থলে কর্ষিত, ব্যূঢ় স্থলে বিবাহিত, আবৃত স্থলে আবরিত, আহৃত স্থলে আহরিত, ক্ষীণ স্থলে ক্ষয়িত, বিবৃত স্থলে

৫। নূতন শব্দ গঠনের সময় বিশেষ সতর্ক না হইলেই এইরূপ অসুবিধায় পড়িতে হয়। এই অসতর্কতার ফলে বর্তমানে বাংলা অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে—ইংরাজি-অভিজ্ঞ পাঠককে বহু স্থলে ইংরাজির মারফত বাংলার অর্থ করিতে হয়। ইহা বিশেষ দুঃখের কথা সন্দেহ নাই।

বিবরিত, সিক্ত স্থলে সিঞ্চিত, বিতীর্ণ স্থলে বিস্তম্বিত প্রভৃতি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

সকর্মক ধাতু ক্ত প্রত্যয়ান্ত হইলে তাহা কর্মের বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্পদষ্ট বলিতে আমরা যাহাকে দংশন করা হইয়াছে তাহাকে বুঝি, দংশনকর্তাকে বুঝি না। ক্বচিৎ ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ এই ব্যতিক্রমকে সমর্থন করিবার জন্য বিপুল আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। চলতি বাংলায় কিন্তু এইরূপ একাধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—শ্রুত আছি, জ্ঞাত আছি, তুমি ভুক্ত না অভুক্ত, তিনি স্বীকৃত হইলেন। সংস্কৃতরসিকের নিকট বাংলায় এই প্রয়োগগুলি বিশেষ কৌতূহলের বিষয় সন্দেহ নাই।

'অনীয়' প্রত্যয়ান্ত শব্দও বাংলায় কখনও কখনও কর্তাকে বুঝায়—ব্যাকরণের ভাষায় প্রত্যয়টি কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্ত—আকর্ষণীয়; তুলনীয়—লোভনীয়, রমণীয় ইত্যাদি। সিঞ্চন, সৃজন, জাগ্রত—শব্দগুলি সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও আজ বাংলায় তাহাদের অধিকার পাকা করিয়া লইয়াছে।

এই প্রসঙ্গেই নামধাতুর কয়েকটি বিচিত্র প্রয়োগের উল্লেখ করা দরকার। অবশ্য কৃৎপ্রত্যয়ের সহিতই বাংলায় এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ম্লানায়মান, ঘনায়মান, শ্যামায়মান, দীর্ঘায়িত, তরঙ্গায়িত প্রভৃতি শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণনির্দিষ্ট অর্থের সন্ধান পাওয়া গেলেও রূপায়িত, লীলায়িত এবং রবীন্দ্রনাথের বহুশাখায়িত ও অলঙ্করণরেখায়িত প্রভৃতি শব্দ নূতন অর্থে রচিত হইয়াছে মনে হয়। এখানেও শব্দকে পল্লবিত করিয়া তাহার ধ্বনি-গাম্ভীর্য সৃষ্টির প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। সুখের বিষয়, এইরূপভাবে নূতন রচিত উদ্বেলিত, ব্যাকুলিত শব্দ আপাতদৃষ্টিতে অশুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও ইহাদিগকে সংস্কৃত নিয়ম অনুসারে অনায়াসেই সমর্থন করা যায়। উদ্বেল করিতেছে, ব্যাকুল করিতেছে, এই অর্থে উদ্বেল ও ব্যাকুলকে নামধাতু করিয়া নিয়া তাহার পরে 'ক্ত' প্রত্যয়যোগে সৃষ্ট শব্দ দুইটির অর্থ দাঁড়ায় 'উদ্বেলীকৃত', 'ব্যাকুলীকৃত'। প্রচলিত অর্থের সঙ্গে এই অর্থের বিশেষ কিছু বিরোধ নাই।

স্ত্রীপ্রত্যয়।—খাঁটী বাংলা স্ত্রীপ্রত্যয় সাধারণতঃ ঈ বা ইনী। এই সব প্রত্যয় বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দেও অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। অভাগী, অভাগিনী, হতভাগী, হতভাগিনী, অধীনী, ননদিনী, ননদী,

দিগম্বরী, ভয়ংকরী, কিংকরী, চন্দ্রবদনী, সুকেশিনী অর্ধাঙ্গিনী, হেমাঙ্গিনী, ভুজঙ্গিনী, উন্মাদিনী—ইহাদের কোনটাই সংস্কৃত নিয়মানুসারে ঠিক শুদ্ধ না হইলেও বাংলার রীতি অনুসারে দোষহীন। চণ্ডীদাসের রজকিনী, কৃত্তিবাসের পাপিষ্ঠী বাংলার এই রীতিরই সাক্ষ্য বহন করে। সম্ভবতঃ এই প্রথার অনুসরণ করিয়াই মধুসূদন গায়কী, নায়কী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি যত বড় সাহিত্যিকই হউন না কেন, নূতন শব্দ সৃষ্টি করিলেই ভাষা তাহা নির্বিবাদে মানিয়া লয় না। তাই বাংলা ভাষায় চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস বা মধুসূদনের দৃষ্টান্ত অনুসৃত হয় নাই। তবে ব্যাকরণ-রচয়িতার পক্ষে বাংলার এই বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করিবার কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্র তাহা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলিয়াছেন—'বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গে 'ইনি' 'ই' পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সংস্কৃত-ব্যাকরণের ছাঁচ মানে না। সে বাঙালী হইয়া আর এক পদার্থ হইয়া গেছে। তাহার চেহারাও বদল হইয়াছে।···সংস্কৃত বিধানমতে সে কোথাও স্ত্রীলিঙ্গে আকার মানে না, এই জন্য সে অধীনাকে অধীনি বলে'[৬] (রচনাবলী ১২।৪৭০)। এই প্রসঙ্গে অরণ্যানী শব্দের আদর্শে রচিত বনানী শব্দটি স্মরণীয়।

পুরাণ বাংলায় কোন কোন স্থলে আকারান্ত বালা, প্রিয়া প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত না হইয়া পুংলিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অবশ্য আকারান্ত বলিয়াই শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া মনে করিবার দৃষ্টান্তও বাংলায় পাওয়া যায়। তাই অণিমা, নীলিমা, সবিতা প্রভৃতি মেয়েদের নাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়—সাহিত্যের ভাষায়ও কোন কোন স্থলে নীলিমা প্রভৃতির বিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলায় স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা দরকার। বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার দিন দিন কমিয়া যাইতে থাকিলেও স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক বাড়িয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ অনেক ক্ষেত্রে একরূপ অকারণেই স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার করা হইয়া থাকে। উদাহরণ—শতবার্ষিকী, স্মৃতিবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, জন্মবার্ষিকী, চয়নিকা,

৬। অবশ্য দুই এক স্থলে যে সে আকারও ব্যবহার করে না, এমন নয়। অপ্রয়োজনেও সে 'আস্পদ' শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ করিতে যাইয়া 'আস্পদা' ব্যবহার করিয়া বসে। যথা, শ্রদ্ধাস্পদা, স্নেহাস্পদা প্রভৃতি।

চলন্তিকা, রবিদীপিতা, বিবরণী প্রভৃতি। কোন কোন স্থানে এগুলিকে পুংলিঙ্গ শব্দের বিশেষণরূপেও ব্যবহার করা হয়। যথা, আগমনী গান, জন্মবার্ষিকী উৎসব, সংশোধনী প্রস্তাব। রামেন্দ্রসুন্দর বহু দিন পূর্বে তাঁহার বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধে এ জাতীয় প্রয়োগের নিন্দা করিয়াছিলেন—প্রয়োক্তাদিগের দণ্ডবিধানেও তাঁহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু আসল কথা এই যে, বাঙালি গালভরা শব্দ ব্যবহার করিতে চায়—এজন্য শেষের স্বরকে দীর্ঘ করিতে পারিলে সুবিধা হয় এবং এ সুবিধা স্ত্রীলিঙ্গের ঈ প্রত্যয়ে পাওয়া যায় বলিয়াই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ব্যবহারে তাহার আগ্রহ—এ বিষয়ে সে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য।

তদ্ধিত প্রত্যয়।—সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে 'ষ্ণিক' নামে প্রচলিত প্রত্যয়টির বহুল ব্যবহার আধুনিক বাংলায় দেখা যাইতেছে। কোন বিশেষ্যকে বিশেষণরূপে ব্যবহার করিতে হইলে প্রায়শঃ এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে নবগঠিত শব্দগুলির স্থলে এই ব্যাপারে প্রাচীন নিয়ম সাধারণতঃ অনুসৃত হয় না। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে এই প্রত্যয় যোগ করিলে সাধারণতঃ পূর্বপদের প্রথম স্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বিশেষ বিশেষ স্থলে উভয় পদেরই প্রথম স্বর বা দ্বিতীয় পদের প্রথম স্বরের বৃদ্ধি হয়। বাংলায় কিন্তু বেশির ভাগ স্থলেই পরপদের প্রথম স্বরের বৃদ্ধি করা হয়। যথা—অর্থনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক, সমসাময়িক। প্রাচীন শব্দের বেলায়ও দুই এক স্থলে এই রীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই প্রাচীন মতানুসারে ঐহলৌকিক না লিখিয়া কেহ কেহ ইহলৌকিক লিখিয়া থাকেন। অথচ ইংরাজি রীতির অন্ধ অনুকরণে রচিত আন্তর্জাতিক, আন্তঃপ্রাদেশিক প্রভৃতি শব্দে দুই পদেরই বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে।

কালবাচক অব্যয় শব্দের পরে বিহিত তন প্রত্যয় আধুনিক বাংলায় অন্যত্রও ব্যবহৃত হইতেছে। যথা—ঊর্ধ্বতন, উচ্চতন, পূর্বতন, নিম্নতন প্রভৃতি। আলু ও মতুপ্‌ প্রত্যয়ের ব্যবহারেও এইরূপ ব্যাপকতা লক্ষিত হয়। জ্ঞান্‌মান্‌, ভাগ্যিমান্‌ প্রভৃতি চলতি উচ্চারণ মতুপ্‌প্রয়োগের অনুকূল।

কতকগুলি বিশেষ্য শব্দের পরে 'ভাব'বাচক 'তা' প্রত্যয় বৈয়াকরণের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও অসঙ্কোচে ব্যবহৃত হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নির্ভরতা, নিশ্চয়তা, প্রসারতা, উৎকর্ষতা প্রভৃতি প্রয়োগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার বিশেষণ শব্দের পরেও ঈ-কার যোগ বাংলায় কুশলী, সাবধানী প্রভৃতি শব্দে

দেখা যায়। সংস্কৃতানুসারে এগুলিকে স্বার্থিক প্রত্যয় বলা চলে অর্থাৎ এগুলি মূল শব্দের নিজের অর্থই প্রকাশ করে মাত্র। অবশ্য বিশেষ্যরূপে বিশেষণের এবং বিশেষণরূপে বিশেষ্যের ব্যবহারও বাংলায় বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। সততা শব্দে মূল শব্দের স্বরূপটিই উপেক্ষিত হইয়াছে। একত্র মিলিত অর্থে একত্রিত শব্দের ব্যবহার সংস্কৃতের অনুমোদিত না হইলেও বাংলায় বহুল প্রচলিত। গালভরা শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে শব্দগুলিকে ফাঁপাইয়া তুলিবার চূড়ান্ত নিদর্শন ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়।

এইরূপ আরও বহু শব্দ ভাষার নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাহাদের সংকলন ও সমালোচন বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতের সম্মিলিত চেষ্টায়ই ইহা সম্পন্ন হইতে পারে। বাংলা ব্যাকরণকে নির্দোষ ও সম্পূর্ণ করিবার জন্য এ বিষয়ে সুধীসমাজকে অবহিত হইতে হইবে।

বাংলা অভিধান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শতাধিক বৎসর যাবৎ বাংলায় অনেক অভিধান সংকলিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহু স্থলে সংকলয়িতাদের প্রচুর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের নিদর্শন বর্তমান থাকিলেও পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক অভিধানের অভাব এখনও দূরীভূত হইয়াছে বলা চলে না। অবশ্য বাংলা অভিধানের আদর্শ ও ক্রটিবিচ্যুতি সম্পর্কে বিশেষ কোনও আলোচনা হয় নাই। প্রকাশিত অভিধানের গুণাগুণ সম্পর্কে কোন বাদপ্রতিবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ অভিধান পর্যালোচনার অভ্যাস বাঙালি পাঠকসাধারণের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। যাঁহারা মাঝে মাঝে অভিধান দেখেন তাঁহারাও ইহার দোষগুণ লক্ষ্য করেন না।

অভিধান শব্দের অর্থ নির্দেশ করে এবং সেই প্রসঙ্গে শব্দের রূপ ও অর্থ-পরিবর্তনের ধারার আভাস প্রদান করে। অভিধান ভাষার শব্দসম্পদের ধারক ও বাহক। যুগে যুগে এই সম্পদ্ কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাঁহার পরিচয় অভিধান হইতেই পাওয়া যায়। আদর্শ অভিধানে কালানুক্রমিক অর্থ-নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে থাকে প্রয়োগের উদাহরণ। এ কার্য অতি দুরূহ সন্দেহ নাই। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' এই দুরূহ কার্য-সম্পাদনের কিছু চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আকরনির্দেশ সর্বত্র ভ্রমশূন্য না হইলেও বিশেষ উপযোগী। এ কার্যে যতদিন পূর্ণ সাফল্য লাভ করা না যায়—যতদিন সমস্ত শব্দের সকল অর্থে প্রয়োগের উদাহরণ সংকলিত না হয় ততদিন অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যে অভিধানে শব্দটি ও তাহার নির্দিষ্ট অর্থ অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে তাহার নাম করা যাইতে পারে। এ কাজ তেমন কঠিন নয়। বিশাল সংস্কৃত অভিধান শব্দকল্পদ্রুমে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়াছে। বোটলিঙ্ক ও তদনুসারী মনিঅর উইলিঅমসের বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থে অন্যত্র অপ্রাপ্ত অর্বাচীন শব্দ সম্পর্কে শব্দকল্পদ্রুমের দোহাই দেওয়া হইয়াছে। ফলে কোন শব্দ বা কোন অর্থ কত প্রাচীন তাহা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। বিভিন্ন প্রদেশে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থে এমন অনেক শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলির বা যাহাদের বিশিষ্ট অর্থ অর্বাচীন কালে সেই সেই প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণ সংস্কৃত অভিধানে ইহাদের আকর উল্লিখিত না

হওয়ায় অনুসন্ধানী পর্যালোচককে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। শব্দকল্পদ্রুম হইতে এ বিষয়ে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহা হইতেই আমরা জানিতে পারি 'সধবা' শব্দ জটাধরের অভিধানে ধরা আছে—'বালিশ' শব্দের অধুনা প্রচলিত অর্থ শব্দমালা নামক অভিধানে উল্লিখিত হইয়াছে। বাংলা অভিধানেও এইরূপ আকর নির্দেশের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়—অন্যথা পদে পদে সন্দেহের সম্ভাবনা।

নানা 'কারণে সাধারণ বাংলা অভিধানের অর্থনির্দেশ অনেক ক্ষেত্রে সন্তোষজনক নহে। সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিত অনেক সময় বাংলা অভিধানের অর্থনির্দেশ দেখিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। এই অর্থনির্দেশ অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার নিকট অমূলক ও ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। মূল সংস্কৃতের অপব্যাখ্যা বা দুর্বোধ্যতা, লেখকবিশেষের বিকৃত বা ভ্রান্ত প্রয়োগ, ব্যবহার ও আসল বস্তুর সহিত অপরিচয় ও অনুমান এবং ব্যুৎপত্তির উপর নির্ভর প্রভৃতি কারণে অভিধানের অর্থনির্দেশে কিছু কিছু গোলমালের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যথাযথ আকরনির্দেশের অভাবে গোলমালের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কোন শব্দ সংস্কৃত বা সংস্কৃতোদ্ভূত এইটুকু মাত্র উল্লেখ করিলেই আকরনির্দেশ সম্পূর্ণ বা সন্তোষজনক হইতে পারে না। সংস্কৃত বলিলেই একটা প্রাচীনতার ধারণা হয়। কিন্তু সংস্কৃতের আকৃতিবিশিষ্ট সমস্ত শব্দই প্রাচীন নয়—বহুলপ্রচলিত অনেক শব্দের সংস্কৃত অভিধানে কোনও স্থান নাই। মহালয়া, বৃদ্ধপ্রপৌত্র, ঝটিকা প্রভৃতি অতিপরিচিত শব্দও এই শ্রেণীভুক্ত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজে এমন অনেক শব্দের ব্যবহার আছে যেগুলির প্রচলিত অর্থ সংস্কৃত অভিধানে নাই। তাহা ছাড়া, উনবিংশ শতাব্দী কি তাহার পূর্ব হইতেই পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা প্রকাশের জন্য সংস্কৃতের আদর্শে এমন অনেক শব্দ গঠিত হইয়াছে যেগুলিকে সংস্কৃত বলিয়া নির্দেশ করিলেই তাহাদের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি আবার সংস্কৃত ব্যাকরণবিরোধী—ইংরেজী-অনভিজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে অর্থহীন। আন্তর্জাতিক, প্রাগৈতিহাসিক, জীবনবেদ প্রভৃতি অধুনাপ্রচলিত অগণিত শব্দ এই শ্রেণীতে পড়ে।

বাংলা অভিধানে শব্দের অর্থনির্দেশ প্রসঙ্গে অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি সম্পর্কে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে প্রসিদ্ধ 'ক্রন্দসী' শব্দ আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। বেদে ইহার অর্থ দ্যাবা-

পৃথিবী বা স্বর্গমর্ত্য। সাধারণ সংস্কৃত অভিধানে শব্দটি নাই। বাংলা অভিধানে ও প্রয়োগে ইহার অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে। 'মদকল' শব্দের অমরকোষ-ধৃত অর্থ মদমত্ত হস্তী—অর্বাচীন অভিধানে উল্লিখিত অর্থ মত্ততা জন্য অব্যক্ত মধুর ধ্বনিকারী। শেষোক্ত অর্থেই শব্দটি ভবভূতির উত্তররামচরিতে এবং মাইকেলের মেঘনাদবধে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন অভিধানে এই অর্থ আদৌ উল্লিখিত হয় নাই। গহনার নৌকাকে চিত্রাঙ্কিত নৌকা বা 'অনেক যাত্রী লইয়া চলাচলকারী নৌকাবিশেষ' বলিলে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য ধরা পড়ে না। বস্তুতঃ নির্দিষ্ট ভাড়ায় নির্দিষ্ট স্থান হইতে নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে যে নৌকা যাত্রী লইয়া যাতায়াত করে তাহাই গহনার নৌকা। গণ্ডগ্রাম শব্দের অভিধানোক্ত অর্থ বড় গ্রাম—কিন্তু ব্যাবহারিক অর্থ ক্ষুদ্র গ্রামও উপেক্ষণীয় নয়। শেষোক্ত অর্থেই রবীন্দ্রনাথ 'পোস্ট মাস্টার' গল্পে ও 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। মিত্র শব্দের অপভ্রংশ রূপে পরিচিত ইতু বা ইথু শব্দের 'সূর্যপূজার ঘট' এইরূপ অর্থ নির্দেশ করার কারণ বুঝা যায় না। বিশেষ করিয়া বিভিন্ন অর্থের মধ্যে এইটিকেই প্রথম স্থান দেওয়া আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। প্রথমে মুখ্য অর্থ উল্লেখ করিয়া পরে গৌণ ও লাক্ষণিক অর্থ নির্দেশ করাই সমীচীন পদ্ধতি। অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ অর্থ-নির্দেশের আরও কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

কাকু—বক্রোক্তি; চার্বাক—নাস্তিক মুনিবিশেষ—ইনি আত্মা, পরলোক প্রভৃতিতে অবিশ্বাসী ছিলেন; নিবীত—কণ্ঠে ধারণীয় যজ্ঞসূত্র; প্রেত—(প্রধানতঃ নরকগামী বা অতৃপ্ত) মৃতের আত্মা; প্রেতকর্ম—মৃতের দাহন ও সপিণ্ডীকরণাদি কার্য; কর্মপ্রবচনীয়—অব্যয় পদবিশেষ—যাহা কোন বিশেষ্য বা সর্বনামের পর ব্যবহৃত হইয়া উহাকে কোন কারকে আনয়ন করে বা বিভক্তিযুক্ত করে। অভিধানের অর্থনির্দেশে এ জাতীয় ত্রুটি প্রশংসনীয় নহে অথচ প্রচলিত অভিধানগুলিতে ইহাদের দৃষ্টান্ত নিতান্ত কম নহে। ইহাদের হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে চাই সংস্কৃত অভিধানের সাহায্য ও শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতের আন্তরিক সহযোগিতা।

'উপদেশ পরম্পরার আধার; যাহা উপদেশ পরম্পরারূপে আছে।"—"ইতিহাস' শব্দের এই যে অর্থ কোন অভিধানে দেওয়া হইয়াছে তাহা বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। শব্দটির তাৎপর্য বাংলায় সুপরিচিত—অর্থ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে মনে হয়।

অবশ্য সংস্কৃত পণ্ডিতগণও সর্বত্র শব্দের অর্থ সম্পর্কে সর্বথা নিঃসন্দেহ নন—সকল সংস্কৃত শব্দের অর্থ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কাকপক্ষ এইরূপ একটি শব্দ। ইহার প্রাচীন আভিধানিক অর্থ বালকের শিখা। রাজকুমারদের চঞ্চল কাকপক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়—ইহার সংখ্যা ছিল পাঁচ। আধুনিক অভিধানের অর্থ 'জুলপি'র সহিত ইহার সামঞ্জস্য হইতে পারে কিভাবে? 'ঝুঁটি' এই অর্থ কতটা সঙ্গত ভাবিয়া দেখা দরকার। কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন কোন পুথিতে রামের মাথার 'পঞ্চঝুটী'র উল্লেখ করা হইয়াছে। 'দময়ন্তীকথা'য় দময়ন্তীর বর্ণনায় যে চিকিৎসাবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে তাহাকে আধুনিক শুশ্রূষাবিদ্যা কল্পনা করা সেই প্রাচীন যুগের পক্ষে কত দূর সঙ্গত বলা কঠিন। মহাভারতে স্ত্রীলোককে কুচেল দ্বারা রক্ষা করার কথা বলা হইয়াছে—কিন্তু ময়লা কাপড় পরাইয়া প্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা করার কথা বড়ই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। সংশয় হয়, প্রকৃত অর্থ এখানে বুঝিতে পারা যায় নাই। প্রাচীন বাংলায়ও অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা।

বাংলা অভিধানে মূলতঃ বাংলা ভাষার ব্যবহৃত শব্দ সন্নিবিষ্ট হইবে ইহাই স্বাভাবিক। সংস্কৃত হইতে অনেক শব্দ বাংলায় গৃহীত হইয়াছে—নূতন নূতন ভাব প্রকাশের জন্য বাংলায় অনেক নূতন শব্দ গঠিত হইয়াছে। সেগুলি বাংলা ভাষার অঙ্গ—সুতরাং সেগুলি অবশ্যই অভিধানের অন্তর্ভুক্ত হইবে। বাংলায় সাধারণতঃ অপ্রচলিত যে সমস্ত শুদ্ধ বা অশুদ্ধ শব্দ মূল বা পরিবর্তিত অর্থে বিশিষ্ট লেখকের লেখায় কোথাও কখনও ব্যবহৃত হইয়াছে অভিধানে তাহাদেরও স্থান করিতে হইবে। মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির লেখায় এই জাতীয় অনেক শব্দ পাওয়া যায়। মাইকেলের বররুচিরিচ্যমান, মহেষ্বাস, কামধুক প্রভৃতি শব্দ—রবীন্দ্রনাথের কর্মিক, সাম্রাজ্যিক বা সাম্রাজ্যিক, বিশ্বস্বহ, মৌলিন্য (=মৌলিকতা), কাকুধ্বনি (=কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ), শাস্ত্রিক (=শাস্ত্রীয়), উজ্জ্বলিত, চঞ্চলিত, নিজকীয় (=স্বকীয়), কদুৎসাহী, পরিপ্রেক্ষণা (=পরিপ্রেক্ষিত), খণ্ডিতা (=খণ্ডীকৃতা), দ্বৈপায়নতা, উৎসর্জন, প্রদোষ (=উষা), ঔকর্ষ্য প্রভৃতি শব্দ বাংলা অভিধানে গ্রহণ করিতে হইবে। দুঃখের কথা এই যে, বিশিষ্ট লেখকের ব্যবহৃত এইরূপ অজস্র শব্দ বাংলা অভিধানে স্থান পায় না; অথচ বাংলায় অব্যবহৃত—অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারের অযোগ্য—অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বাংলা অভিধানের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ঘৃতার্চি, ঘৃতোদ, উদ্‌বেপন,

উপারত, উদীরিত, ধম্মিল্ল, ধেয়, নন্দ্য, পস্তা, মর্ত্ত্যকাম (?) এ জাতীয় প্রচুর শব্দ বাংলা অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়। 'আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান' 'চলন্তিকা'তেও এইরূপ অনেক শব্দ স্থান পাইয়াছে—'সুপ্রচলিত' 'প্রচলনযোগ্য' বা 'অল্পপ্রচলিত' ইহাদের কোন শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে না এমন শব্দের সংখ্যাও উহাতে কম নয়। বাংলা অভিধানে সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য দর্শনে বিরক্ত হইয়া যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় ১৩২০ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'বাঙ্গালা শব্দকোষে'র 'সূচনা'য় বাংলা-অভিধান হইতে সংস্কৃত শব্দ বর্জনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ না হইলেও অন্ততঃ আংশিক ভাবে তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে কার্য করা সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকার কারণ নাই। কিন্তু আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইতে চলিল তাঁহার প্রস্তাব কোন অভিধান সংকলয়িতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

অভিধানে বাংলায় ব্যবহৃত শব্দগ্রহণ সম্পর্কে কিছু বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন আছে। বর্তমানে অনেক লেখক বাংলায় প্রতিদিন যে নূতন নূতন শব্দরাশির আমদানি করিতেছেন সেগুলি সকলই যে এখনই বাংলা অভিধানে গৃহীত হইতে পারিবে এমন কথা বলা যায় না। অর্থের অস্পষ্টতা ও ব্যাকরণের অবিশুদ্ধি সত্ত্বেও কিছু কিছু শব্দ হয়ত ভাষায় চলিয়া যাইবে এবং কালক্রমে অভিধানে স্থান পাইবে। অভিধানে স্বীকৃতি লাভের পূর্বেই অনেকগুলির অকালমৃত্যু হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। ইতিমধ্যে তাহাদের দোষত্রুটি পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। তবে ভাষা ও শব্দ বিষয়ে আমরা উদাসীন। প্রাচীন ধারা এখন লুপ্ত—পূর্বের মত পংক্তিব্যাখ্যা ও প্রতিটি শব্দের বিশ্লেষণে আমাদের আর রুচি নাই; আবার আধুনিক ধরনে ভাষার শব্দসম্পদ বিশ্লেষণে ও বিচারেও আমরা অভ্যস্ত হই নাই। যাহা হউক, যে সকল গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্যের আসরে একটা নির্দিষ্ট স্থান লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যবহৃত শব্দগুলি সুন্দর হউক অসুন্দর হউক, শুদ্ধ হউক অশুদ্ধ হউক সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসহ অভিধানে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। না হইলে পাঠকদের অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। সত্য সত্যই উপযুক্ত অভিধানের অভাবে প্রাচীন সাহিত্য বা আধুনিক যুগের গোড়ার দিকে লেখা পুস্তক এখন পাঠকের দুর্বোধ্য—এমন কি যে সমস্ত নামকরা বই সাম্প্রতিক কালে লেখা তাহাদেরও সকল শব্দ ভাল করিয়া বোঝা সম্ভবপর নয়। আমরা মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথকে লইয়া গর্ব করি—তাঁহাদের

লেখা যাহাতে যথাসম্ভব অনায়াসে সাধারণ পাঠক সহজে বুঝিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন বোধ করি না। তাঁহাদের ব্যবহৃত শব্দের স্বতন্ত্র অভিধান ত দূরের কথা সাধারণ অভিধানের মধ্যেও তাহাদের সকলের স্থান নাই। বস্তুতঃ, সমগ্র বাংলা সাহিত্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া অভিধান-সংকলনের কাজে এখনও হাত দেওয়া হয় নাই। এ কাজ একজনের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না—এজন্য চাই বহুজনের সমবেত সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। পুনার ডেকান কলেজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট বৈজ্ঞানিক ধরনে সংস্কৃত ভাষার অভিধান-প্রণয়নে ব্রতী হইয়া দেশবিদেশের সংস্কৃত-পণ্ডিতসমাজের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন—বিভিন্ন পণ্ডিতের সাহায্যে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে শব্দসংকলন করান এই প্রতিষ্ঠানের অভিপ্রেত। সংকলিত শব্দগুলি কালানু-ক্রমে সজ্জিত করিয়া অভিধানে সন্নিবেশিত হইবে। পনেরো বছরের মধ্যে তাঁহারা এই বিশাল অভিধান প্রকাশ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ভারত সরকারের সহায়তায় কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভা হিন্দীভাষার অভিধান 'শব্দসাগর'কে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা হইতে সংকলিত শব্দের সমাবেশে পূর্ণাঙ্গ করিবার কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। বাংলা অভিধানের বেলায়ও অনুরূপ আয়োজনের আবশ্যকতা আছে—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে পারেন।

প্র কী র্ণ কো ষ

শব্দের অর্থনির্দেশই অভিধানের মুখ্য লক্ষ্য। কোন বস্তুর বিস্তৃত পরিচয়-প্রদান অভিধানের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। বস্তুতঃ এরূপ পরিচয় দিতে হইলে অভিধানের কলেবর যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে তাহাতে উহা সাধারণ ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া দাঁড়াইবে। সংস্কৃতের শব্দকল্পদ্রুম ও বাচস্পত্য এবং বাংলার বিশ্বকোষ নানা দিক্ দিয়া মূল্যবান ও উপযোগী হইলেও সব সময় ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। অথচ সুলভ ও সুব্যবহার্য এই জাতীয় একখানি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইংরেজীতে এরূপ গ্রন্থের অভাব নাই। অভিধানের মত এইরূপ প্রকীর্ণকোষ বা সাইক্লোপিডিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে অপরিহার্য। যিনি যে জাতীয় গ্রন্থই আলোচনা করুন না কেন মাঝে মাঝে তাঁহাকে এমন বিষয়ের সম্মুখীন হইতে হয় যাহার প্রকৃত তাৎপর্য সাধারণ অভিধানের সাহায্যে সুস্পষ্ট হইতে পারে না। ক্ষুদ্র সাইক্লোপিডিয়া কিন্তু সহজে সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের সহায়তা করিয়া থাকে। বাংলা গ্রন্থপাঠের সময়ও নানা সমস্যার উদ্ভব হয়, কিন্তু বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে সমাধানের উপায় সুলভ নহে—অনেক স্থলে একেবারে অলভ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাংলা গ্রন্থে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাদের পরিচয় বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা চলিলেও বাংলার ঐতিহ্যবিষয়ক অনেক প্রসঙ্গেরই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান সাধারণ বাংলা গ্রন্থে দুর্লভ। এ সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজেও যতটুকু ধারণা আছে তাহা অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, বিকৃত বা ভ্রান্ত। প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা আজ অনেকাংশে ব্যাহত—প্রাচীন সম্প্রদায় আজ অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন—প্রাচীন সংস্কারের ধারক বাহক সংস্কৃত-পণ্ডিতসম্প্রদায়ের সহিত আজ বাংলা সাহিত্যের যোগ-সূত্র ক্ষীণ। সুতরাং এ বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের পথও লুপ্তপ্রায়। ফলে আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠান ধর্মকর্মের প্রকৃত স্বরূপ ও রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা আজ দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিককালে প্রচলিত পাল-পার্বণের পূর্ণ পরিচয়ও জানিবার সহজ কোন উপায় নাই। দণ্ডীরাজার

উপাখ্যান, যযাতির নরমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি এককালে বাংলাদেশে বহুলপ্রচলিত স্বতন্ত্র পুরাণ-কাহিনীর কথা বাঙালির কাছে পরিচিত করাইবার তেমন কোন ব্যবস্থা নাই। অন্যান্য আরও অনেক বিষয় সম্পর্কেই বাঙালির জানিবার বুঝিবার ইচ্ছা পূরণ করিবার কোনও পথ নাই। বাঙালি পাঠকের জানিবার কৌতূহলও তাই কমিয়া গিয়াছে মনে হয়—'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।' বাংলা গল্প উপন্যাসে ঈদ পরব, জিতাষ্টমী প্রভৃতির উল্লেখ বাঙালি পাঠকের অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করে না—কোন উৎসবের কথা বলা হইতেছে এইটুকু বুঝিয়াই সে সন্তোষ লাভ করে। বস্তুতঃ দীর্ঘ দিন ধরিয়া আমাদের পঠনপাঠনের যে ধারা চলিয়া আসিতেছে তাহাতে অনেক বিষয়েরই বিস্তৃত বিবরণ বা পরিচয় পাইবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হই না। নির্দিষ্ট পশুপক্ষী বৃক্ষলতার অর্থ বুঝাইতে গিয়া সংস্কৃত-টীকাকারেরা প্রায়ই পশুবিশেষ, পক্ষিবিশেষ এইটুকু মাত্র বলিযা কায সমাধা করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান জগতের লোক ত এত অল্পে সন্তুষ্ট হইতে চাহে না—তাহাদের জানিবার ও বুঝিবার আগ্রহ অফুরন্ত। সেই আগ্রহ মিটাইবার জন্যই নানা ধবনেব সাইক্লোপিডিযার সৃষ্টি। উপযুক্ত উপকরণের অভাবে আমাদের দেশে মানুষের এই স্বাভাবিক আগ্রহ শুদ্ধ হইয়া আছে। যথোচিত উপকরণ পাইলেই অগ্নিকণা-স্পর্শে বারুদেব মত সে আগ্রহ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে।

যাঁহারা জ্ঞানী গুণী ও দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহাদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার—আমাদেব জ্ঞানরাজ্যের এই নিদারুণ অভাব দূব করিবার জন্য তাঁহাদিগকে তৎপর হইতে হইবে। খুবই আশার কথা, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর মত একজন বিচক্ষণ সাহিত্যিক ও অভিধানকার সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকার মধ্য দিয়া এদিকে সুধীসমাজেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—তিনি একখানা বাংলা সাইক্লোপিডিয়া বা 'বিষয়কোষ'-সংকলনের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। আমি তাঁহার মূল প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। তবে প্রসঙ্গতঃ তাঁহার প্রস্তাবেব দুই-একটি খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে আমার বক্তব্য উপস্থাপিত করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি।

প্রস্তাবিত গ্রন্থের নাম 'বিষয়কোষ' না করিয়া 'প্রকীর্ণকোষ' করিলে কেমন হয় ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। 'বিষয়কোষ' শব্দের অর্থ কিছুটা অস্পষ্ট বলিয়া মনে হয়, 'বিভিন্ন বিষয়ের কোষ'—নামের তাৎপর্য যদি এইরূপ হয়

তাহা হইলে সংস্কৃত সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত প্রকীর্ণ শব্দটি ব্যবহার করিলে অর্থ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হইতে পারে।

গ্রন্থপ্রণয়নের ভার কোনও প্রতিষ্ঠানেরই লওয়া উচিত সন্দেহ নাই। নানা দেশের নানা বিদ্বৎপ্রতিষ্ঠান হইতে এই জাতীয় কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভা হইতে হিন্দীর বিশাল অভিধান 'শব্দসাগর' প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহার পরিবর্ধিত ও সংশোধিত নূতন সংস্করণ-প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানই সম্প্রতি হিন্দী সাহিত্যের ব্যাপক ইতিহাস-সংকলনের কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দের হিন্দী অনুবাদের কার্যও এই প্রতিষ্ঠান নিয়মিত করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাংলা দেশের কোন প্রতিষ্ঠান হইতে যৌথ প্রচেষ্টায় কোন বৃহৎ কার্য সুসম্পন্ন হইবার দৃষ্টান্ত তেমন দেখা যায় না। তাই অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কল্পনাই থাকিয়া যায়—কার্যে রূপান্তরিত হইবাব সৌভাগ্য লাভ করে না।

বাংলা দেশের বেশির ভাগ বড় কাজই ব্যক্তিবিশেষের উদ্‌যোগ ও চেষ্টায় সম্পাদিত হইয়াছে। বাংলার 'শব্দকল্পদ্রুম' রাজা রাধাকান্ত দেবের অক্ষয় কীর্তি—'বঙ্গীয় শব্দকোষ' দরিদ্র পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু বৎসরের অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অপূর্ব নিদর্শন—শ্রীরাজশেখর বসুর অতুলনীয় নিষ্ঠা ও অসাধারণ দূরদর্শিতার সাক্ষী 'চলন্তিকা'। ইহা ছাড়া, রামায়ণ মহাভারত ভাগবতাদি গ্রন্থ ও তাহাদের অনুবাদ-প্রচারে বর্ধমানের মহারাজা, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। জমিদারি-বিলোপ ও অন্যান্য কারণে আজ এ জাতীয় কাজে বৈষয়িক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা বা সাহায্য-লাভের সম্ভাবনা কম। তবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সরকারী সাহায্য-লাভে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এমন ব্যক্তিই বা কোথায় যিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিদ্বন্মণ্ডলীর সাহায্য ব্যতিরেকে এই বিরাট্ কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন বা পাঁচজনের সহযোগিতা লাভ করিয়া কার্যে অগ্রসর হইতে পারিবেন? এই দুর্লভ সম্ভাবনার উপর নির্ভর না করিয়া কোন উৎসাহী পুস্তক-প্রকাশক যদি শ্রীরাজশেখর বসুর মত ধীর স্থির কর্মীকে পুরোধা করিয়া এই কার্যে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যে সুফললাভের আশা করা যাইতে পারে। বৃদ্ধ হইলেও রাজশেখরবাবু কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে

পারিবেন—কার্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া ইহাকে সার্থকতার পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারিবেন। যে প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন তাহাকে কার্যে রূপ দেওয়ার সূচনা যদি তিনি করিয়া দেন তাহা হইলে বাংলার একটি মস্ত অভাব দূরীভূত হইবে বলিয়া ভরসা করা যায়।[১]

১। সুখের বিষয়, সরকারী সহযোগিতায় বিভিন্ন ভাষায় এই কার্যের সূত্রপাত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ বাংলা ভাষায় 'ভারতকোষ' নামে এই জাতীয় একখানি কোষগ্রন্থ-সংকলনের কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

স্বাধীন দেশে বাংলা ভাষা

দীর্ঘকালের পরাধীনতার বন্ধন হইতে দেশ মুক্ত হইয়াছে। ফলে গুরুদায়িত্ব তাহাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। সকল বিষয়ে আজ তাহাকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে—পরের মুখ চাহিয়া থাকিলে আর চলিবে না—বিদেশের অন্ধ অনুকরণ আর তাহার পক্ষে শোভা পাইবে না। কেবল বাহির হইতে নয়, অন্তর হইতে তাহাকে বিদেশী পরগাছা উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। বিদেশ হইতে নানা উপকরণ তাহাকে সংগ্রহ করিতে হইবে নিজের পরিপুষ্টি ও শোভাবৃদ্ধির জন্য—তাহারই চাপে যাহাতে নিজের আকৃতি ও প্রকৃতি বিকৃত না হইয়া যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে—আমাদের স্কুল কলেজ আফিস আদালত সভাসমিতির কাজকর্মে এখন হইতে যথাসম্ভব দেশীয় ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। বিদেশী ভাষাকে অবশ্য ত্যাগ করিলে চলিবে না। বিদেশের সহিত ভাবের আদান-প্রদানের জন্য বিদেশী ভাষাকে গ্রহণ করিতে হইবে, বিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারা নিজের দেশীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করা অনেকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া একই প্রদেশের মধ্যে পরস্পর কথা বলায়, চিঠিপত্র লেখায় যে ইংরেজী-মিশ্রিত দেশীয় ভাষাপ্রয়োগের ব্যাধি দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার আশু প্রতিবিধান অবশ্যকর্তব্য। চিঠিখানি যদি বা বাংলায় লিখি, তাহার শিরোনামা ইংরেজী অক্ষরে লিখিবার লোভ আমরা কয়জন সংবরণ করিতে পারি? কয়জনে নিজের বইয়ে মালিকের নাম হিসাবে নিজের নাম বাংলায় লিখিয়া রাখি? বাড়ীর নাম ও মালিকের নাম ইংরেজী হরফে বিজ্ঞাপিত করাই মর্যাদাসূচক বলিয়া ধারণা করি। অতি-সাধারণ ব্যক্তিও চিঠির কাগজের শিরোভাগে ইংরেজী অক্ষরে নিজের নাম মুদ্রিত করিয়াই গৌরব-বোধ করেন। ব্যাধির ব্যাপকতার ইহাই হইল প্রধান লক্ষণ। সকলকে সমবেত ভাবে একাগ্রচিত্তে সংকল্প করিয়া এই মানসিক ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে হইবে। ব্যাধিজনিত মোহ কাটিয়া গেলেই নিজের দেশের ভাষা ও

সাহিত্যের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিবে এবং তাহার উৎকর্ষসাধনের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টা দেখা দিবে।

অনেকের ধারণা নিজের মাতৃভাষা-শিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন ও প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। ফলে ইংরেজী শিক্ষার জন্য আমরা যে পরিমাণ পরিশ্রম করি মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য তদনুপাতে কিছুই করি না। তাই যখন মাতৃভাষার মধ্য দিয়া কোন গুরু বিষয়ের আলোচনা করি তখন ভাষার অন্তরালে বিদেশী ছাপ লক্ষ্য করা যায়। ইহার বিকট রূপ, ইহার দেশীয় আকৃতি ও বিদেশী প্রকৃতি সাধারণ পাঠকের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে। বস্তুতঃ বিদেশী চিন্তাধারা দেশীয় ধরনে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমাদের অনেকেরই নাই। অনুবাদের বেলা এই অক্ষমতা চরমমাত্রায় উঠে। তাই অনেক ক্ষেত্রে বাংলা সংবাদপত্রে ইংরেজী সংবাদের যে অনুবাদ প্রকাশিত হয় তাহা পাঠকের নিকট দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে—তাহা পড়িয়া অনেক সময়ই মূলের তাৎপর্য ঠিক ধরিতে পারা যায় না। সেইজন্য অনেকে বাংলা সংবাদপত্র না পড়িয়া ইংরেজী সংবাদপত্র পড়িতে বাধ্য হন। জনসাধারণকে কোনরূপে দুধের আস্বাদ ঘোলে মিটাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। বিদেশী ও দেশী উভয় ভাষারই সৌন্দর্য ও মাধুর্যের আস্বাদ হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত থাকিতে হয়।

এই অসুবিধা দূর করিতে হইবে—দেশের জনসাধারণের মধ্যে দেশ-বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত ও সুখপ্রবেশ করিয়া তুলিতে হইবে। স্বাধীনতা-সৌধের ভিত্তিপত্তন এইরূপ ভাবেই করিতে হইবে। দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন ব্যতীত দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না, একথা ভুলিলে চলিবে না। সুখের বিষয়—দেশের শাসনব্যবস্থার ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সর্বোচ্চ মান পর্যন্ত দেশীয় ভাষার মধ্য দিয়াই হওয়া উচিত—এ বিষয়ে আজ মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু সর্ব বিষয়ে বাংলা ভাষার প্রয়োগ-সম্প্রসারণের পূর্বে বিভিন্ন বিষয়ে আধুনিক ভাবপ্রকাশের উপযোগী শব্দ-সংকলনের সুব্যবস্থা অবশ্যকরণীয়। এইরূপ ব্যবস্থার অভাবে ইংরেজীগন্ধি ভাষা অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজী-না-জানা ব্যক্তির পক্ষে দুর্বোধ্য বা অন্যার্থবোধক হইয়া পড়িয়াছে। লেখকগণ যে যাহার প্রয়োজন ও খেয়ালমত ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টি করিয়া থাকেন—অনেক ক্ষেত্রে একজনের শব্দের সঙ্গে আর এক জনের শব্দের কোনও মিল থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে

ভাল মন্দ বিচার না করিয়া এক জনের সৃষ্ট শব্দ অপরে গড্ডলিকা-প্রবাহের মত অনুকরণ করিয়া চলেন—বহু স্থলে অপ্রসিদ্ধ লেখকের সৃষ্ট উৎকৃষ্ট শব্দ সাহিত্য-ব্যবসায়ীর দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। ফলে এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে এক বিরাট্ বিশৃঙ্খলার রাজত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। 'সাহিত্যের হট্টগোলে এমন শব্দের আমদানি হয়, যা ভাষাকে চিরদিনই পীড়া দিতে থাকে।'—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যাথার্থ্য আমরা পদে পদে অনুভব করিতেছি। মনীষিবর্গের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই বলা যায় না। বহু দিন পূর্বে স্বর্গত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় বিদেশী শব্দের আক্ষরিক অনুবাদের অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আধুনিক বাংলায় ব্যবহৃত এই জাতীয় শব্দের একটি তালিকা সংকলন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 'অনুবাদ-চর্চা' প্রবন্ধে তিনি ইংরেজীর অনুবাদে সাধারণতঃ যেরূপ ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন। 'শব্দচয়ন' প্রবন্ধে তিনি ইংরেজী শব্দের অনুবাদ হিসাবে বাংলায় ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের দোষত্রুটি দেখাইয়াছেন এবং অনুবাদের নমুনা হিসাবে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার হইতে কতকগুলি শব্দ সংকলন করিয়া দিয়াছেন। তাহা ছাড়া, তিনি নানা প্রসঙ্গে অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নূতন শব্দ তৈয়ার করিয়া এ বিষয়ে আদর্শ নির্দেশ করিয়াছেন।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানও এই বিষয়ে অনেক কাজ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে প্রায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ-সংকলনের চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টার ফল নানা সময় নানা পত্রিকায় এবং স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশিত গ্রন্থ ও নিবন্ধের একটি তালিকা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন।[১] তবে, এই তালিকা যে সর্বাংশে সম্পূর্ণ তাহা বলা যায় না। তাহা ছাড়া, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে অপ্রকাশিত সংকলনও প্রচুর রহিয়াছে।

কিন্তু কার্য যতদূরই অগ্রসর হইয়া থাকুক না কেন এ বিষয়ে এখনও প্রচুর কাজ বাকী রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অপ্রাচুর্যবশতঃ অনেক পরিভাষা অব্যবহৃত রহিয়া গিয়াছে—অনেকগুলির ব্যবহারযোগ্যতা ও অর্থপ্রকাশক্ষমতা এখনও সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। পরিভাষাগুলি সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকেরাই

১ প্রকৃতি, ১৩৪৪, গ্রীষ্মসংখ্যা।

তৈয়ার করিয়াছিলেন। ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতে তাহাদের উপযোগিতা বিচার করা হয় নাই। এজন্য চাই সাহিত্যিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সহযোগিতা। বস্তুতঃ পরিভাষা-রচনা কোন বিষয়বিশেষে পারদর্শী ব্যক্তি-বিশেষের একার কার্য নহে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বসু মহাশয় বলেন—

'বলা বাহুল্য, এই কাজে বিভিন্ন বিদ্যায় বিশারদ বহুলোক চাই। তাঁদের মৌলিক গবেষণায় খ্যাতি অনাবশ্যক, কিন্তু বাংলা ভাষায় দখল থাকা একান্ত আবশ্যক। যে সমিতি সংকলন করবেন তাঁদের মধ্যে দু-এক জন সংস্কৃতজ্ঞ থাকা দরকার। এমন লোকও চাই যিনি হিন্দী উর্দু পরিভাষার খবর রাখেন। সর্বোপরি আবশ্যক এমন গুণী লোক যিনি শব্দের সৌষ্ঠব ও সুপ্রযোজ্যতা বিচার করতে পাবেন, বিশেষত সঙ্কলিত সংস্কৃত শব্দের।'

এই জন্যই প্রবেশিকা পবীক্ষায় সমস্ত বিষয়েব পঠনপাঠনে মাতৃভাষার প্রবর্তনের সূচনায কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানের পরিভাষা-সংকলনের যে ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন তাহাতে কেবল বৈজ্ঞানিকদিগের উপরই সমস্ত ভার ন্যস্ত হয় নাই। বৈজ্ঞানিকগণ স্ব স্ব বিষয়ে পরিভাষা সংকলন করিয়া কেন্দ্রীয় সমিতি বা সমন্বয় সমিতির নিকট উপস্থাপিত করিতেন। এই সমিতির সভ্য ছিলেন বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতব্যবসায়ী। দেখা গিয়াছে—এই সমিতির অধিবেশনে অনেক সময় এক-একটি শব্দ লইয়া দীর্ঘকাল আলোচনা চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের প্রস্তাবিত শব্দ সম্বন্ধে সাহিত্যিক ও সংস্কৃত-পণ্ডিতের সম্মতি লওয়া হইত। কোন শব্দ সম্বন্ধে তাঁহাদের আপত্তি থাকিলে তাঁহারা অর্থানুসারে নূতন শব্দ গঠন করিয়া দিতেন এবং বৈজ্ঞানিকের সম্মতি হইলে উহা গৃহীত হইত। এই অতিসুন্দর পদ্ধতি অনুসারে কাজ হইলেও অবশ্য সর্বত্র সুফল পাওয়া যায় নাই—প্রস্তাবিত সমস্ত শব্দ গ্রহণযোগ্য বা নির্দোষ হয় নাই। তবে সেজন্য পদ্ধতির দোষ দেওয়া চলে না। এই পদ্ধতিকে সর্বথা কার্যকর ও সুফলপ্রসূ করিতে হইলে পরিভাষাসমিতির সকল সদস্যের ঐকান্তিকতা ও কর্মনিষ্ঠা অবশ্যপ্রয়োজনীয়—ইহার অভাবে প্রতিপদে ত্রুটির সম্ভাবনা স্বাভাবিক। বিবিধ কর্মের মধ্যে বিক্ষিপ্ত চিত্ত লইয়া অবসরবিনোদনের জন্য সভায় বসিয়া কাজ করিলে সুফললাভের আশা নাই। এইরূপ সমিতির কার্যের উপর দেশীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করিবে। সুতরাং

ব্যস্ততাসহকারে দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়া 'যেন তেন. প্রকারেণ' কাজ করিলে চলিবে না, কয়েকজনকে এই কার্যের গুরু দায়িত্ব মাথা পাতিয়া লইতে হইবে—ইহাকে জীবনের ব্রতহিসাবে, সাধনা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

কেবল বিভিন্ন বিজ্ঞানবিষয়ক শব্দ নয়, বিজ্ঞানের গন্ধশূন্য অনেক সাধারণ শব্দেরও সার্থক প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক শব্দ অপেক্ষা ইহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন অনেক বেশী। প্রতিদিন খবরের কাগজ মারফত এই জাতীয় বহু শব্দের সাক্ষাৎকার ঘটে—কিন্তু সুষ্ঠু অনুবাদের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছি না। নিশ্চল অবস্থা বা স্থিতাবস্থা (Standstill arrangement, Status Quo), হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল (Hindu majority area), বায়ুশীতল (air-conditioned), প্রার্থনান্তিক বক্তৃতা (post-prayer speech), গণপরিষদ (Constituent Assembly), বুনিয়াদি শিক্ষা (basic education), যমবিন্দু(freezing point)। এইরূপ আরও বহু শব্দ আছে। বিস্তৃত তালিকা উপস্থাপিত করার অবকাশ এখানে নাই। অবশ্য নিঃসংশয়ে বলা চলে যে একটু চিন্তা করিবার অবসর পাইলে এই সকল স্থলে সুন্দরতর অন্বর্থক শব্দ নিরূপণ করা খুব কঠিন ব্যাপার নহে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ রাখা দরকার। তিনি বলিয়াছেন—'ইংরেজীতে যে সব শব্দ অত্যন্ত সহজ ও নিত্যপ্রচলিত, দরকারের সময় বাংলায় তার প্রতিশব্দ সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তাড়াতাড়ি যা হয় একটা বানিয়ে দিতে হয়। সেটা অনেক সময় বেখাপ্পা হয়ে দাঁড়ায়, অনেক সময় মূল ভাবটা ব্যবহার করাই স্থগিত থাকে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় হয়তো তার অবিকল বা অনুরূপ ভাবের শব্দ দুর্লভ নয়।' বস্তুতঃ সংস্কৃতের সাহায্যে প্রকৃতার্থবোধক শব্দ-প্রণয়ন দুঃসাধ্য নহে। উদ্ধৃত শব্দগুলির স্থলে আমি কয়েকটার কিছু কিছু পরিবর্তন এই প্রসঙ্গে প্রস্তাব করিতে পারি। যথাপূর্ব বা যথাস্থিত ব্যবস্থা, হিন্দুবহুল বা হিন্দুভূয়িষ্ঠ অঞ্চল, তাপনিয়ন্ত্রিত, প্রার্থনান্ত বক্তৃতা, সংঘটন পরিষদ বা গঠন পরিষদ—এই শব্দগুলি বোধ হয় ইতিপূর্বে উল্লিখিত নবপ্রবর্তিত শব্দ হইতে অধিক অর্থদ্যোতক ও ভাষার দিক হইতে দোষমুক্ত।

তবে এই ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। বাংলা শব্দটি ভাল হইল কি মন্দ হইল তাহাতে সাধারণের কিছু আসিয়া যায় না, সাহিত্যিকেরাও অনেক ক্ষেত্রেই ইহা লইয়া আলোচনা করার প্রয়োজন

অনুভব করেন না—অনেকে জনান্তিকে বাংলা লেখকদের যথেচ্ছচারিতার ইঙ্গিত করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করেন। জীবিত ভাষার দোহাই দিয়া এইরূপ আলোচনাকে পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরমাত্র বলিয়া উপহাস করিয়া আলোচনার মুখ বন্ধ করিবার লোকেরও অভাব নাই। আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি—জীবিত ভাষার নির্বাধ স্বতন্ত্র গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা বাতুলতামাত্র—উচ্ছৃঙ্খলতাই ইহার শোভা, নিয়মনিষ্ঠা ইহাকে পঙ্গু ও বিকৃত করিয়া ফেলিবে। তবে স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করিলেও উচ্ছৃঙ্খলতার আধিপত্য কোনও ভাষাই উপেক্ষা করে বলিয়া মনে হয় না। তাই পণ্ডিতসমাজে ভাষার খুঁটিনাটি লইয়া আলোচনার প্রচলন সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, প্রায় দেড়শত বৎসর হইল শিক্ষিত বাঙালি বাংলা ভাষার চর্চায় ধীরে ধীরে মনোনিবেশ করিতে থাকিলেও এ বিষয়ে তাহার তেমন দৃষ্টি পড়ে নাই। এ বিষয়ে বাঙালির মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন—'পদ্মবনে মত্তকরীসম বাংলা ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত করিতে পারেন অথচ ভ্রমক্রমে ইংরেজীর ফোঁটা বা মাত্রার বিচ্যুতি ঘটিলে ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলেন।'

কিন্তু আজ আমাদিগকে এ মনোভাব ত্যাগ করিতেই হইবে। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষা ও বিকাশসাধনের জন্য আমাদিগকে মনে-প্রাণে চেষ্টা করিতে হইবে। বিদেশী-ভাবধারাকে নিজের ভাষায় নিজের মত করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

এই কাজের জন্য বিশেষজ্ঞদের যথেচ্ছ যথাবসর চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। আজ দেশের শাসন ও রক্ষণের ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে—শিক্ষা-বিভাগের সহযোগিতায় বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি স্থায়ী সমিতি গঠন করিতে হইবে। সমিতির সদস্যগণের একমাত্র কাজ হইবে বাংলা ভাষায় আধুনিক ভাব-প্রকাশের উপযোগী শব্দ সংকলন করা। এজন্য তাঁহাদিগকে জাপান তুর্কিস্থান প্রভৃতি দেশের ব্যবস্থা আলোচনা করিতে হইবে—অন্যান্য প্রদেশের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে—অন্যান্য প্রদেশে অনুরূপ প্রয়োজনে সংকলিত ব্যবহৃত শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে—সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ মন্থন করিতে হইবে—সম্পূর্ণরূপে এই কাজেই তাঁহাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে—অন্য কাজের ভার তাঁহাদের আর

বহন করা চলিবে না—কারণ অন্য কাজের অবসরে এ কাজ করিবার মত সময় সুবিধা ও মানসিক অবস্থা খুব কম লোকেরই হইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা-সমিতির কর্মধারার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এটুকু নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে ঐ সমিতির কার্যের যাহা কিছু ত্রুটি দেখা গিয়াছে তাহার কারণ সমিতির সদস্যদের অনন্যকর্মা ও নিশ্চিন্ত হইয়া কাজ করিবার সুযোগের অভাব। ভবিষ্যতেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে আনুষঙ্গিক ত্রুটির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই—ইহা ধ্রুব সত্য।

ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ

বাংলা ভাষা যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষার শব্দসম্পদে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সম্পদকে সে গ্রহণ করিয়াছে প্রয়োজনমত নিজের উপযোগী করিয়া। পরের জিনিসকে সে আপন করিয়া ঘরে আনিয়াছে—তাহার আকৃতি ও প্রকৃতিকে সে এমন ভাবে বদলাইয়া দিয়াছে যে আজ বাঙালির মধ্যে চলা-ফেরায় তাহার কোন অসুবিধা নাই—তাহাকে কোথাও বেমানান বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ দু-চার জন সন্ধানী পণ্ডিত ছাড়া তাহার বংশের পবিচয় আর কেহ জানে না—জানিবাব দরকারও বোধ করে না। অবশ্য এ বিষয়ে বাঙালির যে কোনও নূতনত্ব বা বৈশিষ্ট্য আছে তাহা বলা চলে না। এই ভাবেই এক দেশের ভাষা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত অন্য দেশেব ভাষার সাহায্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। ইহার অন্যথা হইলে ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হয়—ইহাব সৌন্দয নষ্ট হয়।

দুঃখের বিষয়, ইংবেজ জাতি ও ইংরেজী ভাষার সম্পর্কে আসিয়া বাঙালি সকল ক্ষেত্রে এই চিরাচরিত নীতির সম্যক্ সদ্‌ব্যবহার করিতে পাবে নাই বা করে নাই। ফলে ইংরেজী-জানা শিক্ষিত বাঙালি পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তায় অজস্র ইংরেজী শব্দ মিশাইয়া যে ভাষা ব্যবহার করে ইংরেজী-না-জানা লোক তাহাব মর্ম গ্রহণ করিতে যথেষ্ট অসুবিধা বোধ করে। লিখিবার সময়ও অনেক স্থলে ইংরেজী হাবভাব ইংবেজী ঢঙে বাংলায় প্রকাশ করিয়া সে ভাষাকে কিম্ভুত-কিমাকার করিয়া তোলে। সাহেবী বাংলার মত এই বিদেশীয়ানা ভাষার পরিপুষ্টি সাধন না করিয়া তাহার বিকৃতি সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভাষারই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি আছে—বিদেশী উপকরণ গ্রহণ করিবার ও আত্মসাৎ করিবার একটা বিশিষ্ট শক্তি সকল ভাষারই আছে। নিজের বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করিলে সৌন্দর্য বা সম্পদ্ কোন দিক দিয়াই কোন লাভ হয় না। তাহা ছাড়া কোন ভাষাভাষীই এ বিষয়ে কোনরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে রাজী হয় না। ইংরেজ জাতি ও তাহার ভাষা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—বিভিন্ন দেশের সহিত ব্যবহারে ও ভাবের আদান-প্রদানে সেই সব দেশের ভাব ও

শব্দ তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু কোনরূপ বিদেশী ভাব ও শব্দের দ্বারা ইংরেজ তাহার রাজকীয় ভাষাকে (King's English) অভিভূত বা আচ্ছন্ন হইতে দেয় নাই। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ভাষার রাজ্যেও ইংরেজ স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক। তাহার এই স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কিছু কিছু বিদেশী শব্দ ইংরেজী ভাষা গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ভাষার কোনরূপ বিকৃতি ইংরেজ জাতি নির্বিবাদে মানিয়া লয় নাই। বিদেশীর ব্যবহারের ফলে এই বিকৃতি ক্বচিৎ কখনও ঘটিয়া থাকিলে ইংরেজ উহাকে চীনা, ভারতীয় বা মার্কিন প্রয়োগ বলিয়া ব্যঙ্গ বা উপেক্ষা করিতে দ্বিধা বোধ করে না। সকল দেশের ব্যবহারের সুবিধার জন্য ইংরেজীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (Basic English) প্রবর্তন করিতে ইংরেজের আপত্তি নাই, কিন্তু ইহাকে কখনই সে তাহার জাতীয় ভাষার স্থান বা অধিকার করিতে দিবে না। বস্তুতঃ দেশাত্মবোধের মতই ভাষার প্রতি একান্ত মমত্ববোধ ইংরেজ জাতির প্রকৃতিগত।

দীর্ঘকাল ইংরেজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে আমরা তাহার চরিত্রের বাহ্য আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছি, কিন্তু তাহার শ্রেষ্ঠত্বের মূল উৎসের সন্ধান করাব প্রয়োজন বোধ করি নাই। আমরা স্বদেশপ্রীতির গুণগান করি বটে, কিন্তু দেশের প্রতিটি জিনিসের প্রতি আমাদের গভীর মমত্ব-বোধ নাই। অন্যান্য বিষয়ের কথা যাহাই হোক না কেন ভাষা সম্পর্কে এ কথা আদৌ অস্বীকাব করিবার উপায় নাই।

সত্য বটে, আজ আর আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখি না—সত্য বটে, আজ আর বাংলা ভাষা পূর্বের মত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়—উচ্চশিক্ষিত অল্পশিক্ষিত ছোট বড় সকলেই আজ মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সাধনাসমৃদ্ধ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবে গৌরবান্বিত। কিন্তু তথাপি বাংলা ভাষাকে আমরা কার্যতঃ যথোচিত সম্মান দান করি নাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ভাষা মুখ্যতঃ অন্তঃপুরচারিণীই ছিল—গৃহকার্যের ক্ষুদ্র পরিধির বাহিরে তখনও পর্যন্ত তাহার স্বচ্ছন্দ চলাচলের দাবি আশানুরূপ স্বীকৃত হয় নাই—সকল কার্যে তাহাকে নিযুক্ত করিতে আমাদের দ্বিধা ও সংকোচের সীমা ছিল না। ভাষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগের অভাব, ইহার শক্তি সম্বন্ধে আমাদেব অবিশ্বাস, সর্বোপরি যথোচিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার অভাবে ইহাকে যথাযথ ব্যবহার

করিবার অক্ষমতা—আমাদের এই বিসদৃশ আচরণের জন্য দায়ী ছিল। তাই আমরা অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজীর অন্ধ অনুকরণ করিয়া বাংলার স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক রূপকে বিকৃত করিয়াছি—বিশুদ্ধ বাঙালি ধরনেও যে আধুনিক ভাবধারা-প্রকাশে কোন অসুবিধা হইতে পারে না এ ধারণা অনেকেরই ছিল না—এখনও আছে কি না সন্দেহ।

ইংরেজ জাতির সহিত সম্পর্ক-স্থাপনের সময় হইতেই আমরা বহু ইংরেজী শব্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তখনও বাংলা ভাষা শিক্ষিত বাঙালীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই—তাই কোন শব্দ সুন্দব কি অসুন্দর, মানানসই কি বেমানান, সে দিকে কেহ তেমন নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আজ বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পাইলেও ইংরেজীর অনুবাদে আমরা গড্ডলিকা-প্রবাহেব মত গতানুগতিক পথে চলিয়াছি—কেহ একটি শব্দ চালাইলেই নির্বিচাবে তাহাকে আঁকডাইয়া ধরিতেছি। শব্দটির সঙ্গে যাঁহাব পূর্বপবিচয় ঘটে নাই তিনি ইংরেজী মূল শব্দটির সাহায্যে অর্থ বুঝিয়া লন—ইংরেজী-না-জানা লোকেব পক্ষে উহাব অর্থ গ্রহণ করা কঠিন। কালক্রমে আমাদেব দেশে ইংরেজীর প্রচলন যখন বিলুপ্ত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে তখন এই জাতীয় শব্দ হয়ত সাধারণ বাঙালির নিকট, সংস্কৃতানভিজ্ঞ তিব্বতীয়েব পক্ষে সংস্কৃত গ্রন্থেব প্রাচীন তিব্বতীয় অনুবাদ যেরূপ দুর্বোধ্য, সেইরূপই দুর্বোধ্য হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ এখনই ত আমরা বাংলা সংবাদপত্র, পাশ্চাত্ত্য দর্শন, বিজ্ঞান বা অন্য বিষয়ের বাংলা গ্রন্থ, এমন কি বাংলা সাহিত্যের পাশ্চাত্ত্য রীতি-সম্মত সমালোচনা-গ্রন্থ স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারি না--একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধু পাবিভাষিক শব্দ নহে ইংরেজী বচনভঙ্গীও ইহার অন্যতম মুখ্য কারণ। চলতি বাংলায়ও অনেক ক্ষেত্রে ইংবেজী-গন্ধী ভাষা উহাকে শ্রীহীন না করিলেও সাধারণ বাঙালির নিকট দুর্বোধ্য করিয়া তুলিতেছে। 'নেতৃত্ব দিতে ইচ্ছা করা, 'আইন স্বহস্তে লওয়া', 'ঘোড়ার সামনে গাড়ী', 'চায়ের বাটিতে তুফান', 'কোন পাথরই ওলটাতে বাকি না রাখা', 'চটবার কারণ দেওয়া', 'পাদুকায় পদ প্রবিষ্ট করা'—প্রভৃতি প্রয়োগ সাহেবী বাংলার চরম নিদর্শন—সাধারণ বাঙালির ব্যবহারযোগ্য নহে। আমরা এখন কেবল 'পারলৌকিক তৃপ্তি'তে সন্তুষ্ট না হইয়া বিদেশী মতে 'পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি' কামনা করি—অথচ আমরা জানি আত্মার জন্মমৃত্যু নাই, সুখদুঃখ

নাই। 'অরণ্যে রোদন করা' আমাদের সহিয়া গিয়াছে, 'সুবর্ণসুযোগের' সদ্ব্যবহারেও তেমন আপত্তি নাই—কিন্তু 'উলঙ্গ সত্যকে' স্বীকার করা বা 'কুম্ভীরাশ্রু মোচন করা' আমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। 'সুপ্রভাতের' সহিত আমাদের নিত্য পরিচয়, কিন্তু তাই বলিয়া 'শুভরাত্রিকে'ও নিত্য-ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা শোভন বা সমীচীন নহে। 'ফুলশয্যা'তেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত—'মধুচন্দ্রিমা'র জন্য লালায়িত হওয়া আমাদের পক্ষে প্রশংসার বিষয় হইবে না। অবশ্য 'হনিমুনে'র জন্য কাহারও আগ্রহাতিশয্য থাকিলে বাধা দেওয়া সঙ্গত হইবে না।

বস্তুতঃ বাংলার প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, অর্থের অনুসন্ধান না করিয়া আক্ষরিক অনুবাদের রীতিতে অজস্র বিকৃত শব্দের সৃষ্টি ও প্রয়োগ করা হইতেছে। এইরূপেই নলকূপ (tubewell), নামভূমিকা (title-role), আখ্যাপত্র (title-page), অর্ধবাৎসরিক (half-yearly), পাদপ্রদীপ (foot-light), পুনর্মিলন (re-union), পুনর্লিখন (re-write), আন্তর্জাতিক inter-national), প্রাগৈতিহাসিক (pre-historic), গোল টেবিল বৈঠক (round table conference) প্রভৃতি শব্দের প্রচলন হইতেছে। স্থানবিশেষে আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়োজন থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাবানুবাদই সাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য—তাহা ছাড়া, হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ অনেক স্থলেই বিসদৃশ ও হাস্যকর হইয়া উঠে। উহার সাহায্যে সাধারণ লোকের কোন বিষয় বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোন সুবিধা হয় না। অনুবাদের মূলীভূত ভাষায় কোন শব্দ বা তাহার অংশ অর্থহীন বাক্যালঙ্কারমাত্র হইতে পারে—কোন শব্দের গঠনে ত্রুটি থাকিতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা বাতুলতামাত্র। এক দেশের ভাবধারা, রীতিনীতি, বচন-বিন্যাস-প্রণালীর সহিত অন্য দেশের প্রচুর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য এক দেশের ভাষার শব্দকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করিবার সময় এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ অবহিত না হইলে রূপান্তর বা অনুবাদ নিরর্থক ভারস্বরূপ হইয়া পড়ে। তাই ইংরেজী paying guest-এর আক্ষরিক অনুবাদ হিসাবে 'অর্থদায়ী অতিথি' বলিলে লোকে হাসিবে। ইংরেজের guest আর বাঙালির অতিথি এক নয়—অতিথির নিকট হইতে অর্থগ্রহণ ভারতীয় সংস্কারের বিরোধী, অথচ আত্মীয়স্বজনের গৃহে খাইখরচ দিয়া থাকা একেবারে অপ্রচলিত নয়। অনাত্মীয় অপরিচিতের গৃহে এইরূপ ব্যবস্থা এখনও সমাজে

প্রচলিত হয় নাই। সুতরাং আত্মীয়ের বা বন্ধুর বাড়ীতে আত্মীয় বা বন্ধু খাইখরচ দিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে অর্থদায়ী অতিথি বলা চলিবে না। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকাকে ইংরেজীর অনুকরণে নাম-ভূমিকা-(title-role)-রূপে নির্দেশ করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না। (tubewell)-এর সঙ্গে নলকূপের বিম্ব-প্রতিবিম্ব সম্বন্ধ থাকিলেও হাল-আমলের ব্যবহৃত 'পাতাল-কল' শব্দ বেশী অর্থদ্যোতক বলিয়া মনে হয়। অর্ধ-বাৎসরিক শব্দ half-yearly-র অন্ধ অনুকরণ মাত্র—ষাণ্মাসিক শব্দ বাংলাভাষীর নিকট অধিকতর পরিচিত ও স্পষ্ট। প্রাগৈতিহাসিক, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি শব্দ pre-historic, inter-national-এর অনুকৃতিপ্রসূত, কিন্তু ভারতীয় ভাষার রীতিবিরোধী। ইতিহাস-পূর্ব pre-historic-এর স্থান অনায়াসে অধিকার করিতে পারে। এই জাতীয় অন্যান্য শব্দের স্থলেও অনুরূপ প্রয়োগ চলিতে পারে। নিখিল জাতিনিষ্ঠ বা নিখিল জাতিগত বা চলন্তিকায় নির্দিষ্ট অধিরাষ্ট্রীয় শব্দ আন্তর্জাতিক শব্দের কাজ চালাইতে পারে কিনা সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। আন্তর্জাতিকের দৃষ্টান্তে আন্তঃপ্রাদেশিক, আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তঃডোমিনিয়ন প্রভৃতি যে সমস্ত বিকটাকাব শব্দের আবির্ভাব বাংলাভাষা-ভাষীকে শঙ্কিত ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছে তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার একটা ব্যবস্থা করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অবশ্য ভাষার দরবারে যেরূপে ইহারা জাঁকিয়া বসিয়াছে তাহাতে ইহাদের হটান মোটেই সহজ নহে। সম্মেলনকে বাতিল করিয়া দিয়া পুনর্মিলন শব্দেব প্রবর্তনের দ্বারা re-union-এর কথঞ্চিৎ মর্যাদা-রক্ষাব চেষ্টা দেখা গেলেও বাংলার গৌরব রক্ষিত হইতেছে না। অনুবাদ হিসাবে বৃহৎ নেতৃত্ব High Command-এর অনুগত হইতে পারে, কিন্তু মূল কর্তৃপক্ষ বা মুখ্য নেতৃবর্গ বাংলা ভাষায় মানায় ভাল। যুগ্মসম্পাদক প্রভৃতি যে সকল শব্দ joint secretary প্রভৃতির অনুবাদ হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে সেগুলিতে যুগ্মশব্দের পূর্বপদ হিসাবে প্রয়োগ বাংলার রীতি-বিরোধী। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগী সম্পাদক বা সম্পাদকযুগল শব্দ সুবিধামত ব্যবহার করা যাইতে পারে। Home Department, Home Minister প্রভৃতি শব্দে Home-এর প্রতিশব্দরূপে 'স্বরাষ্ট্র' পররাষ্ট্রের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে কিনা বিবেচ্য। অন্তরঙ্গ শব্দের প্রয়োগ এস্থলে চলিতে পারে কিনা ভাবিয়া দেখা দরকার। একই শব্দের অনুবাদে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শব্দের দরকার হইতে পারে—একই প্রতিশব্দ সকল স্থলে চলিতে পারে না।

Interesting শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। সম্প্রতি সরকারী ঋণের বিজ্ঞাপনে এই বিষয়ে অনবধানতার একটি চমৎকার উদাহরণ পাওয়া গেল। বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'ঋণ নগদ চাঁদার পরিবর্তে পাওয়া যাইবে।' সাধারণ পাঠক হয়ত স্বাধীনতার শুভ সূচনায় সরকারকে চাঁদা দেওয়ার কথায় বিস্মিত হইবেন। চাঁদা দিয়া ঋণ কিরূপে পাওয়া যায় তাহা ভাবিয়া হয়ত বা আকুল হইবেন। কারণ বাঙালি জানে চাঁদা সাহায্য হিসাবেই দিতে হয়। নগদ টাকার পরিবর্তে ঋণপত্র পাওয়া যাইবে ইহাই লেখকের বক্তব্য—ইংরেজীর হুবহু অনুবাদ বিরুদ্ধ ধারণা জন্মাইবার কারণ। রেশন কর্তৃপক্ষ কলিকাতার অধিবাসীদের মাঝে মাঝে তাহাদের কার্ড পুনর্লিখনের জন্য জমা দিতে বলেন—জনসাধারণ বিজ্ঞাপন দেখিয়া নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। পুরাতন কার্ডের পরিবর্তে নূতন কার্ড লিখাইতে, কার্ড সংশোধন করাইয়া লইতে বা উহাতে নূতন বিষয় সংযোজন করাইয়া লইতে অনুরোধ করিলে কাহারও বুঝিতে অসুবিধা হয় না মনে হয়। 'হিমকক্ষ' শব্দের দ্বারা refrigerator কোনরূপে বুঝান গেলেও refrigeration, refrigerated প্রভৃতি শব্দের বেলায় অসুবিধায় পড়িতে হয়। শীতকযন্ত্র, শীতন, শীতিত এই তিনটি শব্দের দ্বারা বোধ হয় সংক্ষেপে সকল কাযই চলিতে পারে। Martyr-এর স্থানে শহীদ শব্দের বহুল প্রয়োগ চলিতেছে। উহার পরিবর্তে আত্মোৎসর্গী শব্দ ব্যবহার করিতে কেহ সম্মত হইবেন কিনা জানি না—তবে শব্দটির অর্থ বুঝিতে বাঙালি জনসাধারণের বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না বোধ হয়। Tear-gas-কে কাঁদুনে গ্যাস বলিয়া প্রচার করায় ভাষাতত্ত্ববিদ্ যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় আপত্তি করিয়াছেন—কারণ গ্যাস ত কাঁদে না। কাঁদানো গ্যাস বলিলে এ আপত্তি এড়ান যাইতে পারে। হাসানো গ্যাস্ laughing-gas-এর প্রতিশব্দ হইতে পারে। Air-tight-কে বায়ুরুদ্ধ না বলিয়া বায়ুরোধী বলিলে সঙ্গত ও শোভন হয় না কি? Public health, public instruction প্রভৃতি শব্দে public কথাটির খুব বেশী তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হয় না—থাকিলেও তাহাকে 'জন' দিয়া অনুবাদ করার সার্থকতা দেখা যায় না—স্বাস্থ্যবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ বলিলে বুঝিবার কোনও অসুবিধা হয় না। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত লোকশিক্ষা, লোকসাহিত্যের লোক শব্দটিকে উপেক্ষা করিবারই বা কি কারণ থাকিতে

পারে? স্থিতাবস্থা, গণপরিষদ্ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের আলোচনা পূর্ব প্রবন্ধে করিয়াছি।

মোটকথা, দেশ স্বাধীন হইবার পর দেশের ভাষা-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক। এত দিন ভাষাকে উপেক্ষা করিলেও বিশেষ কিছু আসিয়া যাইত না। লেখক যাহা খুশী লিখিলেন—পাঠক কতকটা বুঝিল, কতকটা বা অনুমান করিয়া লইল—তাহাতে কাহারও বিশেষ কিছু ব্যস্ত হইবার কারণ ছিল না। গভীর তত্ত্বালোচনা বাংলা ভাষার মাধ্যমে করিবার প্রয়োজন ছিল না—আইনের খুঁটিনাটি বিচার বাংলায় দরকার হইত না—শব্দপ্রয়োগের গূঢ় রহস্য বা সূক্ষ্ম তাৎপর্য-বিশ্লেষণের উপযোগিতা বাঙালি পাঠক বা লেখককে তেমন অনুভব করিতে হয় নাই। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন বাংলার মধ্য দিয়া বিভিন্ন বিদ্যার অনুশীলন করিতে হইবে—দেশের আইন-কানুন বাংলা ভাষায় উপনিবদ্ধ হইবে—বিচার-আচার-ব্যবসা-বাণিজ্য বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া চালাইতে হইবে—ফলে প্রতিটি শব্দ ওজন করিয়া বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্যবহার করিতে হইবে—শব্দের অস্পষ্টতা, ভাষার দুরূহতা প্রতি পদে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করিবে। অনেক শব্দ আমরা ইংরেজী হইতে গ্রহণ করিয়াছি—আরও অনেক শব্দ অবিকৃত ভাবেই আমাদিগকে লইতে হইবে। কিন্তু আধুনিক ভাব-প্রকাশের উপযোগী শব্দ-গঠনের দায়িত্বও কম নয়—এরূপ অসংখ্য শব্দ আমাদিগকে গঠন করিতে হইবে। অসীম শক্তি ও অতুল সম্পদের আধার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য হইতে এ বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারিব। সে সাহায্য যাহাতে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইতে পারি সেজন্য আমাদিগকে সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিতে হইবে, নূতন সৃষ্ট শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে,—তাহার বিশুদ্ধি ও অর্থ-প্রকাশ-ক্ষমতা সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে। কেবল পারিভাষিক শব্দ সংকলন করিলেই চলিবে না—দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন পণ্ডিত একক বা সমবেত ভাবে এ বিষয়ে যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন—বর্তমানে সরকারের দৃষ্টিও এদিকে পড়িয়াছে। কিন্তু যে অগণিত সাধারণ শব্দরাশি আমরা অহরহ ব্যবহার করিতেছি কোন বিশিষ্ট শাস্ত্র বা বিদ্যার সহিত যাহাদের বিশেষ যোগাযোগ নাই তাহাদের সম্বন্ধেও উদাসীনতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত হইবে না—ভাষার প্রাণসঞ্চারে তাহাদের উপযোগিতা ভুলিলে চলিবে না। তাহাদের গুরুচাপে ভাষা যাহাতে বিকৃত ও পঙ্গু না হইয়া যায় সেদিকে আমাদিগকে

বিশেষ অবহিত হইতে হইবে। প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংবর্ধনার উত্তরদান-কালে এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহার দিকে বাংলা ভাষার অনুরাগী ও পরিপুষ্টিকামী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি—

'বাঙলা সাহিত্যকে ইংরেজীর আওতায় রাখব না—এ সংকল্প আমাদের গ্রহণ করতে হবে।…ভাষার যাহাতে বিশুদ্ধিরক্ষা হয় সে বিষয়ে আপনারা সাবধান হবেন। তবেই এ ভাষা ঠিক থাকবে।…বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ যদি ২।৪।৫ জন লোক নিয়ে ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য সমিতি গঠন করেন ভাল হয়। তাঁরা বানান ঠিক করে দিবেন—অর্থ ঠিক করে দিবেন।…সমিতি মাঝে মাঝে ভুল দেখিয়ে দিবেন। এতে কিছু ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ হবে না।'

কোন ব্যক্তি বা সমিতির নির্দেশ ভাষার পক্ষে সর্বথা মানিয়া চলা সম্ভবপর না হইলেও উহা উপেক্ষার যোগ্য নহে—যেহেতু এইরূপ নির্দেশই সর্বত্র ভাষাকে উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হইতে রক্ষা করে। তাই স্বাধীনতার উদ্দাম আবেগস্রোতের মধ্যেও আলোকস্তম্ভের মত এই জাতীয় নির্দেশদাতার প্রয়োজন আছে। প্রয়োগকারী ও নির্দেশদাতার ঘাতপ্রতিঘাতেই ভাষার কমনীয় রূপ বিকশিত হইয়া উঠিবে।

বাংলা পরিভাষা

ইংরেজ জাতির সহিত আমাদের দেশের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পর হইতেই বিকৃত ও অবিকৃত ভাবে অনেক ইংরেজী শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া অজস্র ইংরেজী শব্দ বাংলায় অনূদিত হইয়া বাংলাব শব্দভাণ্ডারকে পুষ্ট করিতেছে। সাধারণতঃ লেখকগণ যে যাহার প্রয়োজনমত শব্দের অনুবাদ করিয়া থাকেন—সংঘবদ্ধ চেষ্টাও মাঝে মাঝে কিছু কিছু দেখা যায়। তবে দেশের জনসাধারণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ সম্পর্কে বিশেষ কোনও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যই শিক্ষাভিমানী সমাজের মুখ্য উপজীব্য—দু'চার জন ছাড়া তাঁহাদের অধিকাংশই বাংলার ধার ধারেন না—বাংলায় কোন গভীর বিষয়ের গুরু আলোচনার প্রয়োজন বা তাগিদ তাঁহাদের অনেকেরই নাই। বাংলায় কিছু বলিতে বা লিখিতে হইলে বিপন্ন বোধ করেন এরূপ লোকের সংখ্যাও শিক্ষিতের মধ্যে যথেষ্ট। তার পর ইংরেজী ভাবে ভাবিত, ইংরেজীর মোহে আচ্ছন্ন হইয়া অনেকে যাহা লেখেন তাহা বাঙালির বাংলা প্রায়শই হয় না—তাহার মধ্যে সাহেবী গন্ধ পুরা-দস্তুর বর্তমান। বাংলার এই অবস্থার কথাই অতি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়া শ্রীবুদ্ধদেব বসু লিখিয়াছেন—

'বাংলায় লিখতে ব'সে দেখি ইংরেজীতে ভাবছি, অথচ ইংরেজীতেও কথাটা পুরোপুরি বলতে পারি তা নয়। বাংলা লেখা আমাদের শিখতে হয় অতি কষ্টে প্রাণপণ পরিশ্রমে···ভাষাকে শিল্পরূপে গড়ে তোলা এমনিতেই শক্ত কাজ, আমাদের দেশে তার ওপরে বিদেশী ভাষার মধ্যবর্তিতা জড়িত হ'য়ে ব্যাপারটিকে আরও দুরূহ ক'রে তোলে।···এখন পর্যন্ত আমাদের সাধারণ শিক্ষিত লোকদের বেশির ভাগই, ভাল বাংলা দূরে থাক, নির্ভুল বাংলাও লিখতে পারেন না—ছাপার অক্ষরের বইয়েও শুধু অপটুতা নয়, প্রমাদও লক্ষিত হয় প্রচুর।' (সব পেয়েছির দেশ, পৃঃ ৮৫-৮৬)।

দুঃখের কথা, ভাষার সৌন্দর্য ও পরিপুষ্টির দিকে দেশের জনসাধারণ বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি তেমন ভাবে পড়ে নাই। এক জনের ব্যবহৃত শব্দ

সুন্দর হইল কি অসুন্দর হইল, শুদ্ধ হইল কি অশুদ্ধ হইল তাহা লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন কচিৎ দুই-এক জন মাত্র অনুভব করিয়াছেন। ফলে আজ যে কত অসঙ্গত, অসুন্দর ও অশুদ্ধ শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ভ্রূকুটি বা অনুনয় এ বিষয়ে বিশেষ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বহুল প্রচলিত শব্দের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা, কৃষ্টি, সহানুভূতি, অন্তরীণ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্ট ভাষায় তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অথচ কয়জন তাহার খবর রাখে বা রাখার প্রয়োজন বোধ করে ?

রবীন্দ্রনাথের কথারই পুনরুক্তি করিয়া আমরা বলিতে পারি—ভাষা যে সব সময় যোগ্যতম শব্দের বাছাই করে কিংবা যোগ্যতম শব্দকে বাঁচাইয়া রাখে তা নয়। তথাপি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের দোষগুণ সম্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন করা যে কোন ভাষাভাষীর পক্ষে মোটেই প্রশংসার বিষয় নহে। এ দিকে সতর্ক দৃষ্টি ও মমত্ববোধ থাকিলে তবেই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবপর, অন্যথা নহে। আজ স্বাধীনতালাভের পর যখন বাংলা ভাষার প্রসারবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী—যখন ইংরেজীকে একেবারে না ছাড়িলেও বাংলা ভাষার মধ্য দিয়াই আমাদিগকে প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্য নির্বাহ করিতে হইবে তখন আর কাহারও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে অনবহিত হওয়া সঙ্গত ও শোভন নয়। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে সরকারী অনুবাদ সমিতি, জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর-প্রবর্তিত সারস্বত সমাজ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ইংরেজী শব্দের সুষ্ঠু বাংলা প্রতিশব্দ-প্রণয়নে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ চেষ্টার সূত্রপাত করেন তখন যথেষ্ট চাহিদার অভাববশতঃ এই সকল প্রচেষ্টা কল্পনাবিলাসীর বিলাস হিসাবে জনসমাজ কর্তৃক অনাদৃত উপেক্ষিত হইয়া থাকিলেও তেমন দোষ দেওয়া চলে না। কিন্তু বর্তমানে শোভন অনুবাদের মধ্য দিয়া কেবল বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনের জন্য নহে আধুনিক জগতের ভাবধারা বাঙালির কাছে বাঙালির মত করিয়া বলিবার প্রয়োজনে উপযুক্ত শব্দের চাহিদা ও মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জন-সাধারণের ঔদাসীন্যের ভাব এখনও তেমন কাটে নাই। ফলে, কয়েক বৎসর পূর্বে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দেশীয় ভাষার পূর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থার জন্য যখন বিভিন্ন বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইল তখন

দেশের লোক শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে বরণ করিয়া লয় নাই—নিন্দা করিয়াছে, ব্যঙ্গ করিয়াছে, কিন্তু দোষ থাকিলে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করে নাই—দোষগুলি নির্দেশ করিয়া দেওয়ার ক্লেশ পর্যন্ত স্বীকার করে নাই। সদ্য-প্রকাশিত 'সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা' সম্বন্ধেও অনুরূপ মনোভাব ও ব্যবহার লক্ষ্য করিতেছি। বিভিন্ন পত্রিকা একরূপ সমস্বরে ইহাকে নিন্দা করিয়াছেন—উপহাস করিয়াছেন। পথে-ঘাটে বন্ধুবান্ধব, সরকারী কর্মচারী, উকিল-মোক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী যাহারই সঙ্গে কথা হয় তিনিই ইহার নিন্দা করেন—ইহা অচল, অব্যবহার্য বলিয়া মত প্রকাশ করেন। সংস্কৃতের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাতিতা, প্রচলিত ইংরেজী বা অন্য দেশীয় শব্দের প্রতি উপেক্ষা ও খাঁটি বাংলার প্রতি অশ্রদ্ধা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সরকারী পরিভাষার প্রধান দোষরূপে সাধারণতঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে। তবে ইহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে অনেকের কাছেই জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও সদুত্তর পাওয়া যায় না। কোন্ কোন্ শব্দের অনুবাদের প্রয়োজন নাই—কোন্ কোন্ শব্দের অনুবাদের কিরূপ পরিবর্তন সম্ভবপর হইতে পারে এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও খুঁটিনাটি আলোচনায় বিশেষ কেহ অগ্রসব হইতে চাহেন না। সত্য বটে, অনেকের পক্ষেই এরূপ আলোচনা করা সম্ভবপব নহে। হয়ত বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদের মতামত সবকারের পরিভাষাসংসদের নিকট সরাসরি পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু দেশেব সাধারণ লোকের যে আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ আছে তাহার তেমন কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সভাধিবেশনের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, কিন্তু কোথাও এই পরিভাষার আলোচনার ইঙ্গিতমাত্র দেখা যায় না। সাধারণের আগ্রহের ফলে ছোট বড় নানা বিষয় সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দের মতামত সাড়ম্বরে পত্রিকায় প্রচারিত হয়। সরকারী পরিভাষা সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্ববিদ্ বা সাহিত্যিকগণের অভিমত বা সমালোচনা কিন্তু পত্রিকাধ্যক্ষগণ সংগ্রহ করিয়া পত্রিকাস্থ করার বিশেষ কোনও প্রয়োজনই অনুভব করেন নাই। সাধারণের আগ্রহের অভাবই কি ইহার মুখ্য কারণ নয়? অথচ এরূপ সমালোচনা উপযুক্ত পরিভাষা-নিরূপণের কাজে হয়ত প্রচুর সহায়তা করিতে পারিত।

একথা কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে প্রস্তাবিত পরিভাষা সম্বন্ধে আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। প্রথমেই পূর্বাচার্যগণ, বিশেষ করিয়া

রবীন্দ্রনাথ, এ বিষয়ে যে সাধারণ সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করা কর্তব্য। তাঁহার প্রথম ও প্রধান কথা—'বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির হয় নাই, অতএব পরিভাষার প্রয়োগ লইয়া আলোচনা কর্তব্য, কিন্তু বিবাদ করা অসঙ্গত।' আজ কবিগুরুর এই উপদেশ মাথায় করিয়া আমাদের কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। নূতন শব্দগঠনের সময় ভাষার প্রকৃতি, সৌন্দর্য, বিশুদ্ধি ও অর্থের স্পষ্টতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অবশ্য সব সময় সকল দিক্ রক্ষা হইবে না—তবে তাই বলিয়া বিচলিত হইবার কোনও কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নতুন তৈরি শব্দ নতুন নাগরা জুতোর মতোই অস্বস্তি ঘটায়।' 'বার বার ব্যবহারের দ্বারাই শব্দবিশেষের অর্থ আপনি পাকা হইয়া উঠে, মূলে যেটা অসঙ্গত অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে।' (শব্দতত্ত্ব, পৃঃ ১৬৬, ১৮৭)। অবশ্য এই অজুহাতে যদৃচ্ছাচার শোভা পায় না বা সমর্থন করা চলে না। যথাসম্ভব নির্দোষ শব্দগঠনের চেষ্টা করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। এজন্য বিপুল সমৃদ্ধিশালিনী সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। রবীন্দ্রনাথ তাই স্পষ্টই বলিয়াছেন—'একথা স্বীকার করতেই হবে সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল। কি জ্ঞানের কি ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ ক'রতে হচ্ছে। পাশ্চাত্ত্য ভাষাগুলিকেও এমনি ক'রেই গ্রীক-লাটিনের বশ মানতে হয়।' (বাংলা ভাষাপরিচয়, পৃঃ ৫০)। কারণনির্দেশ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার প্রকৃতিগত একটা দৌর্বল্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন—'বিশেষ্যকে বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে পরিণত করবার সহজ উপায় আমাদের ভাষায় নেই বললেই হয়। তাই বাংলা ভাষার আপন রীতিতে শব্দ বানানো প্রায় অসাধ্য।' (বাংলা ভাষাপরিচয়, পৃঃ ১০৪)। তাই দেখিতে পাই বিগত দেড় শত বৎসর ধরিয়া যখনই বাংলায় নূতন শব্দের প্রয়োজন হইয়াছে তখনই সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে—শুদ্ধ ভাবে হউক বা অশুদ্ধ ভাবে হউক, মূল অর্থ বজায় রাখিয়া হউক বা উহাকে সঙ্কুচিত, প্রসারিত বা বিকৃত করিয়া হউক সংস্কৃতমূলক শব্দকেই বাঙালি তাহার ভাষার মধ্যে বরণ করিয়া লইয়াছে। বর্তমানেও যে এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে তাহা মোটেই বলা চলে না। ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার সম্পর্কস্থাপনের পর যে সমস্ত নূতন শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহাদের কোনও তালিকা এখন পর্যন্ত সঙ্কলিত

হয় নাই সত্য, তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এই জাতীয় শব্দের মধ্যে অধিকাংশই সংস্কৃত বা সংস্কৃতের আদর্শে রচিত। যাঁহারা চলতি বা কথ্য বাংলার একান্ত পক্ষপাতী তাঁহারাও যে দরকারমত অজস্র সংস্কৃত শব্দ গঠন ও প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, অতি আধুনিক মতাবলম্বীদের লেখা হইতেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আকুতি (আকূতি?), উদ্‌গাতা, ঋত্বিক্‌, স্নাতক, সমাবর্তন প্রভৃতি লৌকিক সংস্কৃতে অপ্রচলিত বৈদিক শব্দ পর্যন্ত আজ অবাধে বাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে। সাধারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনেও সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মুখে আমরা যাহাই বলি না কেন সংস্কৃতের প্রতি আমাদের অন্তরের টান অস্বীকার করিবাব উপায় নাই—পরিভাষারচনায় বা নূতন শব্দগঠনে তাই সংস্কৃতের প্রভাব অপরিহার্য।

তাই বলিয়া প্রচলিত শব্দের স্থলে নূতন অপরিচিত সংস্কৃত শব্দ গঠন করিয়া চালাইতে হইবে এরূপ কথা বলা চলে না। অবশ্য প্রচলিত শব্দের দ্বারা সমস্ত কাজ চলে কিনা এবং প্রচলিত বলিতেই বা ঠিক কি বুঝায় তাহা ধীর ভাবে পর্যালোচনা কবা দরকার। পুলিশ শব্দটি প্রচলিত সন্দেহ নাই, কিন্তু পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টকে প্রচলিত বলিলে ভাষার মর্যাদা রক্ষা হয় কি? Deputy Superintendent of Police, Inspector-General of Police প্রভৃতির বেলায় কোনও অজুহাতেই অনুবাদ ঠেকাইয়া রাখা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। আর এগুলি অনুবাদ করিতে গেলে পুলিশ শব্দটিকে বাঁচাইয়া রাখা সুকঠিন। এইরূপ magistrate, deputy-magistrate প্রভৃতি শব্দও বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া না যাওয়ায় তাহাদেরও অনুবাদ না করিয়া বাংলা ভাষায় কাজ চালান চলে না। ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালির মুখে সাধারণ কথাবার্তার মধ্যেও অনেক ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হয় সত্য, তবে সেগুলিকে বাংলা ভাষার অঙ্গ বা আভরণ কোনক্রমেই বলা চলে না—সেগুলি পরাধীন জাতির পরানুকরণের মোহ ও বিকারের সাক্ষ্য বহন করে মাত্র। জোর করিয়া সেগুলিকে ভাষায় চালাইতে গেলে তাহাতে ভাষা পরিপুষ্ট না হইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে—ভাষার শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া বিকৃতিই প্রকট হইয়া উঠিবে। তাই আমরা কথাবার্তায় যত ইংরেজী শব্দই ব্যবহার করি না কেন লেখার বেলায় যথাসম্ভব বাংলা শব্দ ব্যবহার করিতে সাধারণত ত্রুটি করি না। meeting, secretary, editor, election,

report, proceedings, result, class, subject প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ আমরা কথ্য ভাষায় ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু লেখার সময় সভা, সম্পাদক, নির্বাচন, মনোনয়ন, কার্যবিবরণ, ফল, শ্রেণী, বিষয় প্রভৃতি ব্যবহার করিতে কোনও দ্বিধা করি না অথচ কথ্য ভাষায় এ সব শব্দ ব্যবহার করিতে যে একটা সংকোচ বোধ করি না এমন কথা কয়জন হলপ করিয়া বলিতে পারেন ?

অনুবাদ-প্রবণতা শুধু বাংলাদেশে নয় বাংলার বাহিরেও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। যে সমস্ত ইংরেজী শব্দ আজ বিভিন্ন দেশীয় ভাষার অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে তাহাদের দেশীয় রূপ-প্রচারের অসীম আগ্রহ সর্বত্র অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। তাই স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হোটেল, থিয়েটার, সিনেমা আজ দেশীয় ভাষায় সাদরে গৃহীত হইলেও বিদ্যালয়, বিদ্যানিকেতন, বিদ্যাপীঠ, পাঠশালা, মহাবিদ্যালয়, আরোগ্যশালা, ভোজনাগার, নাট্যনিকেতন, চিত্রমন্দির, ছবিঘর প্রভৃতি অনুবাদাত্মক শব্দ ব্যবহারের দিকেও ঝোঁক নিতান্ত কম নয়। মধ্যপ্রদেশ সরকার তাঁহাদের এলাকার সরকারী কলেজগুলির দেশী নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। নাগপুর মরিস কলেজ, জব্বলপুর রবার্টসন কলেজ, অমরাবতী এডওয়ার্ড কলেজের পরিবর্তিত নাম নাগপুর মহাবিদ্যালয়, মহাকোশল মহাবিদ্যালয় ও বিদর্ভ মহাবিদ্যালয় নিশ্চয় লোকরুচির পরিপন্থী নহে। বোম্বাই শহরে রেস্তোরাঁ অবাধে উপাহারগৃহ-রূপে চলিতেছে—সরবতের দোকান রসপানগৃহরূপে পরিচিত। পূর্বে যে সমস্ত দোকান ইংরেজী নাম লইয়া সাধারণের মধ্যে মর্যাদা লাভ করিত কিছুকাল যাবৎ তাহাদের স্বজাতীয় অনেকেরই বাংলা নামকরণকেই অধিকতর লোকরঞ্জন মনে করিয়া আরামঘর, তৃপ্তিসদন, বসনালয়, বাসনালয়, সীবনালয়, সূচীশিল্পসদন, রূপায়তন, মিষ্টান্নাগার, বস্ত্রাগার, বস্ত্রপ্রতিষ্ঠান, পরিচ্ছদভবন, মাতৃভাণ্ডার, কমলাভাণ্ডার, বিক্রমপুর-ভাণ্ডার, খাদ্যপ্রতিষ্ঠান, পাদুকাপ্রতিষ্ঠান, উপানৎশিল্পসদন, মুদ্রণী, মুদ্রণালয়, গ্রন্থগেহ, প্রকাশনী, ক্ষৌরকর্মশালা, ধৌতাগার প্রভৃতি নাম সাড়ম্বরে প্রচার করিতেছি। এই সকল ব্যাপার হইতে দেশের লোকের প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—তাহার মানসিক গতির প্রত্যক্ষ আভাস মিলে। নির্বাধে নিজের রুচির অনুসরণ করিতে দিলে নিজের অজ্ঞাতসারেই সে ইংরেজী শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃতমূলক গালভরা শব্দের দিকে আকৃষ্ট হইবে।

পরিভাষা-রচনায়ই হউক আর সাধারণ ইংরেজী শব্দের অনুবাদেই হউক মূল শব্দের প্রকৃত তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—কেবল আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া দেশের প্রকৃতি, রীতিনীতি অনুসারে নূতন শব্দ গঠন করিতে হইবে। ইংরেজী হাবভাব আদবকায়দা আজ আমাদিগকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্র ও তাহার দেশী পরিভাষা-রচনার সময় আমাদিগকে ভাবিতে হইবে—আমাদের কাজকর্ম কি চিরদিনই বিলাতী ছাঁচে চলিবে? বিলাতী নামগুলিই অন্য ভাষায় আমাদিগকে চালাইয়া যাইতে হইবে? ইংরেজীর ভুলত্রুটি অসম্পূর্ণতাও কি নির্বিবাদে উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদিগকে বহন করিয়া যাইতে হইবে? Gazetted officer এবং non-gazetted officer এই পার্থক্য কি চিরকাল আমাদিগকে ঠিক এই নামেই বা ইহার আক্ষরিক অনুবাদ দিয়াই বজায় রাখিতে হইবে? আমাদের দেশে ত উত্তম মধ্যম বা প্রথম দ্বিতীয় প্রভৃতি নামে শ্রেণীবিভাগ অধিকতর সুপরিচিত এবং সাধারণের নিকট সহজবোধ্য।

পূর্ব আমলে নানা সময়ে যখন নূতন নূতন পদের সৃষ্টি ও নামকরণ হইয়াছে তখন যে বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া তাহা করা হইয়াছে এরূপ মনে হয় না। যখন আমাদিগকে নূতন ভাবে সমস্ত জিনিস গড়িয়া তুলিতে হইবে, তখন এ বিষয়ে যথাসম্ভব শৃঙ্খলা ও সারল্যবিধানের চেষ্টা করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। Superintendent, manager, director, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কর্মগত যে সূক্ষ্ম পার্থক্যই থাকুক না কেন, ইহারা সকলেই প্রাচীন মতে অধ্যক্ষ বা মুখ্যাধিকারী—ইহাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র শব্দ-উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। Care-taker (Writers' Buildings) এবং Superintendent (Governor's Estate) দুইয়ের মধ্যে কর্মগত এমন কি বিভেদ আছে যাহাতে দু'জনকেই তত্ত্বাবধায়ক বলা চলে না? অপরপক্ষে Superintendent (Government House Gardens) হিসাবে স্বতন্ত্র পদের দরকার থাকিলেও সেই পদাধিকারীও কি তত্ত্বাবধায়কমাত্র নহেন? Chief Executive Officer (Calcutta Corporation)—এরূপ স্থলে executive শব্দটির বিশেষ কোনও সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না—অনুবাদে ইহাকে বর্জন করিলে অঙ্গহানির আশঙ্কাও করা যায় না। বিষয়পতি বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের করণীয় বিচিত্র কর্মরাশির পূর্ণ পরিচয় কেবল গুটি দুই শব্দের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইতে পারে

না, অথচ পতি শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সুতরাং magistrate and collector-এর অনুবাদে দুইটি শব্দ ব্যবহার না করিয়া কেবলমাত্র বিষয়পতি শব্দের দ্বারাই বেশ কাজ চালান যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে কোনও ভাষায়ই পারিভাষিক শব্দ বাঞ্ছিত অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং তাহার মধ্য দিয়া সমগ্র অর্থ প্রকাশ করিতে যাওয়ার চেষ্টা নিষ্ফল। তাহাকে যথাসম্ভব সরল ও সুন্দর করিতে হইবে। তাহার পর বিভাগীয় ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

পরিভাষা-বিষয়ে সর্বভারতীয় ঐক্যের কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইংরেজ এ সকলের রাজত্বকালেই এই বিশাল ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া শাসন-ব্যাপারে মোটামুটি একটা ঐক্য ছিল; সংস্কৃত ফারসী ও ইংরেজী ভাষার মারফত শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে একই শব্দ সর্বত্র প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন প্রান্তের লোকসমাজের মধ্যে তখনকার দিনে ভাবের আদান-প্রদান বা পারস্পরিক আলাপ-পরিচয় মেলামেশার তেমন প্রয়োজন বা প্রচলন না থাকিলেও এই ঐক্যের মূল্য অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক যুগে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ঐক্য অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা যাহাই হউক না কেন প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়াও যথাসম্ভব এই ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করিতে হইবে—শাসন-সংক্রান্ত বা অন্যবিষয়ক পারিভাষিক শব্দগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায়ও যাহাতে একটা সাম্য থাকে সে দিকে তৎপর হইতে হইবে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মধ্য দিয়া এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহ পণ্ডিতসমাজে বহু দিন হইতেই দেখা দিয়াছে। তবে দুঃখের বিষয়, প্রকৃত কার্যের মধ্যে তাহা সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

বর্তমানে যখন সমগ্র দেশময় ইংরেজী শব্দের দেশীয় প্রতিরূপ-প্রণয়নের আয়োজন চলিতেছে তখন এই ঐক্যের কথা প্রধান ও প্রথম বিবেচ্য বিষয়। এজন্য সকল ভাষার প্রতিনিধি লইয়া একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা দরকার। প্রদেশগুলি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিলেও বিভিন্ন প্রদেশের—বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের—পক্ষ হইতে যে কাজ হইতেছে তাহার ব্যাপক প্রচার ও আলোচনা আবশ্যক। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের মনীষিগণের কৃত কার্যের বিবরণ যথাযথ

প্রচারিত হইলে পরস্পরের কার্যে সহায়তা হয়—যথাসম্ভব ঐক্যপ্রতিষ্ঠার সুবিধা হয়—একের প্রস্তাবিত সুন্দর গ্রহণযোগ্য শব্দের কথা না জানার জন্য অপরকে নূতন শব্দ-সংকলনের অনর্থক প্রয়াসের পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না। সুতরাং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকূল দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শু ভা র ম্ভ

নূতন নাটক বা সিনেমার বইয়ের 'শুভারম্ভের' বিজ্ঞাপন অহরহ আমাদের চোখে পড়ে। আমরা 'পরমাগ্রহে' নূতন 'নাটকাভিনয়ে'র 'রসাস্বাদন' করি—যাঁহাদের অভিনয়নৈপুণ্য অভিনেতৃসমাজের 'মুখোজ্জ্বল' করিয়াছে সগৌরবে তাঁহাদের 'নামোল্লেখ' করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের আচরণ ও কথাবার্তায় যে একদল লোক বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করেন ভাবাতিশয্যে আমরা তাহা লক্ষ্য করি না। অথচ একটু অবহিত হইলেই আমরা নিজেদের ত্রুটিতে নিজেরা বিস্মিত হইব—ভাষাপ্রয়োগে আমাদের শৈথিল্য আমাদিগকে অপ্রস্তুত করিবে।

হেঁয়ালি ছাড়িয়া কথাটা স্পষ্ট করিয়াই বলা যাক। বাক্যের মধ্যে শব্দসন্নিবেশের ক্রম এবং একই শব্দের উচ্চারণের আংশিক উচ্চতা বা নীচতা অর্থের যথেষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করে। পাশাপাশি দুইটি শব্দ বিচ্ছিন্ন ভাবে যে অর্থ প্রকাশ করে সংযুক্ত বা সমাসবদ্ধ সন্ধিযুক্ত অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই তাহার পরিবর্তন হইয়া থাকে। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় বিশেষণ শব্দেব স্বতন্ত্র উচ্চারণে যে জোর পড়ে শব্দটিকে বিশেষ্যের সহিত জুড়িয়া সমাসবদ্ধ করিয়া দিলে সে জোর নষ্ট হইয়া যায়—বিশেষণের সার্থকতা কমিয়া যায়। তাই বৈয়াকরণ বলেন—বিশেষণের সহিত বিশেষ্য জুড়িয়া কর্মধারয় সমাস করিলে বিশেষণের অর্থ গৌণ হইয়া পড়ে এবং বিশেষ্যের অর্থ প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ অবস্থায় শুভারম্ভ, পরমাগ্রহ, পরমাত্মীয়, ঘনান্ধকার প্রভৃতি শব্দগুলি ভাঙ্গিয়া শুভ আরম্ভ, পরম আগ্রহ, পরম আত্মীয়, ঘন অন্ধকার ব্যবহার করাই সঙ্গত। তাহাতে যথাস্থানে জোর পড়ে—অভীষ্ট অর্থ-প্রকাশে কোন বাধা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের লেখায়ও যুক্ত শব্দের একাধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু এক্ষেত্রে সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইবে বলা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত কয়েকটি প্রয়োগ এখানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সেই মুক্ত দ্বারপথে, ক্ষীণালোকে, এক ছায়াতুল্য মূর্তি দেখিলেন।

—বিষবৃক্ষ (৪৪শ পরিচ্ছেদ)

পাঠকমণ্ডলী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছে।

—প্রাচীন সাহিত্য—রামায়ণ, পৃঃ ৫

শকুন্তলাকেও করুণাচ্ছাদনে আবরিত করিতেছে। —প্রাচীন সাহিত্য—শকুন্তলা, পৃ: ৩৪

মেদস্ফীত বিলাসীর ন্যায় তাহার সমাসবহুল বিপুলায়তন দেখিয়া সহজেই বোধ হয় সর্বদা চলাফেরার জন্য সে হয় নাই। —প্রাচীন সাহিত্য—কাদম্বরীচিত্র, পৃঃ ৫৬

সন্ধ্যার সমস্ত শান্তি এবং শ্রান্তি এবং ধূসরচ্ছায়া কবি মুহূর্তেই মনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিয়াছেন। —প্রাচীন সাহিত্য—কাদম্বরীচিত্র, পৃঃ ৬০

দীর্ঘায়ু বিরল হইয়া আসিয়াছে। —আত্মপরিচয়, পৃঃ ২১

কেবল পূর্ববর্তী বিশেষণের সঙ্গে পরবর্তী বিশেষ্য জুড়িয়া দিয়াই অসুবিধায় পড়িতে হয় এমন নহে। বিশেষ্যকে অপর পদের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া বিশেষণটিকে বিচ্ছিন্ন রাখাও সঙ্গত নয়। তাই গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন না বলিয়া 'গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন' বলা উচিত। একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে এরূপ না করিলে বিশেষণটি বড়ই দুর্বল হইয়া পড়ে।

বাংলায় অনেক স্থলে ক্রিয়া দুইটি পদের সমবায়ে গঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে একটিকে অপর পদেব সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়ার একটা রীতি মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেও সমর্থন করা চলে না। 'নামোল্লেখ করা', 'রসাস্বাদন করা', 'মুখোজ্জ্বল করা', 'দ্বারোদ্‌ঘাটিত হওয়া', 'কার্যারম্ভ করা' 'ভারার্পণ করা' প্রভৃতি স্থলে সংযুক্ত শব্দগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা অন্বয়ের অসুবিধা হয়— কর্মপদগুলি যথাযোগ্য মূল্যলাভে বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে,বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে ব্যাকরণের নিষেধ সত্ত্বেও সমাসবদ্ধ পদের মধ্যে সন্ধি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হইতেছে দেখা যায়। প্রয়োজনানুসারে না বলিয়া এখন আমরা প্রয়োজন অনুসারে বলিতে দ্বিধা বোধ করি না— বিবাহ-উৎসব, মাতৃ-আজ্ঞা, ন্যায়-অন্যায়, প্রীতি-উপহার, ঈশ্বর-ইচ্ছায়, উৎসব-উপলক্ষ্যে প্রভৃতি প্রয়োগে কেহ আপত্তি করেন না। বরং সন্ধি করিলে তাহা বিসদৃশ বলিয়া মনে হইবে। সুতরাং এখন আর নূতন করিয়া সন্নিহিত দুই পদের মধ্যে সন্ধি করিবার চেষ্টা বাংলার প্রকৃতি-বিরোধী। ইহা দ্বারা ভাষায় সৌন্দর্যবৃদ্ধি বা শক্তিসঞ্চারের সম্ভাবনাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে ক্রমবর্ধমান আর এক জাতীয় প্রয়োগের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। আজকাল স্থানে অস্থানে 'অনস্বীকার্য', 'অবিস্মরণীয়',

'অনুপস্থিত' প্রভৃতি কথার ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বাক্যে বিধেয় রূপে ইহাদের ব্যবহারে অভিপ্রেত অর্থ প্রকাশিত হয় কিনা ধীরভাবে পর্যালোচনা করা উচিত। বস্তুতঃ সেরূপ স্থলে নিষেধের অর্থ গৌণ হইয়া পড়ায় প্রকৃত অর্থের সম্যক্ প্রতীতি হয় না। 'এ কথা অনস্বীকার্য' আর 'এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই'—এই দুইটি প্রয়োগের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য আছে। প্রথম বাক্যে 'না'-এর উপর আদৌ জোর পড়ে না অথচ বক্তা অবশ্যই সেই জোর দিতে চান। একখানি বাংলা গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে একজন লিখিয়াছেন—'হায় হায়, আহা-উহু, খেদ, দীর্ঘশ্বাস, অভিসম্পাত প্রভৃতি সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত গুণাবলী এখানে অনুপস্থিত।' স্পষ্টতই ইংরেজী অ্যাব্সেন্টের প্রতিশব্দরূপেই অনুপস্থিত কথাটি এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজী না-জানা পাঠক ইহার তাৎপর্য কতটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন বলা শক্ত। যে সকল পাঠক নির্বিচারে সকল কথা মানিয়া লইতে চান না এখানে নিষেধের অপ্রাধান্য তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইবে না। 'অনন্য', 'অনবদ্য' প্রভৃতি শব্দও আজ বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে—অনুচিত, অসঙ্গত, অসম্ভব প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের এই জাতীয় প্রয়োগ কিছু দিন পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তবে, ইহাদের প্রকৃত তাৎপর্যের দিকে লেখক বা পাঠক কাহারও তেমন লক্ষ্য আছে মনে হয় না।

যেখানে প্রতিনিষেধের প্রাধান্য বিবক্ষিত সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে সেখানে নঞ্-তৎপুরুষ সমাসই হইতে পারে না। অবশ্য সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাংলায় মানিতে হইবে এমন দাবি করা চলে না। তবে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হইলেও একটা যুক্তি ও শৃঙ্খলা থাকা চাই। সর্বাপেক্ষা বেশী দরকার অর্থের সুস্পষ্টতা। যে কোন শব্দ ব্যবহার করিবার সময়ই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে তাহা দ্বারা অভীষ্ট অর্থ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইতে পারে কিনা—সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির তাহা বুঝিবার পক্ষে কোন বিশেষ বাধা আছে কিনা। বাধা থাকিলে এবং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগও বাঞ্ছনীয় নহে। তাই সাধারণের জন্য লিখিত গল্পের মধ্যে যখন 'নিশীথ রাত্রে হ্যারিকেনটি অনুজ্জ্বল করিয়া' দেওয়ার কথা বা 'অনুদিত প্রাতে সেতার লইয়া' বসার কথা শুনি তখন লেখকের উদ্দেশ্য ও পাঠকের অবস্থা চিন্তা করিয়া বিচলিত হই।

বস্তুতঃ ধ্বনিমাধুর্যের প্রলোভনে এবং শব্দাড়ম্বরের আকর্ষণে বাংলা ভাষায়

নিত্য যে সব নূতন নূতন শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে বা প্রাচীন শব্দ নূতন নূতন অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে তাহাতে সাধারণ পাঠকের পদে পদে বিভ্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে। তবে সাধারণ পাঠকসমাজ এ বিষয়ে উদাসীন—ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা পরিতৃপ্ত—তথ্য-অনুসন্ধানের আগ্রহ বা সুযোগ অনেকের নাই। লেখকও এ বিষয়ে সর্বত্র যথোচিত অবহিত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এ অবস্থা কখনই কাম্য হইতে পারে না। ভাষার সারল্য, সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধির প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের আন্তরিক অনুরাগ ও সজাগ দৃষ্টি ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনের প্রধান অবলম্বন। তাই প্রত্যেকটি নূতন শব্দ বা নূতন প্রয়োগের ভালমন্দ-বিচারের জন্য সকলকে যথাসাধ্য যত্নবান্ হইতে হইবে। খোলা মনে বিচার করিলে অনেক ত্রুটি ধরা পড়িবে এবং অল্প আয়াসেই সেগুলির সংশোধন সম্ভবপর হইবে—ভাষা জড়তামুক্ত হইয়া সকলের সহজবোধ্য হইবে।

আধুনিক বাংলা ভাষা

আমরা বাংলা-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করি—কবিতা নাটক উপন্যাসের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করি—বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করিয়া তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণ করি। কিন্তু সাহিত্যের মুখ্য অবলম্বন যে ভাষা তাহার সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা করি না বা আলোচনা করা দরকার বলিয়া বিবেচনা করি না। অথচ ভাষা সম্বন্ধেও আলোচ্য বিষয়ের অভাব নাই—সমস্যার অন্ত নাই। এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে শব্দ-সৃষ্টির সমস্যাই সর্বপ্রধান বলিয়া মনে হয়। এ সমস্যা কেবল বাংলার নয়—সমস্ত প্রাদেশিক ভাষায়ই আজ এই সমস্যা তুল্যরূপে বর্তমান।

আধুনিক যুগের নব নব ভাবধারা-প্রকাশের জন্য নূতন শব্দ-সৃষ্টির প্রয়োজন অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়াও অনেকে বৈচিত্র্যসৃষ্টির আগ্রহে অনেক সময় নূতন নূতন শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। নবগঠিত শব্দগুলি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ—অভিপ্রেত ভাবপ্রকাশে সমর্থ কি অসমর্থ সেদিকে লেখক বা পাঠক কাহারও তেমন লক্ষ্য নাই। লেখক আবেগবশতঃ লিখিয়া গেলেন—পাঠক উপর উপর যাহা বুঝিলেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। খুঁটিয়া খুঁটিয়া অর্থ বুঝিবার চেষ্টা বাঙালি পাঠক খুব কমই করিয়া থাকেন। ফলে এমন অনেক শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে অংশ বিশ্লেষণ করিয়া যাহাদের অর্থ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য—ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে যাহাদের সমর্থন অসম্ভব। ইংরেজী হইতে অনুবাদের সূত্রে গঠিত এই জাতীয় অজস্র শব্দ প্রতিদিন সংবাদপত্র প্রভৃতিতে চোখে পড়ে। ইংরেজী মূলটি ধরিতে না পারিলে অনেক ক্ষেত্রে এই সব শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয় না। অথচ আক্ষরিক অনুবাদের প্রবৃত্তি ত্যাগ করিলে অনেক সময় সুন্দর সুন্দর শব্দ গঠন করিয়া বেশ কাজ চালান যাইতে পারে। ভাষার মূল উদ্দেশ্য বক্তার বা লেখকের মনের ভাব শ্রোতা বা পাঠককে সহজে বুঝাইয়া দেওয়া। কিন্তু আজ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে নূতন নূতন শব্দ-সৃষ্টির ফলে—

কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষাকে ঘুরাইয়া-বাঁকাইয়া প্রয়োগ করিবার আগ্রহে আধুনিক বাংলা ভাষায় সেই মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হইতে চলিয়াছে—ভাষা আজ অনেক স্থলেই দুর্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে। কেবল ধ্বনির মাধুর্য বা গাম্ভীর্যের অজুহাতে এই ত্রুটি কতটা উপেক্ষা করা যাইতে পারে তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

দুঃখের কথা এই যে, এই বিষয় লইয়া আমরা বিচার-বিবেচনার তেমন প্রয়োজন অনুভব করি না। তাই আমাদের ব্যাকরণে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা নাই—অভিধানকারেরাও এ সম্বন্ধে একরূপ নীরব। অথচ এই নবসৃষ্টির প্রয়াসকে আমবা অস্বীকার বা উপেক্ষা করিতে পারি না। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কেবল নূতন কিছু করিবার আগ্রহে শব্দসৃষ্টি মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে। তাহা ছাড়া একথা স্বীকার কবিতে কোন সঙ্কোচের কারণ নাই যে, শব্দসৃষ্টির যোগ্যতা সবলেরই নাই বা থাকিতে পারে না। সাধারণের পক্ষে অভিধানে ধৃত শব্দেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত—তাহাতেই কাজ অনায়াসে চলিয়া যাইতে পাবে। বাংলা অভিধানের সঙ্গে একখানি সংস্কৃত অভিবান রাখিলে কাজেব অনেক বেশী সুবিবা হইতে পারে। সংস্কৃতমূলক ভাষার শব্দগঠন-ক্ষমতা প্রচুর—তাই লেখকদের শব্দগঠনে আগ্রহ স্বাভাবিক। অন্য ভাষায় এরূপ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সংস্কৃতমূলক ভাষায় শব্দসৃষ্টিব্যাপাবে প্রতি পদে সংস্কৃতে বিশেষ জ্ঞান দরকার—সকলের পক্ষে সেই জ্ঞান আঁহরণ করা সম্ভবপর নহে। তাই পদে পদে নূতন সৃষ্টির মধ্যে নানারূপ দোষ-ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। বিশিষ্ট লেখকের লেখায় যখন 'নিমন্ত্রাতা' শব্দ দেখি তখন একথা কখনই মনে করিতে পারি না, লেখক জানিয়া শুনিয়া 'নিমন্ত্রয়িতা' বা 'নিমন্ত্রক' শব্দ উপেক্ষা করিয়াছেন। মাছিমারা কেরানির মত ইংরেজীর অন্ধ অনুকরণ করিয়া যাঁহারা 'আন্তর্জাতিক' ও 'প্রাগৈতিহাসিক' এইরূপ কিম্ভূতকিমাকার শব্দ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই বাংলার ব্যাকরণে এই সমস্ত শব্দের বিশ্লেষণ সম্ভবপর নহে। বহুল প্রচলিত এই জাতীয় শব্দগুলির সংশোধন বা পরিবর্তন এখন অসম্ভব। 'ইতিহাসপূর্ব' কালে 'প্রাগৈতিহাসিকে'র স্থান দখল করিতে পারিলেও 'আন্তর্জাতিক'কে হটান কঠিন। তবে 'ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ'—মানুষ ক্রমে বুদ্ধিমান্ হয়। এই নিয়ম অনুসারে এখনকার দিনে নূতন করিয়া এই জাতীয় শব্দসৃষ্টির সময়ে ত্রুটিসংশোধনের চেষ্টা করিয়া দেখা মন্দ

নয়। যেমন, 'অন্তর্দেশীয় পত্রে'র স্থলে 'দেশগ' বা 'দেশচল পত্র' চলিতে পারে কিনা বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার।[১]

রসঘন, সর্পিল, ভাবালু, পটভূমিকা, অগ্নিযুগ, কল্লোলক প্রভৃতি যে সমস্ত শব্দ চলিয়া গিয়াছে তাহা চলিতে থাকুক। কিন্তু নূতন শব্দ-গঠনের সময় আমাদের সাবধান হওয়া উচিত নয় কি? যদি সামান্য পরিবর্তন করিয়া প্রচলিত শব্দগুলিকে নির্দোষ ও সহজবোধ্য করিতে পারি তাহাতেই বা দোষ কি? যদি তাহাদের জায়গায় একেবারে নূতন সুন্দর শব্দ গঠন করিতে পারি তাহাতেও আপত্তি করিবার কারণ থাকিতে পারে না। মোটের উপর, যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট না হইয়া—কলমের মুখে যাহা আসিল তাহাতেই কৃতকৃত্য বোধ না করিয়া যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই গড়িয়া তুলিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইতে হইবে।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম বাংলায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানিয়া চলিতে হইবে—এমন কথা আমার বক্তব্য নয়। বস্তুতঃ বাংলা ভাষার গতি লক্ষ্য করিয়া প্রয়োজনবোধে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মকে বাংলার ক্ষেত্রে কিছু শিথিল করিতে হইবে—দরকারমত বাংলার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম প্রস্তুত করিতে হইবে।

১ এই প্রসঙ্গে নানা উপলক্ষ্যে আমার প্রস্তাবিত কয়েকটি শব্দ আমি এখানে সাধারণের বিচারের জন্য উপস্থাপিত করিতেছি:

Air-tight—বায়ুরোধী

Prompter—গ্রন্থধারক বা স্মারক

Martyr—আত্মোৎসর্গী

Runner-up—উপবিজয়ী

Extempore speech—অপূর্ব-কল্পিত ভাষণ

Classic—পরোৎকর্ষী সাহিত্য (প্রচলিত—যুগোত্তীর্ণ)

Running Commentary—অনুপদ ব্যাখ্যান (প্রচলিত—ধারাবিবরণী)

Theoretical—তত্ত্বগত বা তাত্ত্বিক

Practical—প্রয়োগগত বা প্রায়োগিক

Co-opted—অধিগৃহীত

Co-option—অধিগ্রহণ

Hurdle race—সবাধ দৌড়

Certificate—প্রশস্তিপত্র, স্বীকৃতিপত্র (প্রচলিত—কৃতি-পত্র)

Documentary film—বাস্তবচিত্র (প্রচলিত—তথ্যচিত্র, প্রামাণ্য চিত্র, অভিজ্ঞান চিত্র)

শতৃ-শানচ্ প্রত্যয়-ব্যবহারের কঠোর নিয়ম বাংলায় চালান যাইবে না—বাংলায় আত্মনেপদ-পরস্মৈপদ-নির্বিশেষে শানচ্ প্রত্যয়ের ব্যবহার মানিয়া লইতে হইবে। মুহ্যমান, ভাসমান, চলমান, ভ্রাম্যমাণ, স্ফুটমান, উন্মীলমান, বিকচমান প্রভৃতি শব্দ অপাংক্তেয় বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কেননা, ইহাদের বিশুদ্ধ সংস্কৃত রূপ বাংলায় চলিতে পারে না—অন্য কোন শব্দের দ্বারাও ইহাদের কাজ চালান যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া অপম্রিয়মান, উন্মীলীয়মান প্রভৃতি চালাইবাব কোনও কারণ নাই—এরূপ ভাবে সংস্কৃতের নিয়ম-লঙ্ঘনের কোন হেতু নাই। বৈচিত্র, বৈশিষ্ট, স্বাতন্ত্র, দারিদ্র প্রভৃতি স্থলে য-ফলাব অপ্রয়োগ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করিয়াও কোনও রকমে স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। 'উর্ধ' শব্দে 'ব'-ফলা প্রয়োগ না করা চলে, কিন্তু 'লক্ষ্যণীয়' শব্দে অকারণে য-কার যোগ করা সমর্থন করিতে পারি না। নির্বিরোধী, নির্লিপ্ত, নিরপরাধী, নির্দোষী, নির্ধারিত, নিরাসক্ত, নিরলস, সক্ষম, সশঙ্কিত, সকরুণ, সকাতর, উর্ধ্বতন, পূর্বতন, উচ্চতন, নিম্নতন প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া বাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাদের সবগুলিকেই ভুল বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। চেষ্টা করিলে ইহাদের মধ্যেও একটা নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারা যায় এবং আমাদিগকে অবশ্যই তাহা করিতে হইবে। তবে তাই বলিয়া কোন নিয়ম মানিব না—এমন কথা বলা চলে না। ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধান হইতে হইবে—নিয়মের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিশেষ করিয়া নূতন শব্দ-প্রয়োগেব সময় অত্যন্ত সর্তক হইতে হইবে—সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য লইতে হইবে—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে। ইহাতে সুবিধা ছাড়া অসুবিধা হইবে না—বাংলা ভাষার অস্পষ্টতা ও বিশৃঙ্খলা দূর হইবে—সকল দিক দিয়া ইহার শক্তিবৃদ্ধি হইবে।

নূতন শব্দগঠনের জন্য সুশৃঙ্খল সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত সমিতির উপর এই গুরু কার্যের ভার দেওয়া যাইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মত প্রতিষ্ঠান এইরূপ সমিতি গঠন করিয়া বা অন্য উপায়ে বাংলার নূতন শব্দের—নূতন প্রয়োগের দোষগুণ-বিচারের আয়োজন করিতে পারেন। যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা পত্রপত্রিকায় এ সম্পর্কে নিয়মিত আলোচনার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় এই সমস্যা-সমাধানের কিরূপ ব্যবস্থা হইতেছে

তাহারও খোঁজখবর লওয়া দরকার—কিরূপ নূতন নূতন শব্দ সৃষ্ট হইতেছে তাহার সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাহাতে বাংলার কিছু কিছু সাহায্য হইতে পারে। বাংলার সাংবাদিকতা ও হিন্দীর পত্রকার-কলা, বাংলার রেস্টুরেন্ট, সরবতের দোকান ও ভিত্তিপ্রস্তর (শতাব্দী-পূর্বের বাস্তু-প্রস্তর) এবং মারাঠীর উপাহারগৃহ, রসপানগৃহ, ও কোণশিলা পরস্পর তুলনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। দীর্ঘকাল পূর্ব হইতেই বাঙালি শব্দবিচারের কাজে হস্তক্ষেপ করিলেও আজ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সে কতকটা পিছাইয়া পড়িয়াছে মনে হয়। অন্যান্য প্রদেশে এই জাতীয় শব্দ নানাস্থান হইতে যেভাবে সংগৃহীত ও আলোচিত হইতেছে, বাংলায় সেভাবে কোন কাজ হইতেছে না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষীর প্রস্তাবিত শব্দগুলির অধিকাংশই পত্রপত্রিকার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া আছে—জনসাধারণ তাহাদের সন্ধানও রাখে না। ভালমন্দ শব্দ-সৃষ্টির যে অবিশ্রান্ত ধারা বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে বাংলার ব্যাকরণ ও অভিধান হইতেও তাহার যথোচিত পরিচয় পাওয়া যায় না।

আধুনিক বাংলায় পুরাতন শব্দ-ব্যবহারের আগ্রহ একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনেক সময় অর্থের কোনও সন্ধান না করিয়াই শ্রুতিমাধুর্যের জন্য প্রচলিত অপ্রচলিত পুরাতন শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। গল্প-উপন্যাসের মধ্যেও এই জাতীয় ব্যবহার পাঠককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। খ্যাতনামা লেখকের লেখা হইতে দুই-একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক-গণ ইহাদের কোনও অর্থ বাহির করিতে পারেন কিনা চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

আসক্তির অনতিবর্তনীয় দৃঢ় সংসক্তি। উত্তুঙ্গ মরুকুল। অকিঞ্চিৎকর প্রাত্যহিকতার অনুজ্জ্বল জীবনযাত্রা। জর্জরলোলুপ ক্ষুধা।

অভিনন্দন পত্রে এবং সরস্বতী পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্রে এই জাতীয় গুরুগম্ভীর শব্দসমষ্টির অপূর্ব সমাবেশ বাংলা ভাষা-রসিককে স্তম্ভিত করে সন্দেহ নাই।

যুগে যুগে প্রাচীন শব্দের অর্থের পরিবর্তন হইয়া থাকে। আধুনিক কালেও ইহার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। ঋষি, ঋত্বিক্, আচার্য, হোতা, উদ্‌গাতা, পুরোহিত, সমাবর্তন, স্নাতক, সংজ্ঞা, বাচন প্রভৃতি শব্দগুলির অধুনাতন প্রয়োগ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে শেষ দুইটি ছাড়া অন্য শব্দগুলি বৈদিক যুগ হইতে প্রচলিত ও বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত। বর্তমানে ইহাদিগকে

আধুনিক সমাজের উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে। বৈদিক যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থে ব্যবহৃত ঋষি শব্দ আজ দূরদর্শী মনীষী সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতেছে। তবে আশ্চর্যের বিষয়, রাজনারায়ণ বসু ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আর কাহারও সম্পর্কে এখন পর্যন্ত এই শব্দটি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। বৈদিক যজ্ঞের পুরোহিতদের সাধারণ নাম ঋত্বিক্, বিশেষ কর্মে নিযুক্ত ঋত্বিক্দের নাম হোতা ও উদ্গাতা। বর্তমানে হোতা শব্দ প্রধান কর্মকর্তা ও উদ্গাতা শব্দ গায়ক বা উদ্বোধক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। সভার কর্মপরিচালক আজ সভাপতি অপেক্ষা পুরোহিত নামে অধিকতর প্রসিদ্ধ। আচার্য আজ আর গুরু বা অধ্যাপকমাত্র নহেন—খ্যাতনামা বিশিষ্ট প্রাচীন অধ্যাপকই আজ এই নামের অধিকারী। গুরুগৃহ হইতে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের নাম ছিল সমাবর্তন। এই উপলক্ষ্যে ব্রহ্মচারীকে আনুষ্ঠানিক-ভাবে স্নান করিতে হইত এবং তিনি স্নাতক আখ্যা লাভ করিতেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীই স্নাতক এবং উপাধি-বিতরণের অনুষ্ঠান সমাবর্তন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় শেষোক্ত শব্দ দুইটির আধুনিক প্রয়োগের বিশেষ বিরোধী। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতই ইহাদের বাধা দেওয়া চলিবে না—কোনরূপে মানিয়া লইতে হইবে। অবশ্য ইহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী আপত্তিজনক 'সংজ্ঞা' শব্দের লক্ষণ বা ইংরেজী 'ডেফিনিশন'-অর্থে প্রয়োগ। প্রাচীন কালে পারিভাষিক শব্দই সংজ্ঞা নামে পরিচিত ছিল—কি ভাবে কখন ইহা পরিভাষার লক্ষণরূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল বলিতে পারি না। সংস্কৃতের ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে সংজ্ঞা-প্রকরণে শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা ও তাহার লক্ষণাদি উল্লিখিত হইয়াছে। ইংরেজী জ্যামিতি শাস্ত্রে এইরূপ প্রকরণের নাম 'ডেফিনিশন'। ইহা হইতেই বোধ হয় সংজ্ঞা ও 'ডেফিনিশন' একার্থক বলিয়া ধারণা হইয়া থাকিবে। বচনভঙ্গীর স্থানে বাচনভঙ্গীর ব্যবহার শব্দকে ফাঁপাইয়া তুলিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত—সংস্কৃতের মত বাচনশব্দের পাঠরূপ অর্থ বাংলায় প্রচলিত নাই। বহুল প্রচলিত এই সমস্ত শব্দ ব্যতীত অন্যত্রও সংস্কৃত শব্দের বিকৃত প্রয়োগের আরও কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় কাকু শব্দটি ক্যাঁচ ক্যাঁচ ধ্বনি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার আভিধানিক অর্থ শোকভয়াদিজনিত কণ্ঠধ্বনির বিকৃতি। শকুন্তলার অপূর্ব সমালোচনায় তিনি সখীবিরহিতা শকুন্তলাকে

খণ্ডিতা (=খণ্ডরূপা) শকুন্তলা বলিয়াছেন। অথচ সংস্কৃত সাহিত্যে খণ্ডিতা শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে প্রসিদ্ধ। অন্য নায়িকাসক্ত পতির পূর্ব প্রণয়িনী খণ্ডিতা নামে পরিচিত। স্বাধিকারপ্রমত্ত শব্দটি কালিদাস মেঘদূতে ব্যবহার করিয়াছেন—ইহার অর্থ স্বকার্যে অনবহিত। আধুনিক বাংলায় ইহা ক্ষমতামদমত্ত এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এই সমস্ত প্রয়োগ কতটা সমর্থনযোগ্য তাহা বিচার করিয়া দেখা দরকার।

প্রত্যেক ভাষার বাগ্‌ভঙ্গী স্বতন্ত্র। ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া যে কোন শব্দের পর যে কোন শব্দ বসাইলেই ব্যবহারযোগ্য ভাষা হয় না। বিশেষ বিশেষ শব্দের সহিত বিশেষ বিশেষ শব্দ যোগ করিয়া যে স্বতন্ত্র বাক্যাংশ গঠিত হয় তাহাকে কোনরূপে পরিবর্তিত করা চলে না। অবশ্য একই বাক্যাংশের বিভিন্ন রূপ একই ভাষার বিভিন্ন উপভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ক্ষুধা লাগা, ক্ষুধা পাওয়া, ভয় লাগা, ভয় পাওয়া, ভয় করা। তবে প্রচলিত সাহিত্যের ভাষায় কোন একটি রূপেরই প্রয়োগ সমীচীন বলিয়া মনে হয়—যদৃচ্ছাক্রমে যে কোনটির ব্যবহার সমর্থন করা চলে না। আধুনিক বাংলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। ইংরেজী ও বিভিন্ন উপভাষার প্রভাবে এখনকার বাংলা ভাষায় একজাতীয় বাক্যাংশ বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করিতেছেন। ইংরেজী ব্যাকরণ ও অভিধানে ইংরেজী ভাষায় এই জাতীয় বাক্যাংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার ব্যাকরণ ও অভিধান এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ নয়। তাই অনেক সময় কোন্ রূপটি সাহিত্যে প্রচলিত তাহাও ধরিবার উপায় নাই। ফলে এক অবাঞ্ছিত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে—সাধারণ গল্প-উপন্যাস পড়িতে গিয়াও বিভ্রান্তি ঘটিতেছে। তবে একটু অবহিত হইলেই ইহার কতকটা প্রতিকারও যে না হইতে পারে এমন নয়—অন্ততঃ ইংরেজী প্রয়োগের অনবহিত অনুকরণের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। নাম-করা লেখকদের লেখা কয়েকখানি শিশুপাঠ্য পুস্তক হইতে কয়েকটি বিসদৃশ প্রয়োগ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:

'কালাতিপাত করিতে পছন্দ করিতেন না। তাহাদের সঙ্গে সহানুভূতি থাকা চাই। পুস্তক-পাঠ হইতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। যথাসময় কাগজপত্রগুলি কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছাইতে তারানাথের চাকুরি পাইবার কোনও বাধা রহিল না। পরস্পরের মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতিতে বাস করা।'

বাক্যগঠনে অন্য নানা রকমের ছোটখাটো অসঙ্গতিও আধুনিক বাংলা বইয়ে অহরহ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল দুই-চারিটি দৃষ্টান্ত প্রসিদ্ধ লেখকদের লেখা হইতে তুলিয়া দিতেছি :

'জুলপী বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে সদ্য স্নান করে ওঠা মানুষের মত। সে ফেটে পড়ল বাবুদের বাড়ীর রাসের উৎসবে বাবুদের কারখানার মত। সংসারে অপত্যবাৎসল্যের ন্যায় পবিত্র ও অকৃত্রিম বস্তুর মূল্য নাই। পশুশাবকের সজল করুণ দৃষ্টি তাহার পানে চাহিয়া আছে। দেশ ও কালের মনের মুকুর হবার সাধ যে সাহিত্যের আছে তার আলো যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে পড়তে পারে এমন উজ্জ্বল করে জ্বালা উচিত নয় কি ?'

এই সকল ক্ষেত্রে প্রকাশক ও মুদ্রাকরের দায়িত্বও উপেক্ষণীয় নয়। অবশ্য আমাদের দেশে অধিকাংশ প্রকাশক ও মুদ্রাকর এ বিষয়ে বিশেষ কোন দায়িত্ব গ্রহণ না করায় বর্ণাশুদ্ধি ও নানারূপ ভাষাগত ত্রুটি বিভিন্ন পুস্তকে অবাধে বিরাজ করিতেছে। লেখক বা পাঠক কাহারও তাহাতে বিশেষ ক্ষোভের কারণ ঘটিতেছে না।

বিভিন্ন প্রান্তের লোকের মধ্যে বিভিন্ন উপভাষায় উচ্চারণের বৈচিত্র্য স্বাভাবিক—একই ধ্বনি বিভিন্ন জেলার লোকের মুখে বিভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত ভাষায় সকল দিক্ দিয়া সাম্য বর্তমান থাকা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে উচ্চারণের বৈচিত্র্য শ্রুতিসুখকর হয় না। আজকাল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যে আবৃত্তি-অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় তাহাতে এই উচ্চারণের বৈচিত্র্য রসিক শ্রোতার নিরতিশয় বিরক্তির কারণ হইয়া থাকে। কাহারও উচ্চারণে চন্দ্রবিন্দুর আতিশয্য, কাহারও চন্দ্রবিন্দুর অভাব, কাহারও চ-বর্গের তালব্য উচ্চাবণ শ্রোতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। ঋ-কারের 'রি'র মত উচ্চারণ আমাদের প্রায় গা-সহা হইয়া গেলেও ইহাকে কেহ সমর্থন করেন না। অথচ অনেকের মুখে সভাসমিতিতেও আবৃত 'আব্রিত'রূপে, বিবৃতি 'বিব্রিতি'রূপে, আবৃত্তি 'আব্রিত্তি'রূপে উচ্চারিত হইতে দেখা যায়। অকারান্ত শব্দ বাংলায় হসন্ত করিয়া উচ্চারিত হইলেও কোন প্রত্যয় পরে থাকিলে হসন্ত উচ্চারণ বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। তাই কোন কোন সংস্কৃত পণ্ডিতের মুখেও যখন 'লাভ্‌বান্', 'পুরুষ্‌কার', 'জ্ঞান্‌বান্' এইরূপ উচ্চারণ শোনা যায় তখন অনভ্যস্ত কানে আঘাত লাগে। স্বরবর্ণের পরস্থিত সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণের সময় কোন কোন স্থলে সংযোগ একেবারে উপেক্ষিত হয় দেখা যায়।

অস্বস্তি, ভূস্বর্গ, অশ্বচ্ছ 'অসস্তি', 'ভূসর্গ', 'অশ্চ্ছ'-রূপে উচ্চারিত হয়। অদ্বৈতকে অনেকে 'অদৈত্য'রূপেও উচ্চারণ করেন। এই সকল স্থলে একটা সর্বসম্মত ব্যবস্থা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থা করা কঠিন সন্দেহ নাই—কিন্তু বিষয়টি ভাবিয়া দেখার মত। ভুলিলে চলিবে না যে, চলতি ভাষার উচ্চারণের বৈষম্য লেখার ভাষার বানানেও সংক্রামিত হইতেছে। সুতরাং ভাষার এ দিকটি আদৌ উপেক্ষণীয় নহে।

সকল দিক্ দিয়া ভাষাকে ত্রুটিহীন ও সুন্দর করিয়া তুলিতে হইবে। এজন্য চাই ভাষার প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ ও অকৃত্রিম অনুরাগ। যেদিন ভাষার অণুমাত্র অঙ্গহানি ও বিকৃতি আমাদিগকে চঞ্চল ও ব্যথিত করিয়া তুলিবে সেইদিনই আমরা ভাষার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সমর্থ হইব। ভাষাকে শ্রুতিমমধুর ও লালিত্যপূর্ণ করিয়া তুলিলেই চলিবে না—যাহাতে ইহা বিশুদ্ধ ও সহজবোধ্য হইয়া উঠে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রাণশক্তিবহুল যৌবনে উদ্দামতার আবেগ স্বাভাবিক হইলেও নিজ চেষ্টায় যদি তাহাকে সংযত ও সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত কবিতে পারা যায় তাহা হইলেই যৌবনের সমস্ত সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া উঠে—সমস্ত শক্তি সার্থক হয়। না হইলে ব্যাধি ও বিকৃতি অল্পকালের মধ্যেই অতি সুন্দর আকৃতিকেও কুৎসিত ও বীভৎস করিয়া তোলে।

উনবিংশ শতাব্দী ও বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও নানা দিক্ দিয়া স্মরণীয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক প্রবাহের সূচনা এই শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। সত্য বটে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই প্রাচীন বাংলার বৈচিত্র্যহীন অনতি-বৃহৎ পরিসরের মধ্যে বৈচিত্র্যের সূত্রপাত হয় এবং আধুনিক বাংলার গোড়াপত্তন হয়। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বাংলা গ্রন্থ মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হইয়া বাংলা সাহিত্যে নবযুগের শুভ সূচনা করে। তাহার পর নানা জনে নানা ভাষায় বাংলার ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করিয়া প্রকাশ করেন। এই শতাব্দীরই শেষে আধুনিক ধরনের প্রথম বাংলা নাটকেরও প্রবর্তন হয়। কিন্তু বিভিন্ন বিভাগে নিয়মিত ভাবে নানা গ্রন্থের প্রকাশ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফোর্ট উইলিঅম কলেজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক সংকলিত ও প্রকাশিত হয়। ইহার পর ধীরে ধীরে সাধারণের প্রয়োজনীয় নানা সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ হয়—সংবাদপত্র-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হয়। ফলে সাধারণ লোকের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যায়—নূতন নূতন বই দেখিয়া ও পড়িয়া—নূতন জ্ঞান লাভ করিয়া অনেকেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। ১৮১৯ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি ও ৩রা এপ্রিল সমাচারদর্পণ ইহারই আভাস দিয়া লেখেন[১]—

'গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে কিন্তু সকল পুস্তক একস্থানে নাই নানা লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের চেষ্টা জন্মে এইরূপে এদেশে বিদ্যা প্রচলিতা হইতেছে।

... ...

এদেশের এই এক মঙ্গলের চিহ্ন যে নানা প্রকার পুস্তক ছাপা হইতেছে যে

১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রথম খণ্ড)—পৃঃ ৬৭

হেতুক এই ছাপা পুস্তকের গমন স্রোতের স্যায় যেমন ক্ষুদ্র নদী নির্গতা হইয়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সর্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়া সেই দেশকে উর্বরা করে সেইমত ছাপার পুস্তক ক্রমে ক্রমে সকল প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়া সকল লোকের বোধগম্য হওয়াতে তাহাদের মন উচ্চাভিলাষি করে পূর্বকালে বৰ্দ্ধিষ্ণু লোকের ঘরেতেও তালপত্রে অক্ষর ·মিলা ভার ছিল ছাপার আরম্ভ হওয়া অবধি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকের ঘরেতেও অধিক পুস্তক সঞ্চার হইয়াছে।'

এগার বৎসর পরে ১৮৩০ সালের ৩০শে জানুয়ারি সমাচারদর্পণ দেশের মধ্যে পুস্তকক্রয়ের আগ্রহ ও জ্ঞান-বৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া বলেন[২]—

'আমরা ইতস্ততো নিরীক্ষণ করিয়া অবগত হইলাম যে পূর্ব্বাপেক্ষা এতদ্দেশীয় সম্বাদ কাগজের গ্রাহক গত বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ হইয়াছে। এবং তৎকাগজ প্রকাশক মহাশয়েরাও পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ দূর দূরদেশীয় সম্বাদ ঐ পত্রে প্রকাশ করিতেছেন ইহার কারণ আমরা এই বোধ করি যে লোকেরদের পূর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে বারো বৎসরে যখন প্রথম সম্বাদপত্র প্রকাশ হয় তখন আমারদের এই দর্পণ গ্রাহকের মধ্যে অনেকেই তিরস্কার পূর্ব্বক আমারদিগকে লিখিতেন যে ২ দেশের নাম পর্য্যন্তও কখন আমারদের কর্ণগোচর হয় নাই তত্তদ্দেশীয় সম্বাদ তোমরা কি নিমিত্তে প্রকাশ কর। কিন্তু এক্ষণে আমরা অতি আহ্লাদপূর্ব্বক দেখিতেছি যে কলিকাতানগরে এতদ্দেশীয় লোক কর্ত্তৃক যে কাগজ মুদ্রিত হয় তাহাতে পৃথিবীর নানাদেশীয় সম্বাদ প্রকাশিত হইতেছে। ভিন্ন দেশের যে সকল নানা ঘটনা বিশেষতঃ ইংগ্লণ্ড দেশে যে সমস্ত ব্যাপার চলিতেছে তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অত্যন্ত শুশ্রূষা হইয়াছে।'

তখনকার নব্যশিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় বৈদেশিক মোহে আচ্ছন্ন হইয়া বাংলা ভাষাকে সুনজরে দেখিতে না পারিলেও দেশের সাধারণ লোকের বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ববোধ ছিল। তাই বাংলার বিশুদ্ধিরক্ষা ও রাজ-দরবারেও বাংলা ভাষা-ব্যবহারের জন্য তাঁহাদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তাঁহাদের আন্দোলনের ফলে ১৮৩৮ সালে সরকারি দপ্তরে পারসী ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়। ঐ বৎসরের ২৩শে জানুয়ারি প্রকাশিত সরকারি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে 'ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর

২। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রথম খণ্ড)—পৃঃ ৯৬

অন্তঃপাতি বঙ্গাদি তাবৎ প্রদেশে আদালত ও রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্যে পারস্ত ভাষার পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষার চলন হইবে।'

ইতঃপূর্ব্বেই রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারি ১৮৩৭ সালের ১১ই জুলাই তারিখে রেভিনিউ বিভাগে দেশীয় ভাষা-ব্যবহারের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া কমিশনারদিগকে জানান[৩]—

'৪। আপনি নিশ্চয় জ্ঞাত হইবেন যে দেশীয় প্রত্যেক জিলায় কোন আমলা দেশীয় ভাষায় সুবিজ্ঞ না হইলে তাঁহাকে কর্ম্মযোগ্য বোধ করা যাইবে না। ... ...

৫। রেবিনিউ সংপর্কীয় কার্য্যে এইক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে যাহারা দেশীয় ভাষায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না তাঁহারা যথাসাধ্য শীঘ্র দেশীয় ভাষা অভ্যাস করিবেন।'

এই নূতন ব্যবস্থা দেশের সাধারণ লোক সাদরে অভিনন্দন করে। কাহারও কাহারও নিকট হইতে এ বিষয়ে কিছু কিছু আপত্তিও আসে। ১৮৩৮ সালের ৩০শে জুন সমাচারদর্পণ এই সকল আপত্তির সুন্দর জবাব দেন।[৪] এই সময়েই বিভিন্ন বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষা শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়। ১৮৩৮ সালের ২৭শে অক্টোবর সমাচারদর্পণে জ্ঞানান্বেষণ হইতে নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত হয়[৫]—

'এতদ্দেশস্থ যে সকল শিক্ষকগণ বাঙ্গলা বিষয়ে উৎসাহী আছেন তাঁহারা এতচ্ছ্রবণে অতিশয় আহ্লাদিত হইবেন যে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্টে বাঙ্গলা বিষয়ে যে সাহায্য করিয়াছেন তদ্বিষয়ের প্রাচুর্য্যার্থ একেডিমিক কমিটির অধ্যক্ষেরা ঐ বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ও হিন্দী স্থাপন করণার্থ মনস্থ করিয়াছেন এত কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা শিক্ষা বিষয়ে বালকগণ পিতা প্রভৃতির অধীনে থাকিয়া তাহারদিগের কথানুসারে চলিতেন কিন্তু এক্ষণে সর্বদা সকল কার্য্যই বাঙ্গলার দ্বারা চলিবে অতএব সুতরাং বাঙ্গলা অভ্যাসের আবশ্যকতা।...হিন্দু কালেজস্থ ছাত্রগণ বাঙ্গলা বিষয়ে শৈশবাবস্থায় আছেন অথচ বাঙ্গলার মধ্যে হিন্দু কালেজের প্রধান বিদ্যালয় অতএব হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ এই অপ্রশংসনীয় যে ঐ

৩। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃঃ—২২১

৪। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃঃ—২২৬

৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃঃ—২২৭

বিদ্যালয়স্থ এতদ্দেশীয় ছাত্রগণ বাঙ্গলা শিক্ষা না করিয়া ভাষান্তর শিক্ষা করেন বিশেষতঃ এক্ষণে বাঙ্গালি প্রতি যে সকল গুরুতর কার্য্যে ভারার্পণ হইতেছে সে সকল কার্য্যে হিন্দু কালেজস্থ ছাত্রগণ বাঙ্গলায় মূর্খতা প্রযুক্ত নিযুক্ত হওনের যোগ্য হইবেন না অতএব আমরা অনুমান করি যে হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষগণ একেডিমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের রীত্যনুসারে বাঙ্গলা বিষয়ে মনোযোগ করিবেন এবং এতদ্দেশীয় দিগের লভ্যের সম্ভাবনার নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ভাষা সংস্থাপন করিবেন।'

এই শতাব্দীতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কতকগুলি সমস্যার উদ্‌ভব হয় যাহাদের সুমীমাংসা আজ পর্যন্ত হয় নাই। আধুনিক সাহিত্যিকসমাজে এই সমস্ত সমস্যা অল্পবিস্তর পরিচিত হইলেও আমাদের পিতা-পিতামহেবা ইহাদের সমাধানের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক। তাই আমি বর্তমান প্রবন্ধে এইরূপ দুই-একটা সমস্যাপ্রসঙ্গে তখনকার আলাপ-আলোচনা ও বিধি-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

সাহিত্যেব আদর্শ লইয়া আলোচনা ও বিভিন্ন মতবাদের অস্তিত্ব সেকালে বিশেষ কিছু ছিল না। কারণ, দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় বাংলা সাহিত্য লইয়া আদৌ মাথা ঘামাইতেন না। তাহা ছাড়া, বাংলায় মৌলিক রসপূর্ণ রচনার প্রচলনও তখন হয় নাই। সাহিত্যের স্বল্প পরিসরের মধ্যে তখন আলোচ্য বিষয় ছিল প্রধানতঃ দুইটি—অক্ষরসমস্যা ও ভাষাসমস্যা। অক্ষরসমস্যা লইয়া অবশ্য তেমন জোরালো আলোচনা কোনও দিনই হয় নাই। তবে সমগ্র দেশে এক লিপি-বিস্তারের যে চেষ্টা বর্তমান যুগে আমরা দেখিতে পাইতেছি তাহাব অনুরূপ চেষ্টা শতবর্ষ পূর্বে হইয়াছিল ইহা ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। বোধ হর, বোর্ড অব্ রেভিনিউর সেক্রেটারি সি. ই. ট্রিবিলিয়ন এই চেষ্টার প্রযোজক ছিলেন। সমস্ত দেশীয় ভাষা লেখায় রোমান্ অক্ষর-প্রবর্তনের উপযোগিতা নির্দেশ করিয়া এক দীর্ঘ আবেদন প্রচারিত হয়। ১৮৩৪ সালের ৯ই আগস্ট তারিখের সমাচারদর্পণে এই আবেদনের বিবরণ পাওয়া যায়[৬]। এই প্রস্তাব অনুসারে কিছু কিছু বাংলা বই এই অক্ষরে ছাপা হইয়াছিল। ইহার একখানির পরিচয়

৬। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃঃ—২০৭

১৮৩৪ সালের ১লা নভেম্বরের সমাচারদর্পণে দেওয়া হইয়াছিল[৭]। কিন্তু মনে হয় এই আন্দোলন দেশের জনসাধারণের উপর বিশেষ কোনও প্রভাব বিস্তার করে নাই এবং ইহার আয়ুও স্বল্পকালমাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে কাশীর নাগরীপ্রচারিণী সভা সমগ্র দেশে একলিপি-বিস্তারার্থে নাগরীর পক্ষ সমর্থন করেন এবং কিছু দিন পূর্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রোমান অক্ষর-প্রবর্তনের পক্ষে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ভাষার বিভিন্ন সমস্যা লইয়া যুগে যুগে নানা আলোচনা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার পরিচয় শতাধিক বর্ষ পূর্বেও পাওয়া যায়। এই বিশুদ্ধিরক্ষার উপায় লইয়া মতভেদ দেখা যায়। একদল লোকের মতে সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে বিশুদ্ধ সংস্কৃত পদ প্রয়োগ করিলে ভাষার গৌরব রক্ষিত হইবে—বিদেশী বা চলতি শব্দের ব্যবহারে ইহার মর্যাদালোপের আশঙ্কা রহিয়াছে। ১৮২৮ সালে একজন সংবাদপত্র-পাঠক সমাচারদর্পণে ভাষার দোষত্রুটি লক্ষ্য করিয়া সম্পাদক মহাশয়কে উহা দূরীকরণের উপায়-নির্দেশপ্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন[৮]—

'বিনয়পূর্বক আমার এই নিবেদন যে সমাচারপত্র সম্পাদক মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ ব্যয়পূর্বক সংস্কৃতাভিজ্ঞ দিগ্‌দর্শি লোকদ্বারা নিজ নিজ পত্র সংশোধিত করিয়া প্রকাশ করেন······যেহেতুক শুদ্ধবর্ণ দ্বারা নীচবর্ণও লব্ধবর্ণ হয় এবং বর্ণসংস্কার ব্যতিরেকে সুবর্ণেরও বর্ণমালিন্য হয়।'

আর একজন ১৮৩০ সালে আরও স্পষ্টভাবে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন[৯]—

'সংস্কৃতানুযায়ি ভাষাকেই সাধুভাষা কহিয়াছেন এমতে তদ্ব্যাকরণে দৃষ্টি থাকিলেই বঙ্গভাষার পারিপাট্য সহজেই হইতে পারে।······সুতরাং বঙ্গভাষাও এইরূপে ভাষান্তর সংসৃষ্ট থাকাতে দুষ্ট হইতে পারে না। তবে পারস্য যেমন আরবীর সংযোগে সাধুত্ব প্রাপ্ত এইরূপ বঙ্গভাষাও সংস্কৃতাধিক্য দ্বারা সাধুভাষা-রূপে খ্যাত হয়।'

কিন্তু 'সংস্কৃতাধিক্যে বঙ্গভাষার কাঠিন্য বৃদ্ধি সম্ভাবনায়' এবং 'শ্রুতিকটুতা ও দুর্জ্ঞেয়তা শঙ্কায়'ও যে কেহ কেহ শঙ্কিত হন নাই এমন নহে—তথাপি 'সুশ্রাব্য এবং সভ্য শৌভ্য ভব্য সকলের বক্তব্য যাহা তাহাকেই সুন্দর বচন নিরাকরণ-

৭। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড)—পৃঃ ১৬১
৮। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রথম খণ্ড)—পৃঃ ৫৮
৯। ঐ —পৃঃ ৬২—৩

পূর্ব্বক তাহারি রচনার নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণানুকরণপূর্ব্বক সৃষ্টিকরণ কর্ত্তব্য'[১০] ইহাই ছিল প্রচলিত বহুজনপরিগৃহীত মত।

পক্ষান্তরে, এই যুগের প্রসিদ্ধ সাহিত্যরসিক কাশীপ্রসাদ ঘোষ সেই সময়ের বাংলা পুস্তকের সমালোচনা করিয়া 'নিরাবিল' বা খাঁটি বাংলার অভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। একদিকে 'ইংলণ্ডীয় ভাষার রীত্যনুযায়ি' সাহেবী বাংলা ও অন্যদিকে 'সমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য'বহুল পণ্ডিতী বাংলা এই উভয়ই তাঁহার কাছে সমান নিন্দার বস্তু ছিল।[১১]

কিন্তু সংস্কৃতবহুল না হউক অন্ততঃ সংস্কৃতঘেঁষা বাংলার দিকে আকর্ষণ বিরুদ্ধ আন্দোলনের ফলেও বিশেষ কমে নাই। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁহাদের সম্পাদিত 'মাসিকপত্রে'র শিরোভাগে তাঁহারা স্পষ্টভাবে চলিত ভাষাকে পত্রিকার আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করেন। সাহিত্যিকসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত 'আলালের ঘরের দুলাল' এই মাসিক পত্রেই প্রথম প্রকাশিত হয়। অবশ্য বর্তমানে যতটা চলিত ভাষা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় আলালের যুগে তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। বস্তুত ইহার ভাষা অনেকাংশে এখনকার সাধুভাষার মত। তথাপি ইহাই সে যুগে সমাজে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল—পণ্ডিতসমাজের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিল। ফলে আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষে আদর লাভ করিলেও প্রচলিত রীতিকে ইহা তেমনভাবে ব্যাহত করিতে পারে নাই। ১৮৭১ সালে সাহিত্যের এই অবস্থা বাংলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে এই নির্দেশ দেন যে বিদ্যালয়পাঠ্য বাংলা পুস্তকে বাঙালির ব্যবহৃত খাঁটি বাংলা ব্যবহার করিতে হইবে—যে বইয়ে খাঁটি বাংলা ব্যবহৃত হয় নাই এমন বই যাহাতে কোন বিদ্যালয়ে পড়ান না হয় সে জন্য শিক্ষাবিভাগের কর্মচারীদিগকে অবহিত হইতে বলা হয়। দেশীয় ভাষার উপর সংস্কৃত এবং আরবী ফারসী এই দুইয়েরই অযথা প্রভাব তখনকার সরকারকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। অন্য ভাষার প্রভাবমুক্ত খাঁটি চলতি দেশীয় ভাষা-ব্যবহারের উপযোগিতা বিষয়ে

১০। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রথম খণ্ড)—পৃঃ ৬৫।

১১। ঐ —পৃঃ ৬০।

শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ছোটলাট ক্যাম্পবেল সাহেব ১৮৭১ সালে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।[১২]

বাংলা ভাষার মধ্যে ইংরেজী বা আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগ চলতি কথার ভিতরেও শহর অঞ্চলে নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল। 'ভদ্রলোকের মধ্যে অনেক লোক স্বজাতীয় ভাষায় অন্যজাতীয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া কহিয়া থাকেন' এজন্য গ্রামাঞ্চলের লোকেরা বিস্ময় বোধ করিত।[১৩] তবে এক ভাষার সঙ্গে আর এক ভাষার শব্দের মিশ্রণ যে অবশ্যম্ভাবী ও অন্যান্য ভাষার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও সকলের অজ্ঞাত ছিল না। তাই একজন স্পষ্টই লিখিয়াছেন[১৪]—

কোন ভাষা ভাষান্তর রহিত দেখা যায় না পারস্যও আরবী সংযোগ ব্যতীত সুশ্রাব্য হয় না এবং তাহাতে অন্যান্য ভাষারো সংস্রব আছে······জবান উর্দ্দু সংস্কৃত ঢেঠ ও আরব্য ও পারস্য প্রভৃতি মিশ্রিত ও ডাক্তার জানসন ইঙ্গরেজী ভাষার অভিধান প্রথমেই কহেন যে ইঙ্গরেজী ভাষাও পূর্ব্বকালে অনিয়মরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল পরে বহুকষ্টে নিয়মিত হইল তথাপি লাতিন ও ফ্রেঞ্চ ও ডচ প্রভৃতি ভাষা মিলিত আছে সুতরাং বঙ্গভাষাও এইরূপে ভাষান্তর সংসৃষ্ট থাকাতে দুষ্ট হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে ১৮৩৮ সালের ৩০শে জুন সমাচারদর্পণও অনুরূপ মন্তব্য করিয়া বলেন[১৫]—'যে সকল কথা সাধারণ লোকেরা সংস্কৃতমূলক কথা অপেক্ষা উত্তমরূপে শীঘ্র বুঝিতে পারেন সেই সকল কথা বিদেশীয় হইলেও পরিবর্তন করা নিতান্ত অনুচিত'।

বিকৃত ও অবিকৃত ভাবে অনেক ইংরেজী শব্দ ইংরাজদের এদেশে আসার পর হইতেই বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্যবহৃত এইরূপ কয়েকটি শব্দের একটা তালিকা ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়ে' পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, আধুনিক ভাবব্যঞ্জক অনেক শব্দের বাংলায় অনুবাদও করা হয় এবং ফলে এই সময় হইতে বাংলায় অনেক

১২। General Report on Education in Bengal for 1871-2, পৃঃ ৬২, Appendix B, পৃঃ ৪-৯

১৩। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা কমলালয় (দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ১)—পৃঃ ১৩

১৪। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—প্রথম খণ্ড—পৃঃ ৬৩

১৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—দ্বিতীয় খণ্ড—পৃঃ ২২৭

নূতন শব্দের সৃষ্টি হয়। কোনও সুচিন্তিত নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে এই অনুবাদ করা হয় নাই—এক এক লেখক নিজের খুসিমত এক এক রকম অনুবাদ করিয়াছেন—কোন কোন অনুবাদ ভাষায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছে সত্য, তবু সমস্ত অনুবাদকেই নির্দোষ বলিতে পারা যায় না।[১৬]

তবে বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল্যবান্ তথ্যসমূহ বাংলা ভাষায় বাংলা পুস্তকের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার আগ্রহ দেশের মনীষিবর্গের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল—শাসকবর্গও ইহার প্রয়োজনীয়তা মানিয়া লইয়াছিলেন। ফলে স্কুল বুক সোসাইটির মত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ভাষা ও অনুবাদের স্বরূপ লইয়া বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। ইংরেজী শব্দের অনুবাদ করিতে যাইয়া এক একজন এক এক রকম অনুবাদ করায় যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই—গণিতাদি বিজ্ঞানের শব্দের অনুবাদে অবিচ্ছিন্ন সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগও তাঁহারা পছন্দ করেন নাই। তাই ১৮৭১ সালে এই অসঙ্গতির দিকে তাঁহারা 'অনুবাদ-সমিতির' দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।[১৭] এই প্রসঙ্গে এই সমিতি কি কাজ করিয়াছিলেন জানি না। তবে এই সময়ের কয়েক বৎসর পরেই ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পরিভাষা সংকলন ও বানান সমস্যার সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও সুব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রযত্নে ঠাকুর বাড়ীতে 'সারস্বত সমাজ' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[১৮] ভূগোলের পরিকল্পিত পরিভাষা পণ্ডিতসমাজের মতামত জানার উদ্দেশ্যে পত্রাকারে এই সভাকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সভা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই এবং ইহার প্রারব্ধ ও সংকল্পিত কার্যও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই সত্য তথাপি ইহার মধ্য দিয়া সমসাময়িক দেশবাসীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাস্থাপনের ব্যগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়।

যে সমস্ত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা বহু দিন পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল আজও তাহাদের পূর্ণ সমাধান হয় নাই—আজও আমরা তাহাদের

১৬। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (সাহিত্যসাধক চরিতমালা)—পৃঃ ৪১। রাজনারায়ণ বসু (সাহিত্যসাধক চরিতমালা)—পৃঃ ৯৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শব্দচয়ন—সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা ১৩৩৬।

১৭। General Report on Education in Bengal for 1861-2, পৃঃ ৬২

১৮। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (সাহিত্যসাধক চরিতমালা)—পৃঃ ৩৮

সমাধানের জন্য চেষ্টা করিয়া যাইতেছি। সুতরাং পূর্বাচার্যদিগের কৃত কার্যের কথা বিস্মৃত হওয়া সমীচীন হইবে না। আজ যখন আমরা ব্যাপকভাবে পরিভাষানিরূপণের কাজে লাগিতেছি তখন তাঁহাদের ব্যবহৃত শব্দগুলির দিকেও একবার দৃষ্টি দেওয়া দরকার। অবশ্য সুন্দরতর শব্দের আবির্ভাবে পূর্ব-প্রচলিত অনেক শব্দ কালক্রমে অপ্রচলিত ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু সে যুগের সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে এমন অনেক শব্দও পাওয়া যাইবে যাহারা অনায়াসে এখনও ব্যবহৃত হইতে পারে বা নূতন শব্দগঠনে আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে। সেকালেব সংবাদপত্র হইতে তখনকার ব্যবহৃত সামান্য কয়েকটি শব্দ যদৃচ্ছাক্রমে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

উপনীত বার্ত্তাপুস্তক (attendance register).

বাস্তুপ্রস্তর (foundation stone).

বাহ্য বিদ্যার্থী (day scholar).

পাথুরিয়া ছাপাখানা (litho press).

পাণ্ডুলেখ (plan).

হাসিল (custom duty).

হাসিল দপ্তর খানা (customs office).

সে যুগের বইপত্র ঘাটিলে এইরূপ বহু শব্দের সন্ধান মিলিবে—ব্যাবহারিক দিক্ দিয়া ইহাদের মূল্য যাহাই হউক না কেন ভাষার ইতিহাসের দিক্ দিয়া ইহাদের গুরুত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

দুঃখের বিষয় নব্য বাংলা সাহিত্যের এই প্রথম অভ্যুদয়ের সহিত আধুনিক বাঙালি জনসাধারণের পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। এ যুগের বাংলার সাহিত্যিক প্রচেষ্টার সযত্ন অনুশীলন ও বিশ্লেষণ যথোচিত ভাবে হয় নাই। যতটুকু আলোচনা হইয়াছে তাহাতে ইহার প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায় নাই। ইহা যে কেবল অনভ্যস্ত অক্ষম হস্তের অভিনব প্রয়াসের কৌতুককর নিদর্শন মাত্র নহে—ইহাদের মধ্যেও যে উৎকৃষ্ট রচনার ও রসগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়—সর্বোপরি বাংলা ভাষার প্রতি যে মমত্ববোধ ও ইহার গৌরব রক্ষার জন্য যে আন্তরিক আগ্রহের আভাস ইহার মধ্যে পাওয়া যায় তাহার ধারণা অনেকেরই নাই। তাই দরকার প্রাচীন যুগের মত এ যুগের সাহিত্যেরও বহুল প্রচার ও ব্যাপক আলোচনা। আশার কথা এ দিকে পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এ যুগের সাহিত্যসৃষ্টির কিছু কিছু পরিচয় ও নমুনা প্রকাশিত

হইয়াছে—আলোচনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলনে যতটা আগ্রহ দেখান হইয়াছে এবং যতটা প্রয়াস স্বীকার করা হইয়াছে আধুনিক সাহিত্যের গোড়ার দিক সম্বন্ধে ততটা হয় নাই। প্রাচীন যুগের ছোট-বড় ভাল-মন্দ সব রকম লেখকের লেখাই প্রকাশিত ও আলোচিত হইতেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায়ও পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লেখা কিছু কিছু বইও প্রকাশিত হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহাদের ভাষা ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয় নাই—বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে স্থান লাভ করিবার গৌরব এখনও তাহাদের অধিকাংশই অর্জন করিতে পারে নাই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত কিছু কিছু গ্রন্থের মধ্য দিয়া আমরা অপরিচিতপ্রায় অনেক লেখক ও লেখার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি কিন্তু এখনও পরিচয়যোগ্য সকলের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেওয়ার কোনও সুব্যবস্থা হয় নাই। আমাদের সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে এ ত্রুটি আদৌ উপেক্ষণীয় নয়—সত্বর ইহা দূর করিবার জন্য সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই অবহিত হওয়া উচিত।



বিজ্ঞাপনে বাংলা শব্দ

আমোদ-প্রমোদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষা বাঙালির জীবনের এই সমস্ত বিভিন্ন বিভাগে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত ইংরেজী শব্দের ব্যবহার একরূপ একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার প্রভৃতি নাট্যশালার নামে—ইস্ট বেঙ্গল সোসাইটি, ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটি, জহুরলাল পান্নালাল এণ্ড সনস প্রভৃতি বিভিন্ন বস্ত্রবিক্রেতাদের নামে—প্যারাগন স্টোরস, বুক কোম্পানি, পায়োনিয়র কোম্পানি প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়ের নামে এবং ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি, এথিনিয়ম ইনস্টিটিউশন, এরিয়ান ইনস্টিটিউশন, দি প্যাট্রিয়টিক লাইব্রেরি, দি কটেজ লাইব্রেরি প্রভৃতি বিদ্যালয় ও পাঠাগারের নামে নিছক ইংরেজী শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।

দেশের অন্যান্য জিনিষের মত দেশের ভাষার প্রতি আদর বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে এই সকল ব্যাপারে বাংলা শব্দ-ব্যবহারের বিশেষ ঝোঁক দেখা যাইতেছে। পূর্বে আমাদের দেশে এখনকার মত স্কুল-কলেজ, দোকান-পাট ও আমোদ-প্রমোদের এত আয়োজন ছিল না, তাই তখনকার দিনে যাহা ছিল, তাহার নামকরণ লইয়া কোনও গোল বাধিত না। তাহা ছাড়া, তখন যেরূপ নাম ব্যবহৃত হইত—এখন সেরূপ নাম লোকের রুচিকর হয় না। তখনকার পাঠশালা, টোল, মুদিখানা, যাত্রার দল, গানের দল প্রধানতঃ স্থানের নামে পরিচিত হইত। বামুনপাড়ার পাঠশালা, কায়েতপাড়ার মুদিখানা প্রভৃতি নাম সে যুগে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। অনেক ক্ষেত্রে আবার ব্যক্তিবিশেষের নামেও এগুলি পরিচিত হইত। বিদ্যাবাগীশের টোল, গোপাল উড়ের দল বলিলেই লোকের বুঝিবার কোনও অসুবিধা হইত না। এই সেদিন পর্যন্ত কলিকাতার শোভাবাজারের এরিয়ন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠাতা বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের নামানুসারে 'সারদা মিত্রের স্কুল' নামে সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি শিক্ষকের নামানুসারে যথাক্রমে 'জগবন্ধু মোদকের স্কুল' ও 'গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল' নামে অভিহিত হইত। এখনও অনেক ছোট ছোট মুদিখানা, দর্জির দোকান প্রভৃতি স্বত্বাধিকারীর নামেই পরিচিত।

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি—এ রীতি এখনকার লোকের অভিপ্রেত নহে। আধুনিক জগতে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র নামকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা দেশেও সেই নিয়মের অনুসরণ করা হইতেছে। তাই প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র নাম কল্পিত হইতেছে। নবজাত বালক-বালিকার নামকরণের সময় যেমন সাধারণতঃ শব্দের সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়—এই সকল প্রতিষ্ঠানের নামকরণের সময়ও সেইরূপ সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, কোনও বিষয়েই সৌন্দর্য উপেক্ষণীয় নহে। নামমাত্রের সৌন্দর্য অনেক ক্ষেত্রে বস্তুকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলে। ইহা ভাবুকের অতিশয়োক্তি নহে—অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবিক সত্য।

সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ব্যবহৃত শব্দেব সৌন্দর্যের প্রধান উপকরণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যে শব্দ কোনও বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিতে অক্ষম, তাহাকে সুন্দর বলা চলে না। অবশ্য, কোনও একটি মাত্র বস্তুবিশেষকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত সংজ্ঞাবাচক শব্দের তাদৃশ অর্থানুসন্ধানের প্রয়োজন নাই সত্য, তবে এমন কোনও শব্দ ব্যবহার করা কখনই উচিত নহে, যাহা অনভিপ্রেত ও বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে, সম্ভবপর হইলে সর্বত্রই অর্থপ্রকাশে সমর্থ শব্দই ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত। যাহা হউক, দীর্ঘ মুখবন্ধের প্রয়োজন নাই। এইবার বাংলায় ব্যবহৃত শব্দগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

যে সকল স্থানে অভিনয়াদি আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হয়, তাহাদিগের নামকরণেব জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত শব্দগুলিতে মাধুর্য ও বিলাসিতার যে সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে—তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবাব বিষয়। বস্তুতঃ, এই সমস্ত শব্দই, বোধ হয়, অন্যান্য ব্যবহৃত শব্দ অপেক্ষা সুন্দর ও মনোরম। নাট্যনিকেতন, রঙমহল, নাট্যমন্দির, রূপবাণী, রূপকথা, চিত্রা, ছায়াবাণী প্রভৃতি নামের মধ্যে মাধুর্য ও সার্থকতা মিলিত হইয়া হৃদয়কে রসবোধের অনুকূল করিয়া তোলে। 'উত্তরা' ও 'সুকল্যাণী'র নামকরণে অবশ্য সেরূপ মাধুর্যের উপলব্ধি হয় কি না সন্দেহ। তাহার প্রধান কারণ শব্দের সহিত প্রকৃত বস্তুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাব। উত্তর দিক ও সুমঙ্গলের সহিত প্রদর্শিত চিত্রের সম্বন্ধ কল্পনা করিতে পারিলেও তাহা তেমন ঘনিষ্ঠ নহে।

শেষোক্ত দুইটি নাম ও 'চিত্রা'র স্ত্রীলিঙ্গরূপ বর্তমান বাংলা ভাষায় শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ করিয়া ব্যবহার করিবার অতিমাত্র আগ্রহের অন্যতম উদাহরণ।

'বিতর্কিকা', 'বিচিত্রিতা', 'স্মৃতিবার্ষিকী', 'শতবার্ষিকী', 'জয়ন্তী', 'পশ্চিম-যাত্রিকী' (পশ্চিমযাত্রার বিবরণ), গীতিলা (বাদ্যযন্ত্রের দোকান) প্রভৃতি অন্য প্রসঙ্গে ব্যবহৃত বহু শব্দেরও উল্লেখ এই স্থানে করা যাইতে পারে। নাম-গুলিকে গালভরা করিবার জন্যই এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গ দীর্ঘান্ত শব্দ ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে।

আধুনিক রঙ্গালয়ের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ জলযোগের স্থান 'রেস্তোরাঁ' বাংলায় অনেকক্ষেত্রে অপরূপ রূপ লাভ করিয়াছে। ইহাকে অনেকে কেবল 'আশ্রম' নামে অভিহিত করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই—'কুলকুণ্ডলিনী আশ্রম' পর্যন্ত বলিয়াছেন। জানি না এই আশ্রমে কুলকুণ্ডলিনী জাগরিত করিবার কোনও ব্যবস্থা আছে কি না! এই সকল স্থানের অত্যাধুনিক নামকরণ কিন্তু অনেক স্থলে বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। যথা—আরামঘর, তৃপ্তিসদন প্রভৃতি। অর্থ যাহাই হউক না কেন 'চা-পানী' শব্দটিও নিতান্ত মন্দ নহে।

গৃহ বা আধারবাচক বিভিন্ন শব্দ যোগ করিয়াই আজকাল বিবিধ পণ্য-কেন্দ্রকে অভিহিত কবিবার প্রথা দাঁড়াইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত শব্দ-গুলির মধ্যে 'আলয়' (কমলালয়, বসনালয়), 'সদন' (সূচীশিল্পসদন, তৃপ্তি-সদন), 'আগাব' (মিষ্টান্নাগার, বস্ত্রাগার), 'ভাণ্ডার' (মাতৃভাণ্ডার, কমলা-ভাণ্ডার, বিক্রমপুব ভাণ্ডাব), 'ভবন' (পরিচ্ছদভবন, কলাভবন), 'প্রতিষ্ঠান' (বস্ত্রপ্রতিষ্ঠান, খাদ্যপ্রতিষ্ঠান, পাদুকা-প্রতিষ্ঠান), ও 'আয়তন' (রূপায়তন—দর্জির কারখানা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'শালা', 'নিলয়' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া নামের আরও বৈচিত্র্যসম্পাদন অসম্ভব ও অবাঞ্ছনীয় নহে।

এই সমস্ত নামে বৈচিত্র্যেব অভাব অনুভব করিয়াই কি অনেকে নামের ইংবেজী রূপ (অবশ্য বাংলা অক্ষরে) বজায় রাখিয়াছেন? এই সকল নামের সঙ্গে স্থলবিশেষে বাংলা উপপদ বিশেষ কৌতুককর। উদাহরণস্বরূপ শেফালী স্টোর্স, বিনামা স্টোর্স, ভগবতী প্রেস, ভগবতী টেলারিং হল, ভগবতী লণ্ড্রী, বাসন্তী বুক বাইণ্ডিং শপ, ভারত অয়েল মিল, দেলখোস কেবিন, তরুণ রেস্টুরেন্ট—এই কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অবশ্য একথা ঠিক যে, ব্যবসায়গুলি বেশীর ভাগ ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত, সুতরাং অনেকস্থলে ইউরোপীয় নাম অপরিহার্য। যে স্থানে সুশ্রাব্য সুবোধ্য বাংলা শব্দের অমিল হয়, সে স্থলে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা খুবই দরকার। তবে এরূপ স্থলেও শব্দগুলিকে দেশী ছাঁচে ঢালিয়া লইতে পারিলে মন্দ হয় না।

সকল ভাষায়ই এরূপে বিদেশী শব্দ প্রবেশ লাভ করে। কিন্তু এ বিষয়ে একটা সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। আধুনিক বাংলায় এরূপ কোনও পদ্ধতির সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় না। তাই কেহ দেশী শব্দ ব্যবহার করিতেছেন—কেহ নিছক ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন—কেহ ইংরেজী বাংলার মিশ্রণে খিচুড়ি তৈয়ারী করিতেছেন—কেহ বা ইংরেজী শব্দগুলিকে বাংলা অক্ষরে লিখিয়া বাংলার মর্যাদা রক্ষা করিতেছেন। আবার কেহ শুদ্ধ বাংলা শব্দ-ব্যবহারে ভয় পাইয়াই, বোধ হয়, বাংলা শব্দকে ইংরেজী অক্ষরে লিখিতেছেন। দেশীয় অক্ষরে ইংরেজী শব্দের ব্যবহার আধুনিক যুগে আলোক-চিত্রের বিজ্ঞাপনে অতিরিক্ত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল অভিনেয় গ্রন্থের নামই দেশীয় অক্ষরে না দিয়া সমগ্র বিষয়টাকেই এইরূপে দেশীয় অক্ষরের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টাও কখনও কখনও করা হয়। 'হ্যারল্ড লয়েড ইন দি ক্যাটস প' এইরূপ বিজ্ঞাপন অনেক সময় চোখে পড়ে এবং চোখ বুজিয়া ভাবিতে হয়—এই বিজ্ঞাপন কাহাদের উদ্দেশ্যে অভিপ্রেত। ইংরেজী-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য প্রস্তুত হইলে, ইহা সত্য সত্যই তাহাদের পক্ষে বিষয়টি বুঝিবার সহায়তা করে, কি ব্যাঘাতের সৃষ্টি করে? বাংলা শব্দও যে কখনও কখনও ইংরেজী অক্ষরে প্রচারিত হয় তাহা সাধারণের চক্ষে ধাঁধা লাগাইবার জন্য, না তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য তাহা নির্ণয় করা শক্ত। "Garima", "Geetila", "Rupayatan", "Amritayan" প্রভৃতি শব্দ ঠিক করিয়া পড়িয়া উঠাও অনেক সময়ে শক্ত—অর্থবোধ ত পরের কথা।

বস্তুতঃ, সাধারণের বুঝিবার সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিলে যথাসম্ভব খাঁটি দেশীয় শব্দ ব্যবহার করা ভাল বলিয়া মনে হয়। 'কাপড়ের কল', 'তেল কল', 'মুদিখানা', 'ময়রার দোকান', প্রভৃতি দেশী নাম 'কটন মিল', 'অয়েল মিল', প্রভৃতি বিদেশী নাম অপেক্ষা সাধারণের পক্ষে অনেক সহজবোধ্য সন্দেহ নাই। Exhibitionএর আক্ষরিক অনুবাদ 'প্রদর্শনী' সাধারণের নিকট কি অর্থ প্রকাশ করে জানি না, তবে 'মেলা' বলিলে কাহারও বুঝিবার অসুবিধা হয় না—একথা স্থির। এই কারণেই প্রবীণ ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটে' কলিকাতার রাস্তার নামকরণে পরিচিত 'সড়ক' প্রভৃতি শব্দ চালাইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন।

অবশ্য কেবল বাংলা শব্দ-ব্যবহারে বাঙালির সুবিধা হইলেও অবাঙালিকে কোন কোন স্থলে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে এবং ফলে ব্যবসায়েরও

হানি হইতে পারে। তাই স্থলবিশেষে বাংলা নামকরণের সঙ্গে ইংরেজী ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতে পারে (যথা—আরামঘর—An up to date Restaurant)। কিন্তু দেশী শব্দগুলিকে একেবারে উপেক্ষা করা কোনও ক্রমেই উচিত নয়। গালভরা শ্রুতিসুখকর শব্দের জন্য নবগঠিত সংস্কৃত শব্দের আশ্রয় লওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলেও চিরপ্রচলিত দেশী শব্দ পরিত্যাগ করা সঙ্গত হইবে না। তবে যে সকল স্থলে প্রাচীন দেশী শব্দ পাওয়া যাইবে না—সে সকল স্থলে সুবিধামত ইংরেজী শব্দ গ্রহণ বা সংস্কৃত ধাতু হইতে মধুর অথচ বিশুদ্ধ নূতন শব্দ গঠন করিতেই হইবে। বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-সঙ্কলন সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতি এই নীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। ব্যবসায় সম্বন্ধেও সেই নীতি অসঙ্কোচে অবলম্বিত হইতে পারে।

সাহিত্যে শিক্ষানবিশি

বাংলার বিভিন্ন শহরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, এমন কি গণ্ডগ্রামে আজ সাহিত্যালোচনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে,—সাহিত্যসভা, সাহিত্যিক আলোচনা আজ একরূপ দৈনন্দিন ব্যাপারের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন না কোন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকা আজ অল্পবিস্তর গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা ভাষায় কথা বলা, চিঠি লেখা বা বক্তৃতা করার মধ্যে আজ আর তেমন লজ্জা বা ন্যূনতা-বোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। শিক্ষিত অশিক্ষিত অনেকেই আজ সাহিত্যিক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস বা নেহাত পক্ষে একখানি ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া অনেকেই সাহিত্যিকত্বের দাবি পাকা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বাঙালি তাহার ভাষা—তাহার সাহিত্য লইয়া গর্বিত। তাহার ধারণা ইহার প্রাচীন কীর্তি ও বর্তমান রূপ সমগ্র দেশের শ্লাঘার বিষয়—বাংলাই রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করিবার উপযুক্ত ভাষা। তাই বাংলার বাহিরে বাংলা ভাষার প্রসারবৃদ্ধির জন্য অনেকে উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। মোটের উপর সকল দিকেই নবীন আশার নয়নমোহন আলোকরাশি উদ্ভাসিত হইতেছে।

কিন্তু দোষদর্শী শিক্ষক তাহাতে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। তাঁহার এ অতৃপ্তি তাঁহার প্রকৃতিগত, সুতরাং উপেক্ষণীয়—এরূপ ধারণা স্বাভাবিক হইলেও এই স্বাতন্ত্র্যের যুগে একবার সুধীজন এই 'উদ্ভট' মনোভাবের কারণগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন না কি ?

সত্য বটে, 'সর্বঃ কান্তমাত্মানং পশ্যতি'—সকলেই নিজেকে সুন্দর মনে করে —নিজের জিনিস সকলের চক্ষেই নির্দোষ। কিন্তু একথাও কি সত্য নয় যে মানুষ যাহাকে যত বেশী ভালবাসে তাহার অমঙ্গলের আশঙ্কাও তাহার চিত্তে তত বেশী—'স্নেহঃ পাপশঙ্কী ভবতি' ? যাহার প্রতি আমার মমত্ববোধ নাই তাহার ইষ্টানিষ্টে আমি তেমন বিচলিত হই না--তাহাকে যদি প্রশংসা করি তবে অনেকক্ষেত্রে তাহার প্রধান অথবা একমাত্র কারণ—অকারণ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে চাহি না—সে প্রশংসার অন্তরালে একটা ঔদাসীন্য

লুক্কায়িত থাকে—সে প্রশংসা অতি অল্পস্থলেই দীর্ঘকালব্যাপী ধীর বিবেচনার ফল। নিজের জন সম্বন্ধেও যদি আমরা এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া কাজ করি তবে তাহা নিদারুণ দুঃখের বিষয়, ভবিষ্যতে গভীর অকল্যাণের কারণ। তাই আমাদের পরম আদরের ও নিরতিশয় শ্রদ্ধার বস্তু জননী বঙ্গভাষার সম্বন্ধে আলোচনার সময় স্বতই আমাদের মনে ইহার দুঃখদৈন্য, অভাব-অভিযোগ ত্রুটিবিচ্যুতির কথা জাগিয়া উঠে।

তাই যখনই দেখি কেহ ভাষাজননীর—বঙ্গসাহিত্যের সেবার অজুহাতে নিজের মাহাত্ম্যপ্রচারেই ব্যস্ত, যখনই দেখি জননীকে সাজাইবাব নাম করিয়া কেহ বালসুলভ চপলতাবশতঃ অনিপুণ হস্তে প্রস্তুত অসার খেলনার সামগ্রী দিয়া তাঁহার দেহকে নিপীড়িত করিতেছে এবং সেজন্য নিতান্ত আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতেছে, তখন এই ছেলেখেলা দেখিয়া হাসিব কি কাঁদিব বুঝি না। যখনই দেখি সাহিত্যসেবার কার্যে অনেকেই পরম ভগবদ্‌ভক্তের মত ভগবদ্দত্ত স্বকীয় নৈসর্গিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন—অন্যান্য বিষয়ের মত এ ক্ষেত্রে কোনও শিক্ষানবিশির প্রয়োজন অনুভব করেন না তখন বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া থাকিতে হয়। সকল ব্যাপারেই সাফল্য-লাভের জন্য চাই সাধনা, চাই দীক্ষা, চাই সংযম, চাই পরিশ্রম। যে কোনও বিষয়ে অধিকারলাভের জন্য এইগুলিই হইল প্রথম সোপান। দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশের নানা প্রচেষ্টার মত সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রেও এই অপরিহার্য প্রথম সোপানগুলি উপেক্ষা করিয়াই অনেকে মন্দিরশিখরে আরোহণ করিবার বিফল প্রযত্ন করিয়া একদিকে সুধীজনের উপহাসাস্পদ হইতেছেন, অপরদিকে সমব্যবসায়ীদের উন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া সোপানগুলির অবমাননা করিতেছেন। অন্ধের মত সকলেই ছুটিয়াছেন গভীর অন্ধকারের দিকে।

ফলে বাংলা সাহিত্যে আজ এক গুরুতর উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হইয়াছে। ভাব ও রসের মর্যাদারক্ষার কথা এস্থলে তুলিব না। অবশ্য সেদিকেও দারুণ দুরবস্থার অগণিত নিদর্শন বিরাজমান। বস্তুতঃ সাহিত্যের মূল অবলম্বন ভাষাই যেখানে বিকৃত ও কলুষিত, সেখানে তাহার সাহিত্যে মাধুর্য ও চমৎকারিত্বের আশা করা অনেক সময়ই বাতুলতামাত্র। সাহিত্যের প্রকৃত রসস্ফূর্তি ও উৎকর্ষসাধনের জন্য চাই ভাষার বিশুদ্ধি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভাষার বিশুদ্ধির কথা তুলিলেই অনেকে ভ্রূ কুঞ্চিত করেন—উচ্চকণ্ঠে বলিতে দ্বিধা বোধ করেন না যে বাংলা ভাষা জীবিত ভাষা, ব্যাকরণের খুঁটিনাটি ইহার মধ্যে

চলিবে না। অথচ ইংরেজী প্রভৃতি সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত সমৃদ্ধ ভাষা সম্বন্ধে এ রকম যুক্তি বা তদনুযায়ী প্রয়োগ আদৌ দেখা যায় না। বস্তুতঃ, এমন অনেককেই দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা. রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'পদ্মবনে মত্তকরিসম বাংলা ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত করিতে পারেন অথচ ভ্রমক্রমে ইংরাজীর ফোঁটা অথবা মাত্রার বিচ্যুতি ঘটিলে ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলেন।' ফলে, বর্তমানে বাংলা ভাষায় যে অরাজকতা চলিতেছে কোনও সমুন্নত জাতির ভাষায় বোধ হয় তাহা চলে না। সত্য বটে, বহুল ব্যবহারের ফলে ক্রমে সকল ভাষায়ই এমন অনেক প্রয়োগ মানিয়া লওয়া হয় যেগুলি ব্যাকরণানুগত নহে—অনেকক্ষেত্রে সেই সকল প্রয়োগের খাতিরে ব্যাকরণের প্রচলিত নিয়মেরও সংশোধন করা হয়—নূতন নূতন নিয়ম গড়িয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যাকরণে অনভিজ্ঞতা-বশতঃ ব্যাকরণবিরোধী নিত্য-নূতন শব্দের প্রয়োগ কোনও ভাষায়ই কখনও সমর্থিত হইতে পারে না। আর আধুনিক বাংলা ভাষার এমনই দুর্ভাগ্য যে পদে পদে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করা হইতেছে। সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য অথবা অন্য কোন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য জ্ঞাতসারেই যে এরূপ করা হইয়া থাকে এমন কথা বলা চলে না। অনেক ক্ষেত্রেই এ জাতীয় প্রয়োগের মূল কারণ অজ্ঞতা বা অনবধানতা। চঞ্চলিত, সচঞ্চল, মৎলিখিত, শরৎচন্দ্র, ঘূর্ণ্যমান, অস্তমান, মুহ্যমান, পুঞ্জীয়মান, দুল্যমান, ভ্রাম্যমান, আহরিত, সিঞ্চিত, আবরিত, প্রমাণিত, মহদন্তঃকরণ, মহদাশয়, নিরলস, নিরহঙ্কারী, সততা, বৈরতা, প্রসারতা, লক্ষ্যণীয়, উৎসর্গীকৃত প্রভৃতি অসংখ্য অশুদ্ধ পদ বাংলা ভাষার সম্পদ্ ও গৌরব বাড়াইয়া তুলিয়াছে একথা মনে করা চলে না। আর এইগুলিকে শুদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিলেই বাংলা ভাষার অমর্যাদা হইবে এমনও নয়। উহাদের কতকগুলি কোনরূপে সমর্থন করা গেলেও বাকীগুলি সমর্থনের অযোগ্য।

শব্দের রূপবিকৃতি যেমন ভাষাকে অসুন্দর করিয়া তোলে অর্থবিকৃতি ও অর্থের অস্পষ্টতাও সেইরূপ ভাবপ্রকাশের প্রতিকূলতা করিয়া থাকে। শব্দের ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া তাই অনেকে অনেক সময় অনুপযোগী শব্দরাশি প্রয়োগ করিয়া পাঠকের সন্ত্রাসের কারণ হইয়া উঠেন। সেদিন চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপনে দেখিলাম একখানি নূতন চিত্রের পরিচয়দান-প্রসঙ্গে 'রূপরসগন্ধমধুর চিত্র' এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। চিত্রের রূপ বোঝা যায়, রসও না হয় অনুমেয়, কিন্তু গন্ধ কি? তাই অনেক স্থলে অর্থ বুঝিতে হইলেই অক্ষরার্থকে উপেক্ষা

করিয়া কেবল তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। অবশ্য, সকল শব্দই সাহিত্যিকের হাতে সকল সময় অভিধাননির্দিষ্ট বাঁধাধরা অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না—মূল অর্থ হইতে নানা গৌণ অর্থের উদ্ভব হইয়া শব্দের মাধুর্য বাড়াইয়া তোলে এবং সাহিত্যিক রসের সৃষ্টি করে। কিন্তু তাহারও একটা নিয়ম আছে। কোনও বিশেষ চমৎকারিত্ব না থাকিলে অযথা কোন শব্দের স্বকপোলকল্পিত অর্থে প্রয়োগ কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, যাহাই লিখি না কেন তাহার অর্থ যদি স্পষ্ট না হয়—যদি ছত্রে ছত্রে রহস্য থাকে তবে লেখার উদ্দেশ্য অনেক সময়ই ব্যর্থ হইয়া যায়। দর্শনাদি গুরু বিষয় ছাড়া কাব্যনাটকাদির প্রধান লক্ষ্য হইল 'সদ্যঃপরনির্বৃতি'—পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পরম পরিতৃপ্তিলাভ। প্রত্যেক লেখকের সকল সময় এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে—পাঠকের মন কেবল শব্দের মোহে মুগ্ধ করিলে চলিবে না—অর্থের স্পষ্টপ্রতীতি যাহাতে সাহিত্যরসপিপাসুর চিত্তকে দ্রবীভূত করে তাহাব ব্যবস্থা লেখককে প্রতি পদে করিতে হইবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এক দিকে অসীম ঔদাসীন্য ও অপর দিকে সর্বনাশকর আত্মম্ভরিতা আমাদিগকে গভীর মোহে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তাই প্রয়োগগুলির সাধুতা বিচার করিয়া দেখা অযথা পাণ্ডিত্যপ্রকাশ ও মূল্যবান সময়ের নির্বোধোচিত অপব্যবহার বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। অথচ ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনেকের নিকটই এই সমস্ত ত্রুটি ধরা পড়িবে। ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে শব্দেব বিশুদ্ধ প্রয়োগ নির্ণয় করা একেবারে অসাধ্য নহে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে—যাঁহাদের রচনায় বাংলা সাহিত্য গৌরবান্বিত—যাঁহাবা বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া শাশ্বত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহাদের লেখার মধ্যে এ জাতীয় ত্রুটি অতি সামান্যই পরিলক্ষিত হয়। সেইরূপ আদর্শের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলেই ব্যর্থতার আশঙ্কা ঘনীভূত হইবে।

পরের ছিদ্রান্বেষণ ও পরনিন্দাই আমার উদ্দেশ্য নয়। যদি কেহ সেরূপ মনে করেন তবে নিতান্তই অবিচার করা হইবে। বাংলা সাহিত্যের যাঁহারা প্রকৃতই সেবা করিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—এই সেবার অধিকার লাভ করার জন্য তাঁহাদের গুরুর উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে—মনে রাখিতে হইবে গুরুকরণ ব্যতীত কোনও সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নহে। তবে ভরসার কথা এই যে, সাহিত্যারাধনার জন্য সকল

সময় জীবিত গুরু বরণ না করিলেও চলিতে পারে। কেবল বিচার করা দরকার, যাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিতেছি গুরু হইবার উপযুক্ত গুণ তাঁহার আছে কি না—সদ্‌গুরুর নির্দেশমত তিনি সৎপথে চলিয়া নিজে প্রকৃত সাহিত্যের সাধক হইয়াছেন কিনা। এইরূপ গুরুর মৌখিক বা গ্রন্থাকারে লিখিত উপদেশ বা আদর্শ শ্রদ্ধার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করিলে সাহিত্যসেবার অধিকার জন্মিবে—সেবা সার্থক হইবে—বঙ্গভাষা ও বাঙালি ধন্য হইবে। এই গুরু-করণই হইল এখনকার শিক্ষানবিশি। আধুনিক জগতে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষানবিশির কঠোরতা গুরুসেবার কঠোরতা অপেক্ষা কম নহে—অথচ তাহা সর্বসম্মতিক্রমে অপরিহার্য। শিক্ষানবিশির সময়ে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় আপাতত তাহা ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতে পারে—শিক্ষানবিশিকালে নির্মিত অনেক জিনিস উপেক্ষিত, অগ্রাহ্য ও পরিত্যক্ত হইতে পারে; তাই বলিয়া শিক্ষানবিশিকে অবহেলা করার উপায় নাই। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যতদিন এই শিক্ষানবিশির গুরুত্ব ও আবশ্যকতা সাহিত্যসেবাভিলাষিগণ সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিবেন—প্রথম সৃষ্টির মোহ ত্যাগ করিতে না পারিবেন ততদিন সুফললাভের সম্ভাবনা কম।

এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ স্মরণ করাইয়া দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'এ পর্যন্ত ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিজের অনুরাগেই বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, বাংলা শিখিবার জন্য তাঁহাদিগকে অতিমাত্র চেষ্টা করিতে হয় নাই।······কিন্তু সকলের শক্তি সমান নহে; অশিক্ষা ও অনভ্যাসের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার কর্তব্য পালন সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং বাংলা অপেক্ষাকৃত অপরিণত ভাষা বলিয়াই তাহাকে কাজে লাগাইতে হইলে সবিশেষ শিক্ষা ও নৈপুণ্যের আবশ্যক করে।'

বর্তমান বাংলা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ

বর্তমান বাংলা নাটক সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত একথা একরূপ সর্ববাদিসম্মত। সুতরাং ইহার সহিত প্রাচীন ভারতীয় নাট্যের কোনরূপ যোগাযোগ আছে কি না এবং থাকিলে তাহা কিরূপ, তাহার বিস্তৃত আলোচনা এখনও হয় নাই। অথচ একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, বর্তমান বাংলা নাটকের উপর ইউরোপীয় নাটকের যে অবিসংবাদিত প্রভাব বর্তমান তাহার অন্তরালে সংস্কৃত-রীতির ছায়া প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। বাংলা নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের অনুশাসনের অনুবর্তন করেন নাই সত্য, তবে তাঁহারা অনেকস্থলে ইউরোপীয় আদর্শে রচিত নাটককে নানা ভাবে সংস্কৃত আকার দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে, তাঁহাদিগের অনেক স্থলে সংস্কৃত-নাট্যশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ অনেক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে—ইউরোপীয় শব্দের আক্ষরিক অনুবাদেব দ্বারা তাঁহারা এস্থলে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। অবশ্য সকল স্থলে সংস্কৃত শব্দের প্রচলিত অর্থ রক্ষিত হয় নাই—অর্থ পরিবর্তিত বা বিকৃত হইয়াছে। অর্থতত্ত্বের (Semantics) আলোচনাকারীদের নিকট ইহা উপেক্ষার বিষয় নহে। বস্তুতঃ, অনেকস্থলে বাংলা নাটকের প্রাণ ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে গৃহীত এবং ইহার বাহ্য আকার ভারতীয় রীতিতে গঠিত। আর অনেক স্থলে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য আদর্শে রচিত বস্তুর উপর প্রাচ্যবর্ণের অনুলেপন। সম্প্রতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বাংলা নাটকের উপর ভাব প্রভৃতির দিক দিয়া সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভূত প্রভাবের আভাস দিয়াছেন।* বর্তমান প্রবন্ধে আমি বাংলা নাটকে ব্যবহৃত সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের কতকগুলি শব্দের ব্যবহার-প্রণালী লইয়া সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব। প্রসঙ্গক্রমে, বাংলা নাট্যসাহিত্যে ব্যবহৃত কতকগুলি নূতন শব্দের কথাও উল্লিখিত হইবে।

*সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৮, পৃঃ ৪৮; *The Calcutta Review*, October, 1931.

প্রথমে নাট্যসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগের কথা। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে নাট্য-সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকার বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই বিষয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যে সংস্কৃত রীতি আদৌ অনুসৃত হয় নাই। কতকগুলি সংজ্ঞা সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে সত্য—কিন্তু শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য মোটেই রক্ষিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, নাট্যসাহিত্যের প্রকারভেদ নিরূপণে অনেক স্থলে ইউরোপীয় আদর্শের অনুকরণ করা হইয়াছে।

বাংলায় নাট্যসাহিত্যের সাধারণ নাম নাট্য বা নাটক। ইহার বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে মিলনান্ত নাটক, বিয়োগান্ত নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক নাটক, গীতিনাটক, গীতিনাট্য বা নাটগীতি, গীতিকাব্য, নাট্যকাব্য, পারিবারিক নাটক, ভাবরসাত্মক নাটক প্রভৃতি নামগুলি উল্লেখযোগ্য। এই নামগুলির আকর সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র নহে—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলি ইংরেজী নামের অনুবাদ। কোন কোন স্থলে অনুবাদ না করিয়া খাঁটি বিদেশী নামটি ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দবিদায়' 'প্যারডি নাটিকা' নামে অভিহিত হইয়াছে।

সংস্কৃত কোন কোন সংজ্ঞাও বাংলা নাট্য-সাহিত্যের প্রকারনির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। সংস্কৃতে দৃশ্যকাব্য বা রূপক নাট্য-সাহিত্যের সাধারণ নাম। ঠিক এই অর্থে না হইলেও এই দুইটি নাম বাংলা নাট্যসাহিত্যে অজ্ঞাত নহে। যে নাট্যগ্রন্থে শ্রব্যকাব্যোচিত বর্ণনাদির আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলায় কোথাও কোথাও তাহারই নাম দেওয়া হইয়াছে দৃশ্যকাব্য। অবশ্য এই নাম সর্বত্র ব্যবহৃত হয় নাই। গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'অভিমন্যুবধ'কে দৃশ্যকাব্য আখ্যা দিয়াছেন; কিন্তু 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'লক্ষ্মণবর্জন' প্রভৃতি এই জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থকে তিনি নাটক বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। যে অর্থে দৃশ্যকাব্য শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে কোন কোন স্থলে অভিনয়কাব্য এই শব্দের প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এই প্রসঙ্গে নাট্যকাব্য শব্দটিরই সমধিক প্রচার।

বাংলা সাহিত্যে রূপক শব্দের অর্থ শুধু নাট্যগ্রন্থ নহে। যে গ্রন্থে রূপক বা allegory-র আশ্রয় লওয়া হইয়াছে—বাংলায় তাহারই নাম রূপক। সংস্কৃতে রূপক, উপরূপক এই দুইভাগে নাট্য-সাহিত্যকে বিভক্ত করা হইয়াছে। বাংলায় রাজকৃষ্ণ রায়-প্রণীত নাটকের উৎপত্তিবিষয়ক গ্রন্থ 'নাট্যসম্ভবের' নাম উপরূপক দেওয়া হইয়াছে। এই নামকরণের হেতু অজ্ঞাত।

বাংলায় নাটিকা শব্দ ক্ষুদ্র নাটক এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতের ন্যায় বাংলায় নাটিকার রস ও অঙ্কাদি বিষয়ে কোনও বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রহসন বাংলা ও সংস্কৃতে প্রায় অনুরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবে সংস্কৃত নিয়মানুসারে প্রহসনের অঙ্ক-সংখ্যা এক। বাংলায় কিন্তু প্রহসনের একাধিক অঙ্কও দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ রামনারায়ণ তর্করত্ন-কৃত তিন অঙ্কের প্রহসন 'চক্ষুদান'-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বাংলা কোনপ্রকার নাট্যভেদেই সংস্কৃতের ন্যায় অঙ্ক-সংখ্যার নিয়ম নাই। সাধারণ নিয়মানুসারে সংস্কৃত-নাটকের অঙ্ক-সংখ্যা পাঁচ হইতে দশ।[১] বাংলায় কিন্তু এরূপ কোনও নিয়ম নাই। বাংলায় নাটকের অঙ্ক-সংখ্যা সাধারণতঃ পাঁচ ; কিন্তু ইহার বেশী বা কম সংখ্যাও অনেক সময় দেখা যায়। হাস্যরসবহুল নাট্যগ্রন্থ বাংলায় কেবল প্রহসন এই সংজ্ঞা দ্বারাই যে নির্দিষ্ট হয় এমন নহে। এই অর্থে বহু সংজ্ঞার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—হাসক, পঞ্চরং বা পঞ্চরঙ্গ, বঙ্গনাট্য, নাট্যরঙ্গ, কৌতুকনাট্য, ব্যঙ্গনাট্য প্রভৃতি। অমৃতলাল বসু তাঁহাব 'অবতার'-এর আখ্যা দিয়াছিলেন—'প্র-পরা-অপ-সং-হসন' ; প্র-হসন এই ক্ষুদ্র নামে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

নাট্যরাসকের প্রকৃত স্বরূপবিষয়ে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে প্রচুর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে সুপ্রচলিত সাহিত্যদর্পণেব মতে—নাট্যরাসক একাঙ্ক, বহুতাললয়বিশিষ্ট, উদাত্তনায়ক ও পীঠমর্দ উপনায়কযুক্ত, শৃঙ্গাররসান্বিত, হাস্যরসবহুল ও বাসকসজ্জিকা নাম্নী নায়িকাযুক্ত। আব নাট্যদর্পণকারের মতে যে-গ্রন্থে রমণীগণ সাগ্রহে নৃত্য দ্বারা বসন্তকালে নরপতির কার্যাবলী প্রকাশ করে তাহারই নাম নাট্যরাসক।

রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহাব 'পরিব্রতা' নাট্যগীতির ভূমিকায় নাট্যরাসকের এক অতি স্পষ্ট লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—নাট্যরাসক বা নাট্যগীতির প্রকৃত অর্থ আদ্যন্ত স্বরনিবদ্ধ সঙ্গীতময় অভিনেয় গ্রন্থ। অমৃতলালের 'সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্কভঞ্জন' ও গিরিশচন্দ্রের 'অকাল বোধন' নাট্যরাসক নামে অভিহিত হইয়াছে।

১ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সংস্কৃতেও একাঙ্ক, দ্ব্যঙ্ক, ত্র্যঙ্ক ও চতুরঙ্ক নাটক দেখিতে পাওয়া যায়। (Keith—*Sanskrit Drama*, পৃ. ৩৪৫)।

কয়েকটি নূতন নাম বাংলা নাট্যসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা— আলঙ্কারিক নাটক (হরিদাস চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—যোগা, ১২৯৭ সাল)। প্রেমের মধ্য দিয়াও মুক্তিলাভ করা যায় ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।

নবনাটক নামে একটি ভেদও কেহ কেহ অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ রামনারায়ণ তর্করত্নের একখানি নাটকের নামই ধরা হয় নবনাটক। তবে, ইহা নাটকখানির নিজ সংজ্ঞা অথবা জাতিসংজ্ঞা, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট ও আখ্যাপত্রে 'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক ন ব না ট ক।'—এইরূপ লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। নবনাটক কথাটি বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে সত্য তবে সমগ্র পঙ্‌ক্তি-টির দিকে লক্ষ্য করিলে ইহাকে জাতিসংজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না। গ্রন্থের প্রস্তাবনার দুইটি স্থল হইতেও এইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল হয়। গ্রন্থকার লিখিতেছেন,—'এই নবনাটকে দেশে নব নাটকের অভাব নাই', 'এ সমাজে একখানি নবনাটকের অভিনয় করি।' তাহা ছাড়া, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত ১২৮২ সালে প্রকাশিত 'বিদ্যাসুন্দর' নামক নাটককেও আখ্যাপত্রে নবনাটক এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। নবনাটক যে নাটকের এক স্বতন্ত্র প্রকারভেদের নাম ছিল এই নামকরণকে তাহারই স্পষ্ট প্রমাণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে নবনাটকের লক্ষণ কি—ইহার বৈশিষ্ট্য কি, সে-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'রসাবিষ্কার'[১] নামক এক অভিনব নাট্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন—'বৃন্দক'। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ প্রভৃতি পরস্পরনিরপেক্ষ এক-একটি বিষয় এই গ্রন্থের এক-একটি দৃশ্যে নাট্যাকারে চিত্রিত হইয়াছে। পরস্পর-নিরপেক্ষ বহু বিষয়ের অবতারণাই বৃন্দকের বৈশিষ্ট্য বলিয়া গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'যে নাট্যে বহু বিষয়ের প্রসঙ্গ থাকে, যাতে

১ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার 'গিরিশ-প্রতিভা' গ্রন্থে (পৃঃ ৫৭২) এই গ্রন্থকে 'রসাবিষ্কারবোধক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত 'ডমরুক' নামক রূপকখানি (Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Oriental Library, Madras—Vol. XXI, No. 12519) অনেকটা এইরূপ বলিয়া মনে হয়। ইহা দশ 'অলঙ্কারে' সম্পূর্ণ। সূত্রধার এখানে নির্বাহক নামে পরিচিত।

নানা জাতীয় কার্য এককালে প্রদর্শিত হয় এবং যার অঙ্ক-সংখ্যার নিয়ম নাই তাহাকেই বৃন্দক বলে।' (পৃঃ ২)

গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'বুদ্ধদেবচরিত'-এর নাম দিয়াছেন 'দেবনাটক।' ঔপন্যাসিক নাটক, নাট্যোপন্যাস, নাট্যলীলা প্রভৃতি আরও নানা নাম নাটকের প্রকারভেদ সূচনার জন্য বাংলায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

বাহ্য নামকরণের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া আভ্যন্তরিক বিষয়বিন্যাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের প্রস্তাবনা ও ভরতবাক্য বর্তমান বাংলা নাট্যে একরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমান যুগের সূত্রপাতে যে-সমস্ত নাট্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে প্রাচীন রীতি অনুসারে নান্দী ও প্রস্তাবনা ব্যবহৃত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সকল স্থলে সংস্কৃত রীতি সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় নাই। হরচন্দ্র ঘোষ কৃত 'কৌরববিয়োগ' নাটকের নান্দী গদ্যে বিরচিত। অথচ গদ্যে নান্দী রচনার প্রথা সংস্কৃতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরবর্তী কালে কোন কোন গ্রন্থে প্রস্তাবনা এই নাম দেখিতে পাওয়া যায় বটে, তবে তাহার সহিত সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনার কোনও সম্বন্ধ নাই। অবশ্য সকলে এই প্রসঙ্গে প্রস্তাবনা এই নাম ব্যবহারও করেন নাই। অমৃতলাল বসু তাঁহার নাটকের প্রারম্ভিক দৃশ্যের বিবিধ নামকরণ করিয়াছেন। পূর্বরূপ, সূচনা, পূর্বদৃশ্য প্রভৃতি নানারূপ নাম তাঁহার নানা গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত 'মনীষা' নামক নাটকে এইরূপ স্থলে 'উদ্বোধন' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

সংস্কৃত নাটকে নটী ও সূত্রধারের যে কার্য নির্দিষ্ট হইয়াছে বাংলা নাটকে তাহা হইতে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। বাংলা নাটকে অনেক সময় সূত্রধারকে নাট্যবস্তুর ব্যাখ্যাতার কার্য করিতে হয়।[১] বর্তমান যুগের প্রথম সময়ের বাংলা নাটকের বিবরণ দিতে গিয়া কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছিলেন—'অভিনয়ের প্রথমে নট-নটী (সূত্রধার নহে) নৃত্য-গীতের দ্বারা দর্শকদিগের পরিতৃপ্ত করিয়া পাত্রপরিচয় করাইয়া দেয়। অভিনেয়

১ প্রাচীন আসামী নাটকেও সূত্রধারের এইরূপ কার্য ছিল। শঙ্করদেবের 'পারিজাত-হরণ' নাটকে সূত্রধার সকল সময় রঙ্গস্থলে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন।

নাটকের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করিয়া কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিবে তাহারা তাহারও বিবরণ প্রদান করে।'[১]

রামনারায়ণের নবনাটকে নটী ও সূত্রধার নাটকের অবসানে রঙ্গভূমিতে আসিয়া প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। অমৃতলাল বসুর প্রহসন 'বৌমা'তে অভিনেত্রীগণ দ্বারা নাটকের উপসংহারে এইরূপ কার্য করান হইয়াছে।

সংস্কৃতের ন্যায় বাংলা নাটকেও পরিচ্ছেদবিভাগ সাধারণতঃ 'অঙ্ক' এই প্রাচীন নামেই নির্দিষ্ট হইয়াছে।[২] তবে কোথাও কোথাও অন্য নামও ব্যবহার করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহর্ষ প্রণীত সংস্কৃত রত্নাবলীর অনুবাদ হইলেও রামনারায়ণ তাঁহার 'রত্নাবলী' নাটকে অঙ্কের পরিবর্তে 'প্রকরণ' এই নূতন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার 'মালতীমাধবে' অঙ্কের নাম দিয়াছেন 'কাণ্ড'। বর্ধমানাধীশ্বর মহারাজ বাহাদুরের আদেশানুসারে বিরচিত বর্ধমান হইতে শকাব্দা ১৭৯৬-তে প্রকাশিত 'কাপালিক' নাটকে অঙ্কের নাম 'প্রকরণ'।

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে অঙ্কের কোন উপবিভাগ করা হয় নাই। 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (১৮৫৩) প্রভৃতি প্রথম যুগের বাংলা নাটকেও উপবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। কালক্রমে ইউরোপীয় আদর্শে এই উপবিভাগ বাংলায় প্রবর্তিত হয়। এই উপবিভাগের নামকরণ সম্বন্ধে কিন্তু একটু অসুবিধা হইয়াছিল—তাহার কারণ সংস্কৃতে এ জাতীয় বিভাগ ও তৎসূচক শব্দের অভাব। তাই এক-এক জনে এক-এক নাম ব্যবহার করিয়াছেন। তারাচরণ সিকদার তাঁহার 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকে (১৮৫২) 'সংযোগস্থল' এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন। শেক্স্‌পীয়রের Merchant of Venice-এর বঙ্গানুবাদ 'ভানুমতীচিত্তবিলাস' (১৮৫৩) ও 'কৌরববিয়োগ' নাটকে হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ইহার নাম দিয়াছেন 'অঙ্গ'। তিনি তাঁহার 'রজতগিরিনন্দিনী'তে সংস্কৃত নাটকে অন্য প্রসঙ্গে ব্যবহৃত 'গর্ভাঙ্ক' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন

১ *Calcutta Review*, 1873, Vol. 57, পৃঃ ২৪৮।

২ কোন কোন গ্রন্থে অঙ্কবিভাগ নাই। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রমণী নাটক' (সন ১২৫৪ সাল—শকাব্দাঃ ১৭৬৯, ইং ১৮৪৮ সাল) নাটক নামে অভিহিত হইলেও ইহা অঙ্ক বা কোনরূপ পরিচ্ছেদে বিভক্ত হয় নাই।

'সিংহ তাঁহার 'সাবিত্রীসত্যবান্' ও 'মালতীমাধব' নাটকে ইহাকে 'অঙ্ক' আখ্যা দিয়াছেন। আর যাহা সংস্কৃত-সাহিত্যে চিরদিন অঙ্ক নামে প্রসিদ্ধ তাহাকে তিনি 'কাণ্ড' নামে অভিহিত করিয়াছেন।[১] কোন কোন স্থলে নাটকের শেষ দৃশ্য ক্রোড়াঙ্ক বা উজ্জ্বল দৃশ্য নামে অভিহিত হয় এবং তাহার পূর্বে পটপরিবর্তন এই নির্দেশ দেখা যায়। রামনারায়ণ তর্করত্নের নবনাটকের তৃতীয়াঙ্কে এই উপবিভাগ বুঝাইতে প্রস্তাব শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকে (১৮৫৮?) ইহার নাম প্রস্তাবনা।[২] বর্তমানে এই বিভাগনির্দেশের জন্য সাধারণতঃ দুইটি নাম ব্যবহৃত হয়—(১) দৃশ্য, (২) গর্ভাঙ্ক। দৃশ্য কথাটি ইংরেজী scene-এরই অনুবাদ। গর্ভাঙ্ক শব্দটি সংস্কৃত বটে—তবে ইহা সংস্কৃতে 'নাটকান্তর্গত নাটক' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, দৃশ্য অর্থে নহে।[৩]

আশ্চর্যের বিষয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ও দৃশ্য অর্থে গর্ভাঙ্ক শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন ('মালতীমাধব', 'রুক্মিণীহরণ' ও 'নবনাটকে'র প্রথম এবং চতুর্থ অঙ্ক দ্রষ্টব্য)।[৪]

ভারতীয় নাট্যরহস্য (কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১২৮৪) নামক 'সংস্কৃত সঙ্গীত ও অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী নাট্যপ্রকরণ' গ্রন্থে (পৃ. ৫) গ্রন্থকার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ও গর্ভাঙ্ক শব্দ এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৮, পৃ. ৩৬, পাদটীকা।

২ ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের এক খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে। এই সংস্করণ ঈশ্বরচন্দ্র বসু এণ্ড কোং কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশকের নিবেদন হইতে জানা যায় যে সাত বৎসর পূর্বে কোনও বিশিষ্ট ভদ্রলোক কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে এই গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁহাদের ব্যবহারার্থ ইহার একশত খণ্ড মাত্র মুদ্রিত করান। বোধ হয় এই গ্রন্থই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (সুশীলকুমার দে—সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৮শ খণ্ড, পৃ. ৪১)।

৩ সংস্কৃতেও গর্ভাঙ্ক শব্দটি কেবল বিশ্বনাথই ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 'উত্তরচরিতে' সপ্তম অঙ্কে রাম প্রভৃতির সম্মুখে রামচরিতবিষয়ক যে নূতন নাটকের অভিনয় দেখান হইয়াছে টীকাকারদের মতে তাহার নাম গর্ভাঙ্ক নহে, অন্তর্নাট্য বা অন্তর্নাটক।

৪ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় লিখিয়াছেন—'...গর্ভাঙ্কগুলি ইংরেজী নাটকের Act ও Scene-এর অনুকরণে অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত নহে, বরং এক-একটি অঙ্ক শেষ হইলে এক-একটি গর্ভাঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকে গর্ভাঙ্ক বিরল হইলেও সংস্কৃত গর্ভাঙ্ক শব্দের ইহাই বোধ হয় তাৎপর্য।' (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৮শ ভাগ, পৃ. ৩৬)। এরূপ উক্তির ভিত্তি কি বুঝা যায় না।

গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের গ্রন্থাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা এই দুইটি শব্দের ব্যবহারে কিছু পার্থক্য করিয়াছেন। নাটক নামে অভিহিত গ্রন্থেই সাধারণতঃ গর্ভাঙ্ক শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রহসনাদি স্থলে দৃশ্য শব্দটি দেখা যায়।[১]

আজকাল বাংলা নাটকে যবনিকাপতন এই শব্দটির বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি অঙ্কের শেষেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত নাটকে এইরূপ প্রয়োগ আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনকার সিনের বদলে তখন একটি পর্দামাত্র ব্যবহৃত হইত। পর্দা ঠেলিয়া সত্বর প্রবেশ করিলে বলা হইত 'অপটীক্ষেপে প্রবেশ।' প্রথম যুগের বাংলা নাটকে অনেক স্থলে বর্তমান কালের যবনিকা পতনের অর্থে—পটক্ষেপ শব্দটির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ধমানাধিপতি আফ্‌তাব চন্দ্র মহতাব্‌ বাহাদুরের আদেশানুসারে অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি কর্তৃক প্রণীত শকাব্দা ১৭০৪ (?), বঙ্গাব্দ ১২৮৯ তে বর্ধমান অধিরাজ যন্ত্রে মুদ্রিত 'সতী-বিয়োগ' নাটকের প্রথমে আছে অপটীক্ষেপ; প্রতি অঙ্কের শেষে পটক্ষেপ এইরূপ নির্দেশ রহিয়াছে। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত 'কাপালিক নাটকে'ও প্রতি প্রকরণের শেষে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

১ এই নিয়মের ব্যতিক্রমের মধ্যে অমৃতলালের প্রহসন 'কৃপণের ধন' এবং গিরিশচন্দ্র কর্তৃক অনূদিত শেক্‌স্‌পীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটক উল্লেখযোগ্য। কৃপণের ধনে গর্ভাঙ্ক এবং ম্যাক্‌বেথে দৃশ্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সংস্কৃত-সাহিত্য এক বিচিত্র স্থান অধিকার করিয়া আছে। সকল দিক দিয়া ইহা সমৃদ্ধ—দেশেবিদেশে ইহার বিপুল সমাদর। বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ফলেও দীর্ঘকাল ইহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সাধারণ লোকের মনোরঞ্জনের জন্য হাল্কা ধরনের পুস্তক প্রাদেশিক ভাষায় রচিত হইত, আর গুরুগম্ভীর বিষয় লইয়া পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষায় বই লিখিতেন। প্রাদেশিক সাহিত্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তৃপ্তি বিধান করিতে পারিত না—তাহাদের সঙ্গে ইহার বিশেষ কোন সম্পর্কই ছিল না। আজও প্রাচীন প্রাদেশিক সাহিত্য মুখ্যতঃ ঐতিহাসিকের ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিতেছে—সাহিত্য-রসিকের রসপিপাসা ইহার দ্বারা তেমন শান্ত হইতেছে না। বর্তমানে প্রাদেশিক সাহিত্যের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। ইহা দেশের লোককে যুগপৎ আনন্দ ও জ্ঞান দান কবিতেছে। এ জন্য সংস্কৃতের দ্বারস্থ হইবার তেমন কোন প্রয়োজন এখন আব নাই। তাই অধুনারচিত সংস্কৃত গ্রন্থের কোন চাহিদা নাই—ইহার চলতি বাজার-মূল্য কিছু নাই।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সংস্কৃত রচনাব ধারা এখনও লুপ্ত হয় নাই—এখনও ভাবতেব বিভিন্ন প্রান্তে নানা বিষয়ে অজস্র সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইতেছে। ইহাদের পাঠক-সংখ্যা নগণ্য—সংস্কৃত-রসিক সমাজেও এই সাহিত্যের তেমন কোন আদব নাই—ইহার বিশেষ খোঁজ-খবর সংস্কৃত পণ্ডিতেরাও রাখেন না। আমরা প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যের গৌরব করি—প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য লইয়াই আলোচনা করি—আধুনিক সাহিত্যের পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হই না। ফলে এই সাহিত্যের কোন বিবরণ এখনও সংকলিত হয় নাই। বস্তুতঃ, ইহার পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করাই দুঃসাধ্য। যে সমস্ত বই মুদ্রিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকেরই সন্ধান পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ এগুলির সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা করা হয় না। লাইব্রেরীতে প্রাচীন পুস্তকই সংগৃহীত হয়। যে সকল পুস্তক মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ করে নাই—তাহাদের মধ্যে যেগুলি পুথিশালায় সংরক্ষিত হইয়াছে

তাহাদেরও অতি সামান্য অংশের পরিচয় এখন পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। বাকী অংশের পরিচয় কত দিনে পাওয়া যাইবে বলা যায় না।

অতি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এই সব গ্রন্থের প্রচার সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ গ্রন্থকারের ঘনিষ্ঠ পরিচিত মহলের বাহিরে এই জাতীয় গ্রন্থের সংবাদ পর্যন্ত পৌঁছে না—গ্রন্থকার যাঁহাদিগকে পুস্তক উপহার দেন তাঁহারাও সকলে ইহা পড়িয়া দেখেন না। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এক গ্রন্থকার তাঁহার রচিত মুগ্ধবোধের টীকার নকল নেওয়ার জন্য পাঁচ টাকা করিয়া পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল—এই ভাবেও তাঁহার গ্রন্থ কিছু আলোচিত ও প্রচারিত হইবে। গ্রন্থলেখকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা মর্মবিদারক আর কি হইতে পারে? সংস্কৃত গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ বিভিন্ন সংস্কৃত পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছে—বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আধুনিক লেখকদিগকে পুরস্কৃত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ কোন চেষ্টাই আশানুরূপ সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ, অকথিত ভাষায় রচিত সাহিত্যের পক্ষে যথোচিত উৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব নহে—ইহা যথেষ্ট বিস্ময় ও ততোধিক কৌতুক সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু অন্তর স্পর্শ করিতে পারে না। তবে মরা হাতী লাখ টাকা। তাহাকে একেবারে উপেক্ষা করা উচিত নয়। তাই এই প্রবন্ধে আমি তাহার যথাসম্ভব পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিব। আমি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের কথা বলিব এবং প্রধানতঃ বাংলা দেশের কথাই আলোচনা করিব।

আধুনিক সংস্কৃত-সাহিত্যের বৈচিত্র্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত। কেবল বেদ ধর্মশাস্ত্র দর্শন কাব্য প্রভৃতি প্রাচীন বিষয় লইয়াই ইহার কারবার নহে—আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ইহার বিচিত্র বিলাস দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাহিত্যের মধ্যে মৌলিকতার নির্দশন দুর্লভ—চর্বিতচর্বণ, পরানুকরণ বা অনুবাদই এই সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন গ্রন্থের টীকাটিপ্পনী ও সার সংকলন, দেশ-বিদেশের নূতন ও পুরাতন গ্রন্থের অনুবাদ বা তাৎপর্য অবলম্বন করিয়া এবং অনুকরণ করিয়া লেখা পুস্তক-পুস্তিকা লইয়া এই সাহিত্য গঠিত। প্রথম পর্যায় অপেক্ষা দ্বিতীয় পর্যায়ের পুস্তকগুলিই অধিকতর কৌতুককর, অথচ এগুলি মোটেই পরিচিত নয়।

প্রাচীন ধরনের গ্রন্থের মধ্যে এখানে বিশিষ্ট দুই-চারিখানির নাম উল্লেখ করিতেছি। স্মৃতিশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

মহাশয়ের স্মৃতিচন্দ্রালোক বাংলার পণ্ডিত-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার কয়েক খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে রঘুনন্দনাদি নিবন্ধকার-গণের মত উদ্ধৃত, আলোচিত এবং দরকার মত খণ্ডিত হইয়াছে। কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্নের উদ্ধারচন্দ্রিকা এবং উড়িষ্যার সদাশিব মিশ্রের কল্যাপদ্ধর্মসর্বস্ব বর্তমানে বিশেষ কৌতুকজনক বলিয়া মনে হইবে। পঁচিশ ত্রিশ বছর পূর্বেও যাঁহারা সমুদ্রপথে বিদেশ যাত্রা করিতেন তাঁহাদিগকে সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। ধর্মশাস্ত্রানুসারে তাঁহারাও যে সমাজে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবেন তাহাই এই দুই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় বিশ্বেশ্বরনাথ রাও তাঁহার স্বরচিত ধর্মশাস্ত্র বিশ্বেশ্বরস্মৃতি গ্রন্থে বর্তমান প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রে অননুমোদিত আচার-ব্যবহারকেও সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে পিতৃপুরুষের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করাই শ্রাদ্ধ—ব্যভিচাব বন্ধ করিতে হইলে স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বার বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে ইত্যাদি।

খড়দহের প্রসিদ্ধ জমিদার প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের সহায়তায় রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার প্রাণতোষিণী নামে যে বিশাল তান্ত্রিক নিবন্ধ-গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছিলেন তাহা এখনও তান্ত্রিকসমাজে সুপরিচিত। ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই জাতীয় আরও কিছু কিছু গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায়।

এই যুগে কাব্য ও নাটক লিখিয়া অনেকে পণ্ডিত-সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে শান্তিপুরের রামনাথ তর্করত্ন, নবদ্বীপের অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, ভাটপাড়ার পঞ্চানন তর্করত্ন, পাবনার অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় কবিভূষণ, কোটালিপাড়ার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্যেব নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার বাহিরের কবিদের মধ্যে শ্রীমতী ক্ষমা রাওয়ের লেখা একাধিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার লেখার বিষয়বস্তু আধুনিক।

ব্যাকরণে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাবানাথ তর্কবাচস্পতির আশুবোধ ব্যাকরণ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ-কৌমুদী দুরূহ ব্যাকরণকে সাধারণের নিকট সুগম করিবাব উদ্দেশ্যে রচিত। বাংলা ও সংস্কৃতে লিখিত ব্যাকরণ-কৌমুদীর আদর আজও অব্যাহত রহিয়াছে। ছন্দঃশাস্ত্রে বৃত্তরত্নাবলী নামক গ্রন্থে চিরঞ্জীব ভাষাছন্দকেও সংস্কৃতে প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অভিধানে আধুনিক বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতির অবতারণা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। এ বিষয়ে অগ্রণী বোধ হয় ১৮১১ সালে প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয়ের সহযোগিতায় রঘুমণি বিদ্যাভূষণ মহাশয় রচিত শব্দাম্বুধি। রঘুমণি আরও একখানি অভিধান সংকলন করেন। ইহার নাম শব্দমুক্তামহার্ণব। ইহাই উইলসন্ প্রণীত সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধানের মূল। এই প্রসঙ্গে রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম (১৮২২—১৮৫৮) ও তারানাথ তর্কবাচস্পতির বাচস্পত্য (১৮৭৩—১৮৮৪) উল্লেখযোগ্য। শব্দকল্পদ্রুম সংস্কৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই পরম আদরের বস্তু।

বেদ পুরাণ তন্ত্রাদি প্রাচীন ভারতীয় বিষয়বস্তু ছাড়া নূতন এবং অভারতীয় বিষয়বস্তু লইয়া কয়েক শত বৎসর পূর্ব হইতেই সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়। এই সব গ্রন্থের মধ্যে পারসীক ধর্মগ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ প্রাচীনতম। ইহা ছাড়া, সংস্কৃতে লেখা তেলেগু, ফারসী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ এবং বিভিন্ন ভাষা-গ্রন্থের টীকা এক বিচিত্র জিনিস। সংস্কৃতের সাহায্য ছাড়া কোন বিষয়ই যথোচিত গৌরব ও মর্যাদা লাভ করিতে পারে না—এই ধারণাই সংস্কৃত-সাহিত্যে এই সমস্ত বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রধান কারণ। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে খ্রীষ্টান পাদ্রিগণ বাইবেলের অনুবাদ রচনায় প্রবৃত্ত হন। বিভিন্ন সময়ে এই অনুবাদের বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁহার শিষ্যদের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া সংস্কৃত পুরাণের ধরনে একাধিক স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্টসঙ্গীতা, শ্রীযীশুখ্রীষ্টমাহাত্ম্য, শ্রীপৌলচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। এই সকল গ্রন্থ রচনায় মুইর সাহেবের যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল। ইহা ছাড়া ব্যালেণ্টাইন্ খ্রীষ্টধর্মরহস্য বিবৃত করিয়া খ্রীষ্টকৌমুদী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে অন্য নিরপেক্ষ ভাবে দেশীয় লোকের লেখা বইও পাওয়া যায়। কিছু দিন পূর্বে তারাচরণ চক্রবর্তীর খ্রীষ্টোপনিষৎ প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্কৃতের মাধ্যমে বিভিন্ন আধুনিক বিষয় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংস্কৃত ভাষায় বিবিধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম বোধ হয় ১৮৩৭ সালে প্রকাশিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ইংলণ্ডের ইতিহাস নৃত্নোদন্তোৎস। ঐ সালেই প্রকাশিত ক্ষেত্রতত্ত্ব-দীপিকা হাটনের জ্যামিতির সংস্কৃত অনুবাদ। বিট্ঠল শাস্ত্রীর বেকনীয়-

সূত্রব্যাখ্যান প্রসিদ্ধ দার্শনিক বেকনের গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। ব্যালেণ্টাইনের ন্যায়কৌমুদী আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের সার সংকলন। কথিত আছে, রাধানাথ শিকদার ডক্টর টাইটলারের সহযোগিতায় কতকগুলি ইংরাজি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের কোনও বিবরণ জানিতে পারা যায় নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত এই জাতীয় আরও কয়েকখানি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষশারীর ও সিদ্ধান্তনিদানের রচয়িতা প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার গণনাথ সেন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের কতকগুলি মূলতত্ত্ব ইহাদের মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। আয়ুর্বেদের ছাত্রগণকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সহিত পরিচিত করাই গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য। টোলের ছাত্রগণকে গণিত, ইতিহাস, ভূগোলের গোড়ার কথাগুলি বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ আরও কতকগুলি গ্রন্থ সম্প্রতি সংকলিত হইয়াছে। ১৮৭১-৭৩ সালে চার খণ্ডে প্রকাশিত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ লিখিত ভারতবর্ষের পদ্যময় ইতিহাস গ্রন্থ লঘুভারত ও ১৯১৩ সালে লাইপ্‌সিগে মুদ্রিত দশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত রাজা শ্যামাকুমার ঠাকুরের জার্মণিকাব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত ভাষাকে সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করিবার সুবিধার জন্য ও সংস্কৃত ভাষার সম্যক্ অনুশীলনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতরচনার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। গৌরববোধ, কৌতূহল এবং সংস্কৃতকে সকল দিক দিয়া সমৃদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা অনেককে সংস্কৃত রচনায় অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে। দেশ-বিদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে পরস্পর হাত মিলাইয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গিলক্রাইষ্ট ফোর্ট উইলিঅম কলেজের ছাত্রদের জন্য ঈশপের গল্প ও এই জাতীয় অন্যান্য গল্পের সংস্কৃত ও বিভিন্ন দেশী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ফোর্ট উইলিঅম কলেজে ঐ সময়ে সংস্কৃত ভাষায় বিতর্কসভার আয়োজন করা হইত। এইরূপ এক সভার মিঃ গোয়ান সংস্কৃত ভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং প্রাচ্য ভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ কেরি সাহেব সংস্কৃত ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। প্রবন্ধ ও বক্তৃতা দুইটিই ছাপা হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ক্যাপেলার সাহেব জার্মাণ ও গ্রীক কবিদের অনেকগুলি কবিতার স্বকৃত সংস্কৃত অনুবাদ সুভাষিতমালিকা ও যবনশতক

নামে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের এই জাতীয় রচনার মধ্যে সেক্স্‌পিয়রের নাটকের গল্পের, তামিল কম্পরামায়ণের, রবীন্দ্রনাথের কবিতার, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার সংস্কৃত অনুবাদ এবং আমাদের দেশের মহাপুরুষদের জীবনবৃত্ত লইয়া রচিত শিখগুরুচরিতামৃত, দয়ানন্দচরিত, তুকারাম-চরিত, সত্যাগ্রহগীতা এবং গান্ধিসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রান্তের লেখকেরা এই সব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

আধুনিক ধরনের সংস্কৃত পত্রিকা প্রকাশ আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারবৃদ্ধি ও সংস্কৃতকে দেশ-প্রচলিত ভাষা হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য লইয়া প্রায় এক শত বৎসর ধরিয়া ভারতের নানা প্রান্তে নানা সময়ে বহু পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। পত্রিকাগুলির অধিকাংশই স্বল্পায়ু—বেশীর ভাগই ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় প্রকাশিত। ইহাদের মূল্য যাহাই হউক না কেন, দেশের পত্রিকার ইতিহাসে ইহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। আমি এখানে কতকগুলি পত্রিকার নাম করিব। প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় পত্রিকার মধ্যে প্রত্নকম্রনন্দিনী, উষা, পণ্ডিত ও কাব্যমালার নাম করা যাইতে পারে। পাঁচমিশালি বিষয় লইয়া গঠিত পত্রিকার মধ্যে লাহোর হইতে ১৮৭১ সালে বাঙালি পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশিত বিদ্যোদয় খুব প্রাচীন। ইহা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর চলিয়াছিল। সংস্কৃতে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা বোধ হয় প্রথমে হয় কাঞ্চীতে। এখান হইতে ১৮৯৯ সালে মঞ্জুভাষিণী প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এই জাতীয় দুইখানি পত্রিকা প্রচলিত আছে। একখানি নাগপুরের সংস্কৃত ভবিতব্য আর একখানি অযোধ্যার সংস্কৃত সাকেত। আগাগোড়া কবিতায় পরিপূর্ণ সংস্কৃত পদ্যগোষ্ঠীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা একটি কৌতুককর বস্তু। ১৯২৬ সালে ইহা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে বিজ্ঞাপনাদি সমস্ত বিষয়ই কবিতায় প্রকাশিত হইত। বিভিন্ন স্থান হইতে অন্য যে সমস্ত পত্রিকা পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে বা এখনও হইতেছে, তাহাদের সকলের পূর্ণ পরিচয় সংকলন করা দুঃসাধ্য। যাঁহাদের নাম জানা যায় তাঁহাদের বিবরণ দেওয়ার স্থানও এখানে নাই।

সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা

বাংলা সাহিত্যে অগণিত মুসলমান কবির দান ও একাধিক মুসলমান নরপতির আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রেরণার উদাহরণ প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যসেবী মাত্রের নিকট সুপরিচিত। এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মুসলমানগণের উৎসাহ ও সাহায্যে পরিপুষ্ট বাংলা সাহিত্য কেবলমাত্র মুসলমান সংস্কৃতির প্রচাবে ব্যাপৃত হয় নাই, পক্ষান্তরে প্রধানতঃ ইহা হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুকূল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। হিন্দুব পুরাণাদির অনুবাদ ও হিন্দুর সম্প্রদায়বিশেষের উপাখ্যান এই সাহিত্যেব বহুল অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

পবকীয় সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি মুসলমানগণের এই অনুরাগ কেবল প্রাদেশিক সাহিত্যেব মধ্য দিয়াই অভিব্যক্ত হইয়াছে এমন নহে—সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও ইহাব প্রচুব নিদর্শন রহিয়াছে। আকবর প্রভৃতি নবাব-বাদশাহদের উদ্‌যোগে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত ভাষা অবলম্বনে হিন্দুব জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে একাধিক স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল—এ সকল কথা পণ্ডিতসমাজে অল্পবিস্তব সুবিদিত।[১]

১। Elliot—*History of India*, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭০-৫, J. J. Modi—*King Akbar and the Persian Translation of Sanskrit Books* (Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, ৫ম খণ্ড, ১৯২৫, পৃঃ ৮৩ ১০৭), M Z. Siddiqui—*The Services of the Muslims to the Sanskrit Literature* (Calcutta Review, ১৯৩৩, পৃঃ ২১৫-২৫), N. Law—Promotion of Learning in india durjng Muhammadan rule (by Muhummadans) পৃঃ ১৪৭—৫০, ১৮৫ প্রভৃতি। শ্রীবরকৃত রাজতরঙ্গিণীর পরিশিষ্ট হইতে জানা যায় যে, 'কাশ্মীরের আকবর' জাইনউল-আবিদিনের প্রয়োজকতায়ও এইরূপ বহু গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল। শ্রীবর লিখিয়াছেন,—

দশাবতারপৃথ্বীশ-গ্রন্থরাজ-তরঙ্গিণীঃ।
সংস্কৃতাঃ পারসীবাচা বাচকাৰ্হান্বকারয়ৎ॥
ম্লেচ্ছৈর্বৃহৎকথাসারং হাটকেশ্বরসংহিতা।
পুরাণাদি চ তদ্‌যুক্ত্যা বাচ্যতে নিজভাষয়া॥ (শ্রীবরকৃত রাজতরঙ্গিণী—১।৫।৮৫-৬)

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্ দিয়া এই সকল গ্রন্থের মূল্য উপেক্ষণীয় নহে। অনূদিত ও আলোচিত গ্রন্থের মধ্যে এমন কতকগুলি আছে, যেগুলির সংস্কৃত মূল বর্তমানে অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। সুতরাং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই সকল ফারসী গ্রন্থের আলোচনা করিলে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে অনেক মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে এবং মুসলমানগণের সংস্কৃতাভিজ্ঞতার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দিকে তেমন কোনও আলোচনাই এ পর্যন্ত হয় নাই।

উল্লিখিত অনুবাদাদি গ্রন্থ প্রণয়ন ছাড়া মুসলমানগণ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারকল্পে বহু উল্লেখযোগ্য কার্য করিয়াছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণকে বৃত্তি ও উপাধি দান করিয়া অনেক মুসলমান রাজা তাঁহাদিগকে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করিয়াছেন—কেহ কেহ প্রত্যক্ষ নির্দেশসহকারে গ্রন্থবিশেষ রচনা করাইয়াছেন। প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে যে সকল বৃত্তান্ত আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা দরকার যে, কেবলমাত্র মুসলমান সংস্কৃতি বা সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ অতীব বিরল[২]। বস্তুতঃ,

২। মুসলমান নরপতির আদেশে বা সন্তোষ বিধানার্থ রচিত একখানি ফারসী গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদের কথা উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীররাজ মহম্মদ শাহের সন্তোষার্থ শ্রীবর পণ্ডিত প্রসিদ্ধ ফারসী কবি জামিবিরচিত যুসুফ জোলেখার প্রখ্যাত কাহিনী অবলম্বন করিয়া কথাকৌতুক নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও জর্জ বূলার ইহার দুইখানি পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন (Notices of Sans. Mss. ৮।২৫৮৫; Detailed Rept. of a tour of search of Sans, Mss. Kashmir, Rajputana and Central Ind, পৃঃ ৬১)। 'কাব্যমালা'য় ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পুনার Oriental Book Agencyর ক্যাটালগ (১৯৩০। নং ৯৯১) হইতে জানা যায়, Schmidt সাহেবের সম্পাদকতায় ইহার এক ইউরোপীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল—কিন্তু উহা আমি দেখি নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে কাশ্মীরের হিন্দু রাজা রণবীরসিংহের আদেশে সাহিবরাম কর্তৃক এইরূপ আর একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহার নাম বীররত্নশেখরশিখা। ইহা আখলাক-ই-মোহ্সিনী গ্রন্থের অনুবাদ। ইহার পুথির বিবরণ রঘুনাথ টেম্পল লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুথির ষ্টাইনকৃত ক্যাটালগে প্রদত্ত হইয়াছে।

ইরাণীদিগের আবেস্তা ও খ্রীষ্টানদিগের বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদের মত[৩] কোরাণ শরীফের কোনও সংস্কৃত অনুবাদ প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। তাই মনে হয়, সংস্কৃত পণ্ডিতগণের প্রতি আনুকূল্য ও উৎসাহ-প্রদর্শন মুসলমান নরপতিগণের পাণ্ডিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যানুরাগের নিদর্শন। কলাবিজ্ঞান, অভিধান, কাব্য প্রভৃতি সাধারণের রুচিকর বিষয়েই তাঁহাদের অনুরাগ বেশি ছিল বলিয়া মনে হয়।

যে সকল ভারতীয় মুসলমান নরপতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গকে অভিনন্দিত ও উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাংলার জালালুদ্দীনই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। সদ্যঃ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত জালাল এ বিষয়ে পিতা রাজা গণেশের অনুসৃত রীতিরই অনুবর্তন করিয়াছেন। তিনি বৃহস্পতি নামক বিবিধ গ্রন্থরচয়িতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে ছয়টী উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রায়মুকুট উপাধি প্রদানের সময় একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁহাকে হাতীর উপর আরোহণ করান হইয়াছিল এবং হার, মুক্তাখচিত কুণ্ডল প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার ও বহু অশ্ব তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল।[৪] প্রয়াগের নিকটবর্তী কড়ার মালিক সলতাসাহি সঙ্গীতশাস্ত্রের বহু পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন—ভূমি স্বর্ণ বস্ত্র প্রভৃতি দান করিয়া নানা স্থান হইতে পণ্ডিত আনাইয়াছিলেন এবং তাহাদের দ্বারা ১৪২৮ সালে সঙ্গীত-শিরোমণি নামে এক গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন।

হুমায়ুনের সমসময়ের দিল্লীর অধিপতি সলেম সাহ সারস্বতপ্রক্রিয়া নামক

৩। এ সম্বন্ধে Journal of the Asiatic Society of Bengal নামক পত্রিকায় (১৯২৮।৪৬৫—৬) প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ ভারতীয় পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে কেবল বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পক্ষান্তরে হিন্দু পুরাণের অনুকরণে একাধিক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৪। জ্যোতিশ্মমণিপুঞ্জরঞ্জনরুচিং হারং স্ফুরৎকুণ্ডলে রত্নৌঘচ্ছুরিতা দশাঙ্গুলিজুষঃ শোচিষ্মতীরূর্মিকাঃ। যঃ প্রাপ্য দ্বিরদোপবিষ্টসকলস্নানৈরবিন্দন্ পাচ্ছত্রে তৈস্তুরগৈশ্চ রায়মুকুটাভিখ্যামভিখ্যাবতীম্। Descriptive Cat. Sans. Mss. Ind. Office Library.—২,৯৫৪-৫।

ব্যাকরণ গ্রন্থের টীকাকার চন্দ্রকীর্তির সমাদর ও সম্মান করিতেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

উৎসাহদাতাদের মধ্যে প্রখ্যাতনামা আকবরই বোধ হয় সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহারই নির্দেশক্রমে বিট্‌ঠল নামক পণ্ডিত 'নর্তননির্ণয়' নামক নৃত্যবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[৬] সুলতান বুরহান খাঁর নির্দেশানুসারে এই বিট্‌ঠলই বোধ হয়, সঙ্গীত সম্বন্ধে ষড়্‌রাগচন্দ্রোদয়[৭] নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত পণ্ডিতগণের পারসী ভাষা শিক্ষার সৌকর্যসাধনার্থে আকবর সংস্কৃত-ভাষায় একখানি পারসী ভাষার ব্যাকরণ লিখাইবার ব্যবস্থা করেন। এই গ্রন্থখানির নাম পারসীপ্রকাশ, রচয়িতা কৃষ্ণদাস। ইহার সূত্রসংখ্যা ৪৮১।

৫। শ্রীমৎসাহিসলেমভূমিপতিনা সম্মানিতঃ সাদরম্।
সূরিঃ সর্বকলান্বিকাকলিতধীঃ শ্রীচন্দ্রকীর্তিঃ প্রভুঃ।

Belvalkar—Systems of Sans. Grammar. পৃঃ ৯৮, পাদটীকা ২। সারস্বত ব্যাকরণের টীকাদিরচয়িতা আরও দুই একজনের গ্রন্থে মুসলমান নরপতিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সারস্বতপ্রক্রিয়ার টীকাকার পুঞ্জরাজ মালবের গিয়াসুউদ্দীন খিলজীর মন্ত্রী ছিলেন। তর্কতিলক ভট্টাচার্য জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সারস্বতসূত্রের এক টীকা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন—ঐ টীকা হইতেই এরূপ কথা জানিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ এই সকল নামের উল্লেখ দৃষ্টে শ্রীযুক্ত শ্রীধর বেলবেলকর অনুমান করিয়াছেন যে, এই সকল মুসলমান নরপতি স্বল্পায়াসগ্রাহ্য সারস্বত ব্যাকরণের অনুশীলনে উৎসাহ দিয়াছিলেন (Systems etc. পৃঃ ৯৩)। কিন্তু এই নামমাত্রের উল্লেখ হইতে এতটা অনুমান করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা বিবেচ্য। বস্তুতঃ, স্পষ্ট ইঙ্গিত না থাকিলে কেবল নামমাত্রের উল্লেখ হইতে আলোচ্য প্রবন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই। ফলে, টোডরমল সংকলিত টোডরানন্দ ও ভুবনানন্দ সংকলিত বিশ্বপ্রদীপ গ্রন্থে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে আকবর ও শেরসাহের উল্লেখ থাকিলেও এবং এই দুই গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহাদের উৎসাহদানের কথা মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি (বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথির বিবরণ—৩। ভূমিকা পৃঃ ২৫) কেহ কেহ অনুমান করিলেও স্পষ্ট নির্দেশের অভাবে এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য, এইরূপ অনেক নরপতির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ সংস্কৃত বহু গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৬। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালায় ইহার একখানি পুথি আছে। ঐ পুথি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধনলেখমালা'র (প্রথম খণ্ড' পৃঃ ৭—১৩) ইহার এক বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

৭। এই গ্রন্থ বোম্বাই, মালাবার হিল হইতে ভালচন্দ্র সীতারাম সুকৃথঙ্কর কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহা আট অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলির নাম—সংখ্যাশব্দনির্ণয়, শব্দপ্রকরণ, কারকপ্রকরণ, সমাসপ্রকরণ, তাদ্ধতপ্রকরণ, আখ্যাতপ্রকরণ, কৃৎপ্রকরণ। এক যুগে এই গ্রন্থের আদর ছিল বলিয়া মনে হয়—ইহার অনেকগুলি পুথি পাওয়া যায়। ১৯১২ সালে Indian Antiquary পত্রে (পৃঃ ৪৪ প্রভৃতি) ভি. এম. ঘাটে মহাশয় এই গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। তৎপূর্বেই ১৮৮৮ সালে ওএবর কর্তৃক জর্মান ব্যাখ্যা সহ ইহার এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

গঙ্গাধর নামক এক ব্যক্তি আকবর সাহির নির্দেশানুসারে 'নীতিসার' নামক গ্রন্থ সংকলন করেন। এই আকবর সাহি প্রসিদ্ধ আকবরের সহিত অভিন্ন হইলেও হইতে পারেন। ইহার একখানি পুথির বিবরণ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথির বিবরণেব মধ্যে (৭।৫৫০৫) পাওয়া যায়।

একাধিক পণ্ডিত আকবরের নিকট হইতে উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 'মুহূর্তমালা' নামক জ্যোতিষগ্রন্থের রচয়িতা রঘুনাথের পিতা নৃসিংহ আকবরের নিকট হইতে স্বীয় জ্যোতির্বিদ্যার নিদর্শনস্বরূপ 'জ্যোতির্বিৎসরস' এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।[৮] মনে হয়, এই নৃসিংহ ও আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে প্রদত্ত পণ্ডিতের তালিকায় উল্লিখিত নরসিংহ[৯] একই ব্যক্তি।

কাদম্বরীনামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গদ্যকাব্যের পূর্বার্ধ ও পরার্ধের টীকারচয়িতা ভানুচন্দ্র ও সিদ্ধচন্দ্র আকবরের নিকট হইতে যথাক্রমে উপাধ্যায় ও খুস্ফহম (?) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহাদের টীকার পুষ্পিকায় উল্লিখিত হইয়াছে।[১০]

শুনা যায়, তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা নারায়ণ ভট্টকে

৮। শাহাকব্বরসার্বভৌমতিলকাদ্দিল্লীমতল্লীশ্বরাজ্জ্যোতির্বিৎসরসত্বমাপ পদবীমাসেরিদুর্গগ্রহে ॥
Desc. Cat. Sans. Mss. in the Asiatic. Soc. Bengal—তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৭৬।

৯। Indian Historical Quarterly—১৩।৩১।

১০। ভানুচন্দ্র-লিখিত অংশের পুষ্পিকা :—

পাতিশাহশ্রীঅকব্বরপ্রদাপিতোপাধ্যায়পদধারকঃ…। ভানুচন্দ্র গ্রন্থের প্রারম্ভেও আকবরদত্ত সম্মানের উল্লেখ করিয়াছেন :—

শ্রীবাচকঃ সম্প্রতি ভানুচন্দ্র অকব্বরক্ষ্মাপতিদত্তমানঃ।

সিদ্ধচন্দ্র-লিখিত অংশের পুষ্পিকা :—

শ্রীঅকব্বরপ্রদত্তখুস্ফহমাপরাভিধানমহোপাধ্যায়…।

জগদ্‌গুরু এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।[১১] আইন্-ই-আকবরীতে উল্লিখিত নারায়ণ[১২] ও এই নারায়ণকে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

টোডরানন্দ, তাজ্জিক প্রভৃতি রচয়িতা নীলকণ্ঠও ইহার প্রদত্ত সম্মানে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন।[১৩]

হরিহরাবলী, পদ্যামৃততরঙ্গিণী, সুভাষিতাবলী, সুভাষিতসারসমুচ্চয় প্রভৃতি সূক্তিগ্রন্থে অকবরীয় কালিদাস নামক এক কবির কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।[১৪] কবির এই উপাধি স্বগৃহীত কি আকবর-প্রদত্ত তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

যে সমস্ত পণ্ডিত আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের প্রসাদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তাজ্জিকরচয়িতা নীলকণ্ঠের পুত্র গোবিন্দ শর্মা,[১৫] কবিকর্ণপুর প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। কবীন্দ্রের অনুজ কামরূপবাসী করণবংশীয় কবিকর্ণপুর জাহাঙ্গীরের নির্দেশক্রমে সংস্কৃত পারসীপদপ্রকাশ নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[১৬] পারসী ভাষার একখানি ব্যাকরণও তিনি সংস্কৃত পদ্যে রচনা করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর নিজে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন কি না বলিতে পারা যায় না। তবে কাব্যালঙ্কারসূত্রের একখানি পুথিতে সেলিম নামাঙ্কিত মুদ্রা দৃষ্টে মনে হয়, তাঁহার গ্রন্থাগারে সংস্কৃত পুথিও ছিল।[১৭]

জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহানের বিদ্যোৎসাহিতাও কম ছিল না। ইহার সন্তোষবিধানের জন্য বেদাঙ্গরায় পারসীপ্রকাশ নামক জ্যোতিষবিষয়ক

১১। Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng, ৩য় খণ্ড Preface পৃঃ XXVIII.

১২। Ind. Hist. Quarterly—১৩|৩৪।

১৩। Hist. of Dharmasastra—Kane, Vol. I, পৃঃ ৪২২

১৪। Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng. ৭|৫৪৫৪, Peterson—Second Search of Sans, Mss, পৃঃ ৫৭, Bhandarkar—Rept. Search of Sans. Mss. Bomb. Presi. (1887-91) পৃঃ LX—II

১৫। Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng—৩। ৭৬৮।

১৬। শ্রীমজ্জহাঙ্গীরমহেন্দ্রভূপরসাস্থাধ (?) নিদেশরূপম্। করোত্যদঃ সংস্কৃতপারসীকপদপ্রকাশং কবিকর্ণপূরঃ। এই প্রসঙ্গে এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় (১৯২৮, পৃঃ ৪৭০) প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৭। Kavindracarya's List (Gaekwad's Oriental Series)—Foreword—P. IV.

কোষগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[১৮] ইনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী কবীন্দ্রাচার্যকে 'সর্ববিদ্যানিধান' এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। বারাণসী ও প্রয়াগে তীর্থ-যাত্রীদের নিকট হইতে কর আদায়ের যে প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদকল্পে কবীন্দ্রাচার্য বহুজন সমভিব্যাহারে সাজাহানের দরবারে উপস্থিত হইলে এই উপাধি প্রদত্ত হয়।[১৯] কথিত আছে যে, পরশুরাম মিশ্র নামক প্রবীণ পণ্ডিতকে সাজাহান 'বাণীবিলাস রায়' উপাধি প্রদান করেন।[২০] সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ইঁহারই সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—এই 'দিল্লীবল্লভেরই' 'পাণিপল্লবতলে' তিনি নবীন বয়স কাটাইয়াছিলেন। শাজাহানের নিকট হইতেই তিনি পণ্ডিতরাজ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

শাজাহান ও তাঁহার মন্ত্রী বাসফ খাঁর নির্দেশে নিত্যানন্দ ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধান্তসিন্ধু নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন। আলোয়ার রাজ্যের পুথিশালায় ইহার পুথি আছে।

কাশ্মীরেব জাইন-উল-আবিদিনের সংস্কৃতানুরাগের উল্লেখ ইতঃপূর্বেই করা হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থের পারসীক অনুবাদ প্রণয়ন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। সংস্কৃত পুথি সংগ্রহেও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি অর্থ ও নানা স্থান হইতে সংগৃহীত পুথি পণ্ডিতদিগকে দান করিতেন[২১]—পণ্ডিত পোষণ কবিতেন—নিজে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের পাঠ.শুনিতেন।[২২]

১৮। নত্বা শ্রীভুবনেশ্বরীং হরিহরৌ লম্বোদরাদীন্ ৻দ্বিজান্। শ্রীমচ্ছাহজহাননরেন্দ্রপরমপ্রীতি-প্রসাদাপ্তয়ে। কৃত্বা সংস্কৃতপারসীকরচনাভেদপ্রদং কৌতুকং। জ্যোতি.শাস্ত্রপদোপযোগি-সরলং বেদাঙ্গরায়ঃ সুধীঃ।

১৯। Kavindracarya's List—Foreword পৃঃ ৫।

২০। শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ—Saraswati Bhavan Studies,২য় খণ্ড, পৃঃ ১—৪।

২১। পুরাণতর্কমীমাংসাঃ পুস্তকানপরানপি। দূবাদানায্য বিত্তেন বিদ্বদ্ভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ।
(শ্রীবরকৃত রাজতরঙ্গিণী—১।৫।৭৯)
বর্ষা মরুদিব স্লাপস্তদ্‌বিদ্যাপ্রত্যয়োৎসুকঃ। অনায়য়ৎ স তান্ সর্বান্ পণ্ডিতান্ নিজমণ্ডলম্।
রাজা সংরোপিতানর্ঘবৃত্তিদানেন পণ্ডিতান্। অপ্যায়য়জ্জলেনেব মালাকারো মহীরুহান্।
জোনরাজকৃত রাজতরঙ্গিণী—১০৪৮, ১০৫০।

২২। মোক্ষোপায় ইতি খ্যাতং বাশিষ্ঠং ব্রহ্মদর্শনম্। মন্মুখাদশৃণোদ্ রাজা শ্রীমদ্‌বাল্মীকিভাষিতম্।
শ্রীবরকৃত রাজতরঙ্গিণী—১।৫।৮০।

পরবর্তী যুগের ও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত আঞ্চলিক প্রধানদের উৎসাহদানেরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

অসালতিপ্রকাশ নামক এক কোষগ্রন্থ[২৩] কাশ্মীরের অসালতি খাঁর নির্দেশক্রমে মীর-মীরা-সুত কর্তৃক বিরচিত হইয়াছিল। আবার এই মীরমীরাসুতের আদেশে বেণীদত্ত পঞ্চতত্ত্বপ্রকাশ নামক এক গ্রন্থ[২৪] রচনা করিয়াছিলেন।

পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ বারভূঁইয়ার অন্যতম ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁর (১৫৯৯—১৬২৩) আদেশে মথুরেশ শব্দরত্নাবলী নামে এক সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।[২৫]

লোদীবংশাবতংস আহম্মদ খাঁর পুত্র লাড়খাঁ নামক নরপতির মনোরঞ্জনের নিমিত্ত কল্যাণমল্ল অনঙ্গরঙ্গ নামক কামশাস্ত্রের বই লিখিয়াছিলেন।[২৬]

২৩। শ্রীশম্ভুকৌতুকরামলাকান্তপুর-
বিভ্রাজমাণগিরিজাচরণৌ প্রণম্য।
কাশ্মীরভূমিনগরে প্রকরোতি কোশং
শ্রীমানসালতিমহীবরখাননাম্না।
... ...
রাজ্ঞাসলতিখানেন গুণিনা প্রেরিতোঽস্ম্যহম্।
অসালতিপ্রকাশাখ্যং কোষং কুর্বে মহাগুণম্।
শুভশব্দসুবর্ণাঢ্যং পদানুপ্রাসসম্মণিম্।
মীরমীরাসুতঃ কোশং দত্তে গৃহ্নন্তু সদ্বুধাঃ।

Oxf. (অউফ্রেক্ট সংকলিত বোড্‌লিঅন লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ)—৪৪৪।

২৪। পঞ্চতত্ত্বপ্রকাশোঽয়ং বেণীদত্তেন ধীমতা। প্রকাশিতঃ প্রকাশার্থো মীরমীরাসুতাজ্ঞয়া।
Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc Beng. ৬। ৪৭০৯ A ; R. L. Mitra—Notices of Sans. Mss.—৬।১৪৩৭.

২৫। Desc. Cat. Sans. Mss. Ind. Office Lib.—২।১০১৬৭, Oxf. No. 439-40; R. L, Mitra—Notices Sans. Mss. ৩।১১০৫; ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪২, পৃঃ ৬০৬—১০, আশ্বিন ১৩৪৩, পৃঃ ৫৭২—৭।

২৬। লোদীবংশাবতংসো হতরিপুবনিতানেত্রবারিপ্রপূর-
প্রাদুর্ভূতাসু সিন্ধুষমিতজবতয়া লীলয়া প্লাবিতাশঃ।
সৎপুত্রঃ খ্যাতকীর্তেরহমদনৃপতেঃ কামসিদ্ধান্তবিদ্বান্
জীয়াচ্ছ্রীলাড়খানঃ ক্ষিতিপতিমুকুটৈর্ঘৃষ্টপাদারবিন্দঃ।
অস্তৈব কৌতুকনিমিত্তমনঙ্গরঙ্গগ্রন্থং বিলাসিজনবল্লভমাতনোমি।
শ্রীমান্ কবিরশেষকলাবিদগ্ধঃ কল্যাণমল্ল ইতি ভূমিমুনির্যশস্বী।
এই গ্রন্থখানি লাহোর হইতে মতিলাল বানারসীদাস কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলার সুপ্রসিদ্ধ নবাব শায়েস্তা খাঁ কেবল প্রজাদের ঐহিক সুখসমৃদ্ধির দিকেই দৃষ্টি রাখিতেন এমন নহে—দেশের সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারই পরিতৃপ্তির জন্য ১৭৮৫ শাকে চতুর্ভুজ কর্তৃক রসকল্পদ্রুম নামে একখানি সংস্কৃত সূক্তিগ্রন্থ সংকলিত হইয়াছিল।[২৭] ইহার উপক্রমাংশে শায়েস্তা খাঁর বিস্তৃত বংশপরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

মুসলমান নরপতিগণের সংস্কৃতানুরাগের আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ—স্থানবিশেষে সংস্কৃতকেই দরবারের ভাষার মর্যাদাপ্রদান। কাশ্মীরে মুসলমানদের কবরের উপর কোথাও কোথাও সংস্কৃতলিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ একটী লিপির তারিখ ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।[২৮] একজন মুসলমান শাসক স্বীয় কৃত কার্যের বিবরণ সংস্কৃতলিপিতে প্রস্তরের উপর উৎকীর্ণ করাইয়া গিয়াছেন। দিনাজপুরের অন্তর্গত ধুবাইলে এই লিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, মহম্মদ সার শাসনকালে নরবাজ খাঁর পুত্র প্রধান মন্ত্রী করাম খাঁ একটী সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন।[২৯] বাংলার নবাব সিরাজ উদ্দৌলা মাতামহ আলিবর্দি খাঁর পারলৌকিক কৃত্য উপলক্ষ্যে সংস্কৃত পত্র দ্বারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।[৩০]

মুসলমানরচিত সংস্কৃতগ্রন্থাদির বিষয় বেশি কিছু জানা যায় না। তবে বঙ্গের সপ্তগ্রাম-বিজেতা জরাফ খাঁ ওরফে দরাফ খাঁর রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ একটী গঙ্গাস্তোত্র বাংলাদেশে প্রচলিত আছে।[৩১] প্রসিদ্ধ কবি আবদুর

২৭। তস্যানুরঞ্জনায়ৈব গ্রন্থং নবরসাত্মকম্। চতুর্ভুজো রচয়তি স্বপদ্যৈশ্চ পরৈরপি॥
... ... বাণাশ্বিশশাঙ্কাঙ্কে বৈশাখে পূর্ণিমাম্বয়ৌ॥

Peterson—Catalogue of Sans. Mss. in the Library of the Maharaja of Ulwar—Extract No. 225.

২৮। Stein—Kalhana's Chronicle of the Kings of Kashmir—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩০, পদটীকা ২; Z. D. M G—৪০।৯; Indian Antiquary—২০।১৫৩।

২৯। Niradbandhu Sanyal—List of Inscriptions in the Museum of the Varendra Research Society, Rajshahi—পৃঃ ১৪।

৩০। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে—উদ্ভটসাগর, ৩।৭৪।

৩১। Journ. As. Soc, Beng.—১৬।৩১৬।

রহিম খান খানান সংস্কৃত ফারসী মিশ্রিত ভাষায় খেটকৌতুক নামক একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত মদনাষ্টক এইরূপ আর একখানি গ্রন্থ।[৩২] সমুদ্রসঙ্গম সংস্কৃতরসিক দারা শুকোর প্রসিদ্ধ ফার্সী গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ। এই অনুবাদ তিনি নিজেই করিয়াছিলেন বা কোনও পণ্ডিতের দ্বারা করাইয়াছিলেন।

মুসলমানের হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের একখানি পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, বর্ত্তমানে ইহা কাশীর সরস্বতীভবনে রহিয়াছে। পুথিখানি বামনসূত্রবৃত্তি নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের। আল্লা বক্স্ কর্তৃক ইহা সর্ববিদ্যানিধান কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতীর জন্য লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।[৩৩] কথিত হয় যে, আল্লা বক্স্ কবীন্দ্রচার্য কর্তৃক লেখকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আর কোনও গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন কি না জানা যায় নাই।

মুসলমানগণের এইরূপ সাহিত্যপ্রীতির ফলেই বোধ হয় কেহ কেহ মুসলমান শাসকগণের অনুকূল দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সংস্কৃতে তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত সংকলন বা প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা আকবরকে কেবল দিল্লীশ্বর বলিয়া পরিতৃপ্ত না হইয়া জগদীশ্বর আখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে রচিত কোনও স্বতন্ত্র গ্রন্থ এখন পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই। তবে এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালায় রক্ষিত জ্বালামুখী-স্তোত্রের একখানি পুথির শেষে তাঁহার এক ক্ষুদ্র প্রশস্তি দেখিতে পাওয়া যায়।[৩৪] হয়ত এইরূপ আরও বহু প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল। অন্যান্য রাজগণ সম্বন্ধে রচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থের মধ্যে বিজয়পুরকথা, ফতেশাহপ্রকাশ, অসফবিলাস, অহমদাবাদের স্থলতান মহম্মদ সার জীবনচরিত রাজবিনোদ, নবাবখানচরিত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৩৫]

৩২। ভারতবর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৪৩, পৃঃ ২৬৫।

৩৩। Kavindracarya List—Introduction., p. XIII.

৩৪। Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng—৭।৫৬৪৮।

৩৫। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে সংকলিত 'উদ্ভটসাগর' নামক গ্রন্থে (১।২৩, ৩।৭৩—৭৭) বিভিন্ন মুসলমান নরপতি সম্বন্ধে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ, নায়কগোপাল প্রভৃতি রচিত কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা

বর্তমানে যে শাস্ত্র Zoology বা প্রাণিবিদ্যা নামে আখ্যাত হয়, তদনুরূপ কোন স্বতন্ত্র শাস্ত্র প্রাচীন ভারতে ছিল কিনা, নিশ্চত বলিতে পারি না। তবে স্বতন্ত্র শাস্ত্র থাকুক বা না থাকুক এই বিষয়ে প্রাচীন ভারতে যে যথেষ্ট আলোচনা হইত, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে পশুযজ্ঞ সমূহের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে, তাহাতে ভারতবাসীর পশুদিগের শারীরতত্ত্বের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। পশু চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে অথবা যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহাও এ বিষয়ে ভারতীয়গণ কিরূপ আলোচনা করিতেন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। তাহা ছাড়া, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে মানবের রোগ চিকিৎসার জন্য পশুজ ঔষধের প্রচুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন পশুর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

কাব্য-ব্যাকরণ-দর্শনাদিগ্রন্থেও অনেক সময় দৃষ্টান্তচ্ছলে পশুদিগের আকার প্রকার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা উপনিবদ্ধ হইয়াছে। এগুলির বৈজ্ঞানিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, ইহারা প্রাচীন ভারতবাসীর সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দেয় সন্দেহ নাই। এই সূক্ষ্ম নিরীক্ষণের ফলেই তাঁহারা কুক্কুট, গর্দ্দভ, বক, কুকুর প্রভৃতি নগণ্য ও ঘৃণিত জন্তুর ব্যবহারের মধ্যেও শিক্ষণীয় বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছিলেন।[১] নানাস্থান হইতে এই সকল প্রাচীন প্রসিদ্ধিগুলি সংগ্রহ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলে প্রাণী সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের কি ধারণা ছিল, তাহা বুঝা যাইবে—হয়ত প্রাণিবিদ্যা শাস্ত্রের আলোচনার জন্যও কিছু কিছু নূতন উপকরণ মিলিবে। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ যে সকল প্রসিদ্ধি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি এস্থানে প্রদান করিতেছি।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ বহু উপমার মধ্যে পশুর আকৃতি প্রকৃতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, বৃষস্কন্ধ, গজগমন, হংসগমন, মৃগনয়ন, কূর্মদৃষ্টি প্রভৃতি।

---

১ সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্ শুনস্ত্রীণি গর্দ্দভাৎ।
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেত চত্বারি কুক্কুটাদপি। চাণক্য শ্লোক।

অনেক পশুপক্ষীর নামের মধ্যেও তাহাদের প্রকৃতির গুপ্ত পরিচয় অন্তর্নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। পদহীন সর্পের নাম উরগ, কারণ ইহারা বুকে হাঁটিয়া চলে। বায়ুই সর্পের একমাত্র খাদ্য না হইলেও বায়ুপ্রিয়তার জন্য ইহার আর এক নাম বায়ুভুক্। ইহার জিহ্বা খণ্ডিত তাই ইহার নাম দ্বিজিহ্ব।

পক্ষীর ব্যবহার সম্বন্ধে কালিদাসের ধারণা কিরূপ ছিল, তাহার আংশিক আলোচনা ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয় তাঁহার পাখীর কথা নামক গ্রন্থে এবং এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায় (২০শ খণ্ডে) Kalidas and the Migration of Birds নামক প্রবন্ধ করিয়াছেন।

সিংহ

গভীর অরণ্য এবং পার্বত্য প্রদেশের বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রাচীন কবিগণ প্রায় সর্বত্রই সিংহ ও হস্তীর যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন। এই যুদ্ধে কখনও একের জয় কখনও অপরের। সিংহ সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যে বিক্ষিপ্তভাবে নানাবিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটির কথা এখানে বলা হইতেছে। সিংহ নিজহত পশুর মাংসই ভক্ষণ করে।[১] মেঘের গর্জন শুনিলে সিংহ তাহার দিকে ধাবিত হয়।[২] কাজ ছোট হউক কি বড় হউক সিংহ সকল কাজই সর্বপ্রযত্নে করিয়া থাকে। ইহা সিংহের নিকট হইতে শিক্ষা করিবার বিষয়।[৩] সিংহের দৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া সিংহাবলোকিত ন্যায় প্রণীত হইয়াছিল।

হস্তী

হস্তীর সহিত সিংহের বিরোধের বিষয় ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কাব্যাদি হইতে হস্তীর কয়েকটি বিভাগের নাম পাওয়া যায়। যথা গম্ভীরবেদী, গন্ধগজ ইত্যাদি। হস্তীর মদস্রাবের উল্লেখ বহুত্র পাওয়া যায়। শুণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে মদ ক্ষরিত হয়। হস্তীর কুম্ভে মুক্তা পাওয়া যায়।

---

২ মদসিক্তমুখৈর্মৃগাধিপঃ
করিভির্বিবর্তয়তে স্বয়ং হতৈঃ। কিরাতার্জুনীয়, ২৷১৮

২ কিমপেক্ষ্য ফলং পয়োধরান্ ধ্বনতঃ প্রার্থয়তে মৃগাধিপঃ। কিরাতার্জুনীয় ২৷২১

৩ প্রভূতমল্পকার্যং বা যো নরঃ কর্তুমিচ্ছতি।
সর্ব্বারম্ভেণ তৎ কুর্য্যাৎ সিংহাদেকং প্রকীর্তিতম্।— চাণক্যশ্লোক।

হস্তীর দন্ত বহুদিন হইতে মানুষের কাজে লাগে। তাই দন্তের জন্যই ইহাকে বধ করিবার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] মুখে ব্যথা লাগিলেও হস্তিশাবক কাঁটা খাইতেই ভালবাসে।[২]

গো

গরু অতি পরিচিত। তথাপি ইহার সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত কয়েকটি কথা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। যথা—কাল রংয়ের গরু বেশি দুধ দেয়।[৩] জিনিষ ভাল কি মন্দ তাহার বিচার করে গরু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে।[৪]

কুকুর

অতি অপবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও ইহার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে অনেক কথা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, কুকুরের নিকট হইতে বহু ভোজন, স্বল্পে সন্তোষ, সুনিদ্রা, শীঘ্রচৈতন্য, প্রভুভক্তি ও শৌর্য এই ছয়টি গুণ মানুষের শিক্ষণীয়।[৫] মীমাংসাসূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামীর মতে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে কুকুর উপবাস করিয়া থাকে। তাই ঐ রাত্রির নাম শ্বনিশা।[৬] কুকুরের পুচ্ছ সকল সময়ই বক্রাবস্থায় থাকে—সহস্র প্রযত্নেও ইহাকে অবনমিত বা সরল করা যায় না। প্রাচীনগণের এ বিষয়ে দৃষ্টির পরিচয় শ্বপুচ্ছোন্নামন ন্যায় হইতে পাওয়া যায়। বহু ভোজনেও কুকুরের উদরস্ফীতির অভাবের উল্লেখ বঙ্গের উপভাষা বিশেষে স্থান পাইয়াছে, যথাস্থানে

১ দন্তয়োর্হন্তি কুঞ্জরম্।

২ ভবন্তি চানন্দবিশেষহেতবো মুখং তুদন্তঃ করভস্য কণ্টকাঃ।

—বোধিচর্যাবতার, ৯।৯২, পৃঃ ৩৩০

৩ গবাং কৃষ্ণা বহুক্ষীরা

৪ গন্ধেন গাবঃ পশ্যন্তি বেদৈঃ পশ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ

—মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৩৪।৩৪

৫ বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ বীরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্ শুনো গুণাঃ।—চাণক্যশ্লোক

৬ সিদ্ধান্তকৌমুদীর তত্ত্ববোধিনী টীকা। 'বিভাষা সেনাসুরাচ্ছায়াশালানিশানাম্' সূত্রে দ্রষ্টব্য।

তাহা উল্লিখিত হইবে। কুক্কুরের দন্তের সাদৃশ্য দৃষ্টে মানুষেরও দন্ত-বিশেষকে প্রাচীনগণ শ্বদন্ত আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন।

হংস

সৌন্দর্য, কণ্ঠস্বর, গ্রীবা, সুন্দর গতি প্রভৃতির উপমানরূপে হংসের কল্পনা সংস্কৃত কবিদের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। বর্ষাকালে হংসের মানস-সরোবরে গমন কবিসময়প্রসিদ্ধ। জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে কেবল দুগ্ধ গ্রহণ করিবার ইহার অলৌকিক সামর্থ্যেরও প্রসিদ্ধি আছে।[১]

সর্প

নামের মধ্য হইতে সর্পের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ইতঃপূর্বই উল্লিখিত হইয়াছে। বাংলা ও সংস্কৃত এই উভয় সাহিত্যেই সর্পের মস্তকস্থিত মণির বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। নিজবিষে উন্মত্ত হইয়া সর্প নিজেকেই দংশন করে এরূপ একটি প্রসিদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া যায়।[২] চক্ষুর সাহায্যেই সর্প কর্ণের কার্য করে তাই ইহার নাম চক্ষুঃশ্রবা।

ভ্রমর

মধুর গুঞ্জনের জন্য ইহা কবিসমাজে বিশেষ আদৃত। ষট্‌পদ নাম হইতে জানা যায় ইহার ছয় পা। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে মধুকর রাত্রিকালেই মধু সংগ্রহ করে।[৩] বিজ্ঞানের মতে মৌমাছির দল সর্বদা সেই দলের নেত্রী রাণী মৌমাছির অনুসরণ করে। তবে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতের মতে মধুকর মধুকররাজের অনুসরণ করে।[৪] সংস্কৃতসাহিত্যে ভ্রমর ও মধুকর অভিন্ন।

কাক

অতি হীন ও অমাঙ্গলিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টির ফলে ইহার চরিত্রে পাঁচটি শিক্ষণীয় বিষয়ের সন্ধান প্রাচীন পণ্ডিতগণ পাইয়াছিলেন।

১ হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জয়ত্যপঃ।

২ স্ববিষমূর্চ্ছিতো ভুজঙ্গ আত্মানমেব দশতি।—উদয়নকৃত আত্মতত্ত্ববিবেক পৃঃ ৬৭, ষষ্ঠ পংক্তি।

৩ রাত্রিষেব মধুনঃ সংগ্রহ ইতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ—সৌন্দর্যলহরীর লক্ষ্মীধর কৃত টীকা, ৩২শ শ্লোক

৪ মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্বা এব উৎক্রামন্তে তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্বা এব প্রতিষ্ঠন্তে—প্রশ্নোপনিষৎ, ২।৪

আকার ও ইঙ্গিতের গোপনভাব, যথাসময়ে সংগ্রহ, অপ্রমাদ এবং অনালস্য— এই কয়টি গুণ কাকের নিকট হইতে শিক্ষা করা যাইতে পারে।[১] কাকের আর একটি গুণ এই যে, সে কোথাও একা যায় না—খাবারের উদ্দেশ পাইলে ঝাঁক বাঁধিয়া যায়। মানুষ কিন্তু লাভের আশা থাকিলে একাকীই যায়।[২] সাধারণের নিকট কাক যমের দূতরূপে পরিচিত। কাকের ডাক অত্যন্ত অমাঙ্গলিক, ইহাই লোকের বিশ্বাস। শ্বেতবর্ণের কাক আরও বেশি অমাঙ্গলিক। কাক অতি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে। তাই ইহার নাম দীর্ঘায়ু, চিরায়ু বা চিরঞ্জীবী। কাকের চক্ষু একটি কিন্তু কাক ইহা এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে চালিত করিতে পারে। কাকাক্ষিগোলকন্যায়ে এই বিষয়ের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কাকের দাঁত নাই; তাই যে জিনিষ নাই, তাহা খুঁজিয়া বেড়ানর নিষ্ফল প্রযত্ন কাকদন্তপরীক্ষান্যায় নামে অভিহিত। বোধ হয়, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা বশতই কাক ভ্রমক্রমে কোকিলের ডিমে তা দিয়া তাহাকে পুষ্ট করে। তাই ইহার আর এক নাম পরভৃৎ। কাক অতি সামান্য জলেই স্নান কায সম্পন্ন করে— তাই অল্প জলে স্নান কাকস্নান নামে পরিচিত। কাকজ্যোৎস্না ও কাকবন্ধ্যা শব্দের মধ্যে কাকের কোন্ বৈশিষ্ট্যেব আভাস আছে জানি না। কাকচরিত্র প্রাচীনকালে বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল—কাকেব আচরণ মানুষের শুভাশুভের ইঙ্গিত প্রদান করে এরূপ ধারণা ছিল। কাকমাংস অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

মৎস্য

ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য মৎস্যের বিচার প্রসঙ্গে বহু মৎস্যের উল্লেখ ও শ্রেণীবিভাগ বিবিধ স্মৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায়। তাহার আলোচনা আমরা এস্থলে করিব না। মৎস্যের আচারব্যবহার সম্বন্ধে দুই একটি প্রসিদ্ধির উল্লেখমাত্র এখানে করিব। মাছের মধ্যে যেটি বড় সেটি ছোটকে খাইয়া জীবন ধারণ করে। ছোটর উপর বড়র অল্পবিস্তর অত্যাচার সর্বত্র প্রসিদ্ধ হইলেও নিজ শ্রেণীর জীবের সাহায্যেই এইরূপ জীবন ধারণের প্রথা, বোধ হয়, অন্য প্রাণীর মধ্যে নাই।

১ আকারেঙ্গিতগূঢত্বং কালে কালে চ সংগ্রহম্
অপ্রমাদমনালস্যং পঞ্চ শিক্ষেত বায়সাৎ।—চাণক্যশ্লোক

২ কাকেনাহূয়তে কাকো ভিক্ষুণা ন তু ভিক্ষুকঃ।
কাকভিক্ষুকয়োর্মধ্যে বরং কাকো ন ভিক্ষুকঃ।—উদ্ভটশ্লোক

মানব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অরাজকতার সময়ই বড় অব্যাহত ভাবে ছোটকে নিপীড়িত করে। তাই বলা হয়, সে সময়ে মাৎস্য ন্যায় প্রচলিত। গভীর জলের মাছ অল্প জলের মাছের মত চঞ্চল হয় না। তাই রোহিত বেশি জলে থাকে বলিয়া স্থির, আর গণ্ডূষমাত্র জলেই পুঁটির চাঞ্চল্য।[১] কুট্টনীমত-রচয়িতা দামোদর মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির সহিত মৎস্যবধূর অনিমেষ দৃষ্টির তুলনা করিয়াছেন।[২]

ব্যাঙ্

অতি নগণ্য হইলেও বৈদিক ঋষি ব্যাঙের বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। ঋগ্‌বেদের একটি পূর্ণ সূক্ত [৭।১০৩] ব্যাঙের বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

জিহ্বা না থাকায় ব্যাঙের এক নাম অজিহ্ব। ব্যাঙ যে লাফাইয়া লাফাইয়া চলে মণ্ডূকপ্লুতি ন্যায় তাহার ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে।

বিবিধ

ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রাণী সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের নানা স্থলে এইরূপ নানা কথা বলা হইয়াছে। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইয়াছে। এই সমস্ত কথা ব্যাপকভাবে সংগৃহীত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে আলোচিত হইলে বিশেষ উপাদেয় ও উপকারী হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি আব কয়েকটি কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহাব করিব।

বৃশ্চিক গোমায়ু হইতে জন্ম গ্রহণ করে এই প্রসিদ্ধির উল্লেখ সংস্কৃত সাহিত্যের বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ স্ত্রীপুংযোগ ব্যতিরেকেও যে কখনও কখনও প্রাণীর জন্ম হইতে পারে তাহার অন্য উদাহরণও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। স্বয়ং শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, বলাকা শুক্রব্যতীতই গর্ভধারণ করে। পুংযোগ ব্যতীত হংসী যে ডিম্ব প্রসব করে তাহা বাওয়া ডিম নামে প্রসিদ্ধ।

১ অগাধজলসঞ্চারী বিকারী নাপি রোহিতঃ
গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে। উদ্ভটশ্লোক

২ অনিমেষং পশ্যন্তী মৎস্যবধূমনুচকার সা তন্বী
—২৭০ শ্লোক। প্রসঙ্গতঃ ১০৩৪ শ্লোকও দ্রষ্টব্য

বলাকা মেঘের শব্দ শুনিয়াই গর্ভ ধারণ করে। ইহাই ছিল সাধারণের বিশ্বাস।[১] বোধ হয়, কালিদাসের সময়ও লোকের এই ধারণাই ছিল। তাই তিনি মেঘদূতে মেঘকে বলিতেছেন,

গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগাঃ খে ভবন্তং বলাকাঃ॥ (১।৯)

গর্ভধারণ অনেক প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। এরূপ কয়েকটি প্রাণীর নাম সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। যথা—বৃশ্চিক, কর্কট, অশ্বতরী। অশ্বতরী-গর্ভন্যায় ও বৃশ্চিক-গর্ভন্যায় এ বিষয়ে সাধারণের অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মহাভারত, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। বেদান্তকল্পতরুকার স্পষ্টই বলিয়াছেন—"বৃশ্চিকাদির্মাতুরুদরং নির্ভিদ্য মৃতাজ্জায়তে।" মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও শান্তিপর্বের ১৪০ অধ্যায়ের ৩০ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"অশ্বতরী গর্দভাজাশ্বা উদরভেদেনৈব প্রসূতে ইতি প্রসিদ্ধম্।"[২]

বিষাদি দর্শন মাত্রেই পক্ষিবিশেষের ভাবান্তর উৎপন্ন হইবার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জন্য এই সকল পক্ষী রাজারা সযত্নে নিজেদের কাছে রাখিতেন এবং খাদ্যদ্রব্য বিষাক্ত কি না পরীক্ষা করিবার জন্য ইহাদের কাছে রাখিতেন। কামন্দকীয় নীতিসারে বিষাদি দ্বারা পক্ষীদিগের কিরূপ অবস্থান্তর পরিলক্ষিত হয় তাহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কামন্দক বলিয়াছেন—ভৃঙ্গ, শুক, সারিকা বিষ এবং সর্প দর্শন করিলে উদ্বিগ্ন হইয়া ভীষণ চীৎকার করে—বিষ দর্শনে চকোরের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, ক্রৌঞ্চ উন্মত্ত হয় এবং মত্ত কোকিল মারা যায়।

---

১ বলাকা চ স্তনয়িত্নুরবশ্রবণাদ্ গর্ভং ধত্তে—
শঙ্করাচার্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য—২।১।২৫।

২ এই প্রসঙ্গে কাশীদাসী মহাভারতের নিম্নোদ্ধৃত অংশ তুলনীয়ঃ—
শত্রুকে পালন করি করিবে বিশ্বাস।
খচর জন্মিলে যেন গর্দভীর নাশ॥
—আদিপর্ব, যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যে অভিষেক
—পূর্ণচন্দ্র উদ্ভটসাগরের সংস্করণ—১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৫

মাকড়সার জালের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন একটি প্রসিদ্ধির উল্লেখ শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে পাওয়া যায়। মাকড়সার লালা হইতে এই জালের উৎপত্তি ইহাই এই প্রাচীন প্রসিদ্ধি।[১] চকোর পক্ষী পান করে জ্যোৎস্না। তাই ইহার নাম চন্দ্রিকাপায়ী বা কৌমুদীজীবন। চাতক পান করে মেঘের জল; তাই ইহার নাম মেঘজীবন।

কেবল সংস্কৃত সাহিত্যেই যে প্রাণি সম্বন্ধে বিবিধ প্রসিদ্ধির উল্লেখ আছে এমন নহে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও লৌকিক প্রবাদের মধ্যেও এরূপ বহু প্রসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গে ক্ষীণ উদরকে 'কুকুরিয়া পেট' বলা হয়। বস্তুতঃ কুকুর যত আহারই করুক না কেন তাহার উদরস্ফীতি কিছুতেই হইবে না। কুকুর ঘি খাইয়া হজম করিতে পারে না। অনভ্যাস বশতঃ কেহ কোনও গুরুপাক জিনিস পরিপাক করিতে না পারিলে কঠিন ব্যঙ্গচ্ছলে তাহার কাছে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হয়। শূকরের গোঁ সুপ্রসিদ্ধ। সাপ আর বেজির চিরবিবাদ বাঙালির নিকট উপমার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। বাঘের সহিত বিড়ালের আকারগত সাদৃশ্য নিপুণ ভাবে লক্ষ্য করিয়া বাঙালি বিড়ালকে বাঘের মাসীরূপে কল্পনা করিয়া থাকে। কাকের ঠোকর দিয়া খাওয়ার রীতি নানা বিষয়ে অসম্পূর্ণ ভাবে কিছু কিছু করার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে।[২] বকের আকৃতিব সহিত খকারের আকৃতির সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে খকারেব পরিচয় দেওয়া হয় 'বগা খ' রূপে। এইরূপ কুকুরের বক্র লাঙ্গুলের সহিত ঢকারের সাদৃশ্য নিবন্ধন ঢকারেব বর্ণনা 'কুকুরলেজী ঢ'। ছাগের ইন্দ্রিয়পারতন্ত্র্যের ইঙ্গিত 'ছাগতান্ত্রিক সাহিত্যে'র অন্তরালে বর্তমান রহিয়াছে। ছাগের এই বৈশিষ্ট্যের কারণ রামাই পণ্ডিত শূন্য পুরাণে একটি আখ্যানে বর্ণনা করিয়াছেন। সংস্কৃত কবিদের অনুসরণ করিয়া প্রাচীন বাঙালি কবিরাও মানুষের বিভিন্ন অঙ্গের সহিত পশুর অঙ্গের সাদৃশ্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন। খগপতিনাসা, সিংহমাঝা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত।

১ তন্তুনাভশ্চ চ ক্ষুদ্রতরজন্তুভক্ষণাৎ লালা কঠিনতামাপদ্যমানা তন্তুর্ভবতি (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ২।১।২৫)।

১ সংস্কৃত কবি মোরগের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতকে কুক্কুট মিশ্র নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

বাদুড় যে মুখ দিয়া আহার করে সেই মুখ দিয়া মল ত্যাগ করে। একাধিক গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। যথা,

বাদুড় হইয়া রহ ভুবন ভিতরে।
যে মুখে খাইবা তুমি সে মুখে বর্ষিবা॥
—গোপীচন্দ্রের পাঁচালি, পৃঃ ২৯৩

মুখে খাও মুখে বছ মুখে যাও সঙ্গ।
—গোরক্ষবিজয়, পৃঃ ১৯৬

বাদুড়ের এই বৈশিষ্ট্য হইতেই রোগের নামকরণ হইয়াছে 'বাদুড়ি'।

লোকে কথায় বলে—'বেড়ালের গু কাজে লাগিলে বেড়াল গাছে উঠিয়া হাগে', 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল', 'উঁইয়ের পাখ হয় পুড়িয়া মরিতে'।

বাংলার পুরাণকাহিনী

পৌরাণিক কাহিনী ভারতের তথা ভারতীয় সাহিত্যের এক অক্ষয় অমূল্য সম্পদ্। পুরাণের কাহিনীগুলি দুঃখ-দারিদ্র্য-নিপীড়িত সাধারণ ভারতবাসীর চিত্তকে সজীব ও সরস করিয়া রাখিয়াছে—ব্যথায় তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, নৈরাশ্যের মধ্যে আশার বাণী শুনাইয়াছে—সমস্ত বাধা-বিপত্তির মধ্যে কর্তব্যের পথে অবিচলিত থাকিবার উৎসাহ ও শক্তি জোগাইয়াছে। পুরাণের রাম লক্ষ্মণ সীতা সাবিত্রী কৃষ্ণ অর্জুন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের আদর্শ ভারতবাসীর জীবনযাত্রাকে প্রতি পদে নিয়মিত করিতেছে। পরম শ্রদ্ধাভরে ভারতবাসী ইহাদের কথা স্মরণ করে। ইহাদের স্মৃতি-পূত স্থান দর্শন করিয়া—ইহাদের নামবিজড়িত কাহিনী সাগ্রহে শ্রবণ করিয়া আজ পর্যন্ত ভারতবাসী নিজেকে কৃতার্থ বিবেচনা করে। যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহনীয়, সমস্তই ইহাদের উপর আরোপ করিতে সে কখনও দ্বিধা বোধ করে নাই। তাই যুগে যুগে প্রদেশে প্রদেশে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন ভাষায় ইহাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া অজস্র কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলের রচনা রক্ষিত হয় নাই—রক্ষিত রচনারও মূল রচয়িতার নাম কাল উদ্ধার করিবার সম্ভাবনা নাই। এই সব কাহিনীরই কতকগুলি ব্যাস ও বাল্মীকির অমর গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে—পুরাণগুলির মধ্যেও এই জাতীয় অনেক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রাদেশিক ভাষায় রচিত রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-বিষয়ক গ্রন্থে অসংখ্য আখ্যান বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। পূর্বে পাঠ ও গানের মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্যে ইহাদের বহুল প্রচারের ব্যবস্থা ছিল। আজ সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে ইহারা অনেকাংশে অপ্রচলিত ও অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিতসমাজে ইহারা একরূপ উপেক্ষিত। তাই ইহাদের ক্রমশঃ বিলুপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। অথচ ইহাদের অনেকগুলির প্রাচীনতা অবিসংবাদিত—লোকসাহিত্যের দিক্ দিয়া ইহাদের মূল্য অপরিসীম। তাই ইহাদের একত্র সংকলন, সমালোচনা ও বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। দেশের বিভিন্ন অংশে

এ জন্য সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আশা করি, ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানী দৃষ্টি অচিরে এ দিকে আকৃষ্ট হইবে।

বর্তমান প্রবন্ধে আমি বাংলায় প্রচলিত অজ্ঞাতমূল কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারতের পরিচিত কাহিনীর বাংলা প্রতিরূপের আলোচনার প্রয়োজন এখানে নাই। যে সব কাহিনীর সন্ধান এই সব গ্রন্থে পাওয়া যায় না তাহাদের বিবরণ সংগ্রহই বর্তমান ক্ষেত্রে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে, ইহাদের মধ্যে কোন কোন কাহিনী কিছু দিন আগেও বিশেষ জনপ্রিয় ছিল—যাত্রা ও গীতাভিনয় আকারে ইহারা দেশবাসীকে আনন্দ জোগাইয়াছে। তেমন প্রচলনের অভাবে অনেক কাহিনী যে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহাও বলা চলে না।

বাংলা রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে এই জাতীয় বহু কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। প্রচলিত বাংলা রামায়ণের মধ্যে এমন বহু কাহিনী আছে, যাহাদের কোনও প্রসঙ্গ বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণে নাই। কোন কোন কাহিনী অবশ্য প্রচলিত সংস্কৃত পুরাণে বা অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায়—অনেকগুলির কোনও মূলই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রত্নাকরের উপাখ্যান সংস্কৃত রামায়ণে নাই বটে, তবে অধ্যাত্মরামায়ণে এই জাতীয় উপাখ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই বিষয়ে যে বিবরণ আছে, অধ্যাত্মরামায়ণে সে সমস্তই আছে—কেবল 'রত্নাকর' এই নামের উল্লেখ তাহাতে নাই। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার Bengali Ramayans নামক গ্রন্থে ইহাকে দেশজ আখ্যান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা ছিল—ইহার কোনও সংস্কৃত মূল নাই। অবশ্য অধ্যাত্মরামায়ণের কাহিনীর সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন—অধ্যাত্মরামায়ণকার কোন সূত্র হইতে এই কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও জানিবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া, সংস্কৃত গ্রন্থেও যে দেশজ উপাদান বহুল পরিমাণে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহারও প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বাল্মীকির জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান কোথাও কোথাও জনসাধারণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। কর্ণাল জেলায় প্রচলিত এইরূপ একটি কাহিনীর কথা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে Indian Antiquary নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। রামের চণ্ডীপূজার কাহিনীও মূল রামায়ণে না থাকিলেও কালিকাপুরাণে আছে বলিয়া দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উল্লেখ

করিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রিত কালিকাপুরাণে ইহা নাই। ভগীরথের জন্ম সম্পর্কে যে কাহিনী কৃত্তিবাসের রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে তাহার কোন সন্ধান প্রচলিত সংস্কৃত পুরাণে পাওয়া যায় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় বশিষ্ঠ রামায়ণ ও পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডের যে পুথি আছে তাহাতে ইহা পাওয়া যায়।[১] অশ্বমেধের অশ্বনিরোধব্যাপারে লবকুশের সহিত রামের বিরোধের বিবরণ ভবভূতির উত্তররামচরিতে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু রাম না জন্মিতে রামায়ণ রচিত হইবার কাহিনী, মহীরাবণ ভস্মলোচন মকরাক্ষ তরণিসেন বীরবাহু কালনেমির উপাখ্যান, গয়াশ্রাদ্ধ সম্পর্কে রামসীতার কাহিনী, লক্ষ্মণের চতুর্দশ বৎসর উপবাস, সীতাকর্তৃক রাবণের প্রতিকৃতি অঙ্কন ও অহল্যা উদ্ধারের বিবরণের কোনও প্রাচীন সংস্কৃত মূলের সন্ধান পাওয়া যায় না। যযাতির নরমেধ যজ্ঞ এইরূপ আর একটি কাহিনী। ইহা এক সময় বাংলা দেশে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া রাজকৃষ্ণ রায় গীতাভিনয় রচনা করিয়াছিলেন। তবে ইহা এবং শিবরামের যুদ্ধ ও বজ্রপাতবধ মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে নাই। বিভিন্ন পুথিসংগ্রহে সংরক্ষিত একাধিক স্বতন্ত্র পুথি ইহাদের জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য হিসাবে বর্তমান রহিয়াছে। মহারাজ অম্বরীষও নরমেধ-যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই কাহিনী অবলম্বনে নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে শ্রীবৎস ও চিন্তার প্রসিদ্ধ উপাখ্যান সংস্কৃত মহাভারতে নাই। বহু দিন পূর্বেই রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মহাভারত-বর্ণিত চরিত্র অবলম্বনে রচিত সবিশেষ জনপ্রিয় দণ্ডীপর্বকাহিনীর মূল হিসাবে পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার ও জৈমিনীয় সংহিতার উল্লেখ করা হয়।[২] শ্রীযুক্ত আবদুল করিম-সংকলিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে' (১।২২৩) বর্ণিত একখানি পুথিতে দণ্ডীপর্ব কাহিনীকে ভাগবতের অন্তর্গত বলা হইয়াছে। উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়-রচিত দণ্ডীপর্বকাহিনীর এক খণ্ড পরিষদ্‌গ্রন্থালয়ে আছে। ইহাতে এই কাহিনীকে বৃহৎ কূর্মপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সব নানা মুনির নানা মতের

১। নলিনীকান্ত ভট্টশালী—রামায়ণ, আদিকাণ্ড—পৃঃ ৮৪

২। বিশ্বকোষ; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড—সুকুমার সেন—২য় সংস্করণ, পৃঃ ৬৯৩

মধ্যে কাহিনীটির গৌরবখ্যাপনের ঐকান্তিক আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র।

বহুলপ্রচলিত দাতা কর্ণের পালা এবং কাশীদাসের নামাঙ্কিত পাণ্ডবমিলন, ষানপর্ব, বৃহদ্‌দ্রোণপর্ব, স্বপ্নপর্ব, অমুশৌচিকপর্ব, অমুশান্তিপর্ব, অভিষেকপর্ব প্রভৃতিতে বর্ণিত উপাখ্যানের কোন মূল সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। এইরূপ আরও অনেক উপাখ্যানের সন্ধান বাংলা রামায়ণ মহাভারতের হস্তলিখিত পুথির মধ্যে পাওয়া যাইতে প্যরে।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনেতিহাস সম্পর্কেও এমন অনেক কাহিনী বাংলায় পাওয়া যায়, যাহাদের কোনও উল্লেখ ভাগবতাদি গ্রন্থে নাই। অথচ এগুলি বাঙালি সমাজে বিশেষ পরিচিত ও সমাদৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অধ্যয়ন ও গুরুদক্ষিণা এবং দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শিব, চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে যে সব কাহিনী বাংলা দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সহিতও সংস্কৃতপুবাণের বিশেষ কোনও যোগাযোগ নাই—প্রসিদ্ধ পুরাণগুলির মধ্যে তাহাদের কোনও সন্ধান মিলে না। এই বিষয়ের পৌরাণিক উপাখ্যানগুলিরও বাংলা অনুবাদ যে প্রস্তুত হয় নাই তাহা নহে। তবে জনপ্রিয়তার দিক্ দিয়া পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি অপৌরাণিক উপাখ্যানের তুলনায় নিতান্ত নিম্ন স্থান অধিকার করে। তাই শিবের মাহাত্ম্যবিষয়ক শিবচতুর্দশীর উপাখ্যানের ব্যাধের বৃত্তান্ত অথবা মহিষাসুরবধ, মধুকৈটভবধ, শুম্ভনিশুম্ভবধ, চণ্ডমুণ্ডবধ, রক্তবীজবধ প্রভৃতি চণ্ডীর অলৌকিক বীরত্বব্যঞ্জক মাহাত্ম্যকাহিনী বাঙালির চিত্তকে বিশেষ আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু শিবের চাষবাসের বিবরণ, হরগৌরীর কোন্দলের কথা, কালকেতু ফুল্লরার সুখদুঃখের বৃত্তান্ত, শ্রীমন্ত সদাগরের অপূর্ব সাহসিকতার কাহিনী প্রভৃতি অপৌরাণিক উপাখ্যানগুলি বাঙালির রসগ্রাহী মনকে অলৌকিক তৃপ্তি দান করিয়াছে—আজ পর্যন্ত অগণিত দেশবাসীর নিকট ইহারা যথেষ্ট আদর ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়া আসিতেছে। পক্ষান্তরে বিভিন্ন পুরাণ বা পৌরাণিক আখ্যানের বঙ্গানুবাদগুলি কেবল ঐতিহাসিকের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছে।

সত্য বটে, বাংলা বা অন্য প্রাদেশিক ভাষায় উপনিবদ্ধ পুরাণবিষয়ক সমস্ত

কাহিনীই প্রাচীনতার দাবী করিতে পারে না—অর্বাচীন কবিদের বিচিত্র কল্পনা যুগে যুগে কত শত উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সংস্কৃতে লিখিত পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যেও যে এইরূপ ঘটনা ঘটে নাই, তাহা বলা চলে না। বস্তুতঃ প্রাচীন অপ্রাচীন ভাল মন্দ সমস্ত বস্তু মিলিয়া দেশের লোকসাহিত্যকে স্ফীত পরিপুষ্ট করিয়াছে। সে হিসাবে অপ্রাচীন কাহিনীগুলিরও মূল্য কম নহে। ইহাদের মধ্য হইতে যাহা প্রাচীন, তাহা বাহির করিতে হইলে সর্বাগ্রে দরকার ব্যাপক অনুসন্ধানের, সযত্ন সংগ্রহের ও সুনিপুণ বিশ্লেষণের। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী সঙ্কলিত ও আলোচিত হইলে পুরাণকাহিনীর প্রাচীন ধারা আবিষ্কার করা সম্ভবপর হইবে—সংস্কৃত পুরাণসাহিত্যের মূলসূত্রও খুঁজিয়া বাহির করার সম্ভাবনা দেখা দিবে। সংস্কৃত পুরাণকাহিনী অপেক্ষা প্রাচীন কাহিনীও অনেক ক্ষেত্রে প্রাদেশিক ভাষার অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাহাদের উদ্ধারসাধনের জন্য যে চেষ্টা, যে পরিশ্রম স্বীকার করা দরকার, তাহা উপেক্ষা করিলে অচিরকালমধ্যে অনাদরে অনেক মূল্যবান্ বস্তু চিরতরে নষ্ট হইয়া যাইবে। আশা করি, সম্প্রতি কাশীনরেশ পুরাণ প্রকাশ ও পুরাণ আলোচনার যে ব্যাপক আয়োজন করিয়াছেন বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত কাহিমীগুলির সংগ্রহ ও প্রচারও তাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা বা বত্রিশ সিংহাসনের বিভিন্ন রূপ ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত আছে। সম্প্রতি ইহার একটি অনালোচিতপূর্ব নূতন রূপের সন্ধান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একখানি পুরাতন বাংলা পুথিতে (১৫৫৮) পাওয়া গিয়াছে।[১] ইহাতে বত্রিশ সিংহাসনের গল্পের মধ্য দিয়া কালীর মাহাত্ম্য প্রচার করা হইয়াছে। তাই ইহার নাম কালিকামঙ্গল। পুত্তলিকা-গুলির নামের মধ্যেও কিছু কিছু নূতনত্ব আছে। দুঃখের বিষয়, প্রাপ্ত পুথিখানি অসম্পূর্ণ বলিয়া ইহাতে সমস্ত পুত্তলিকার নাম ও কাহিনী পাওয়া যায় না। মাত্র বারটি পুত্তলিকার নাম ও কাহিনী ইহাতে আছে। কাহিনী-গুলিতে কালীভক্ত বিক্রমাদিত্যের পূর্ব ও বর্তমান জীবনের বৃত্তান্ত আনুপূর্বী অনুসারে বিবৃত হইয়াছে—কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বর্ণনামাত্র ইহাদের উপজীব্য নয়। ইহার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে প্রদত্ত হইবে। এখানে পুত্তলিকাদের নামের নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। প্রথম হইতে দ্বাদশ পর্যন্ত নামগুলি যথাক্রমে এইরূপ—সুকেশ, জুগেশ (যোগেশ), ভীম, নীলসেন, নল, রক্তাক্ষ, হিঙ্গুলাক্ষ, মকরাক্ষ, অনল, অনিল, সূচীমুখ, বকদন্ত। ভোজ সিংহাসনে আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেই এক একটি পুত্তলী তাঁহাকে তিরস্কার

১। বত্রিশ সিংহাসনের সাধারণ রূপ সাহিত্য-পরিষদের অপর দুইখানি পুথিতে (৮৯৪, ৮৯৫) পাওয়া যায়। প্রথম পুথিখানির রচয়িতা রঙ্গাই ব্রাহ্মণ—দ্বিতীয় পুথিখানির রচয়িতার নাম জানা যায় না। ৮৯৫ সংখ্যক খণ্ডিত পুথি অনুসারে সিংহাসনখানি ইন্দ্রের সভা হইতে কবি কালিদাস রাজার জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন।

আর দিন ইন্দ্রপুরে জায় কালিদাস।
রাজার বাখান করে করিয়া প্রকাশ।
সুখ ভোগ ছাড়িলেক যতেক রতন।
বড় তুষ্ট হইলেন সহস্রকারণ।
এ সব দুর্লভ রত্ন সভায় যাহার।
ধন্য ধন্য মহারাজ মহীতলে সার।
দেবরাজ বলে পুন আমি কহি কথা।
যেহি চাহ সেহি দিব কহিল সর্বথা।
এত শুনি কালিদাস মনে মনে গণে।
ধন চাহিলে দরিদ্র বলিবে সর্বজনে।
সিংহাসন মাগি লব রাজার কারণ।
এমত মনেতে ভাবি বলিল বচন।
সিংহাসন দেহ রাজা নিবেদি তোমাতে।
বিক্রমাদিত্য রাজা বসিবে ইহাতে।
বুঝিয়া তাহার মন সহস্রলোচন।
তোমার রাজারে আমি দিব সিংহাসন।
সিংহাসন লৈয়া তবে করিল পয়ান।
সিংহাসন আনি দিল রাজা বিদ্যমান। (পত্র ১–২)

করিয়া সিংহাসনের প্রকৃত মালিকের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে এবং তাঁহারই অনুরোধক্রমে সেই মালিক বিক্রমাদিত্যের জীবনের ক্রমিক বিবরণ প্রদান করিয়াছে।

পুথির রচয়িতা শিবরাম ঘোষ—পিতার নাম রাজেন্দ্র ঘোষ, মাতার নাম বোধ হয় রাধিকা[২]। পুথির বিভিন্ন ভনিতায় ইহাকে কালিকামঙ্গল, শ্যামার মঙ্গল, কালিকাপুরাণ, সিংহাসনবর্তিসার কথা, পুত্তলী সঙ্গীত, ষট্‌সম্বাদ ভাষা[৩] প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ভোজ কর্তৃক সিংহাসন প্রাপ্তির বিবরণ হইতে পুথির আরম্ভ। এ বিবরণটাও নূতন। এক ব্রাহ্মণ পাটনে গিয়া কোনও এক রাজার নিকট হইতে সাতটি মাণিক্য প্রাপ্ত হন এবং নিজ ব্রাহ্মণীর নিকট দিবার অনুরোধ জানাইয়া ঐগুলি তিনি তাঁহার এক বন্ধু বণিকের হাতে দেন। বণিক্ উহা আত্মসাৎ করে। ব্রাহ্মণ ভোজরাজের নিকট অভিযোগ করিলে ভোজরাজ বণিক্ ও অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির নিকট এই অভিযোগের সত্যতা বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। তাহারা সকলেই অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিলে ব্রাহ্মণ দণ্ডিত হন।

হাতে হাতকড়ি দিল কাঁকালেতে ডোর।
ব্রাহ্মণ হইল বন্ধি জেন মত চোর ॥ (৭খ)

বনের মধ্যে রাখাল বালকগণ এক বল্মীকস্তূপের উপর 'রাজা রাজা' খেলা করিতেছিল। কোটালের সহিত ব্রাহ্মণ ও বণিক্ যখন সেই পথে যাইতেছিলেন, তখন রাখাল রাজা তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সমস্ত শুনিয়া নূতন রকম বিচারের ব্যবস্থা করিলেন। বিবাদবিষয়ীভূত মাণিক্যের আকৃতি কিরূপ ছিল জানিবার জন্য তিনি ব্রাহ্মণ, বণিক্ ও সাক্ষিগণের

২। রাজেন্দ্রঘোষের সুত রচিল কৌতুকে (১২২খ, ১২৮ক)। রাধিকানন্দন শিবরাম ঘোষ ভণে (১২৩খ), রাধিকানন্দন কবি (১২২খ, ১৯৭খ)। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত শিবরামের অপর গ্রন্থ একাদশীমঙ্গলেও তাঁহার এইরূপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে (সাহিত্য পরিষৎপত্রিকা ৬৪ ১১৯)

৩। কালিকামঙ্গল (৪২ক, ৫৪ক, ১৩৩খ, ১৩৪ক, ১৩৭খ, ১৪৫ক, ১৪৫খ)। শ্যামার মঙ্গল (১০২ক)। কালিকাপুরাণ (কালিকাপুরাণ গীত তন্ত্রের বিধানে—১৪৭ক, ষট্‌সম্বাদভাষা কালিকাপুরাণে—১১১খ)। সিংহাসন বর্ত্তিসার কথা (১১৮খ, ১৩৯খ, সিংহাসন বর্ত্তিসার কথা কালিকামঙ্গল—১১৮ক)। পুত্তলিসঙ্গীত (শিবরাম ঘোষ গান পুত্তলিসঙ্গীত—১৫খ, ১২৫ক)। ষট্‌সম্বাদভাষা (১১১খ, ১২৬খ)।

প্রত্যেককে মাটি দিয়া সেই মাণিক্যের প্রতিকৃতি গঠন করিতে বলিলেন। সাক্ষীরা যে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়াছে, এই পরীক্ষায় তাহা ধরা পড়িল।

রাখাল বিচারে সাধু সভায় হারিল।
কোটাল সাক্ষাতে সাত মাণিক্য মানিল ॥
ব্রাহ্মণ মাণিক পাইল রাখাল বিচারে।
দেখিয়া শুনিঞা সভে চিন্তিত অন্তরে ॥ (১১খ)

রাখালের এই অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া রাজা বিস্মিত হইলেন এবং পাত্রের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, ইন্দ্রদত্ত দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা-শোভিত স্বর্ণমণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন ঐ স্থানে মাটির ভিতর রহিয়াছে। তাহারই ফলে ঐ স্থানে উপবিষ্ট রাখালের এত বুদ্ধি।

অতঃপর একদিন ভোজ সদলবলে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া রাখালরাজের সঙ্গে মিত্রতা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাখালের অনুরোধক্রমে রাজা সেই বল্মীকস্তূপেব উপর আরোহণ কবিলেন।

উঠিয়া রাজাবে শিশু আলিঙ্গন দিতে।
মঞ্চে হৈত রাখালেরে পেলে নরনাথে ॥
ভূমেতে পড়িযা শিশু হাতে লৈয়া ছাট।
ধেনু চরাইতে চলে অতি দূর বাট ॥ (১৩ক)

মাটিকাটার ফলে সেই স্থান হইতে বিচিত্র সিংহাসন বাহির হইল।

কনকগঠিত সর্বরত্ন সিংহাসন।
বতিস পুতুলি তাহে কনকগঠন ॥
কাঞ্চনগঠিত বর্তিস সিংহের উপরে।
বর্তিস পুতুলি বতিস পৈঠার উপরে ॥ (১৪খ)

'মকরমাসেতে শুক্লাতিথি ত্রিয়দসি'তে রাজা সিংহাসনে বসিবার আয়োজন করিলে প্রথম পৈঠার সুকেশ নামে পুত্তলিকা রাজাকে বাধা দিল এবং সিংহাসনের উপযুক্ত মালিক বিক্রমাদিত্যের পূর্বজীবনকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য পূর্বজন্মে কঙ্কণ নামক মুনি ছিলেন। তিনি রঙ্কিণী বা কালীর উপাসনা করিতেন। উপাসনায় পরিতুষ্ট হইয়া দেবী বর দিতে আসিলে কঙ্কণ মুনি দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন—

দান মোরে দেহ বিদ্যা চুরি। (১৬খ)

বাঞ্ছিত বর পাইয়া কঙ্কণ স্বর্গে গমন করিলেন এবং

ইন্দ্র আদি করি দশ দিক্‌পাল ঘরে।
মন্ত্রতেজে তপোধন নিত্য চুরি করে॥
... ...
পরীক্ষা করয়ে মুনি দেবতার মন।
পুনরপি দেয় লৈয়া যার যত ধন॥ (১৭ক)

অতঃপর মুনি একে একে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সমস্ত আভরণ চুরি করিলেন। অপহৃত বস্তু ফেরত দিতেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া চক্রের দ্বারা মুনির দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিলেন (২০ ক)। দেহবিচ্যুত মুণ্ড কালিকা দেবীকে স্মরণ করিল। অনুগত ভক্তের এই অসম্ভাবিত বিপদে কালিকা দেবী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইলেন। দেবীর ক্রোধে সমস্ত দেবকুল ভীত হইলেন—স্বয়ং শিব ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলিলেন—

তোমার সেবক না জানি আমি।
ক্ষেম অপরাধ দেখিয়া স্বামি॥
জন্মি পৃথিবীতে হইব রাজা।
তোমার সেবকের বাড়িব প্রজা॥
হব অষ্টসিদ্ধি উহার অঙ্গে।
রক্ষিব সদত তব প্রসঙ্গে॥ (২২ক)

এই কথা বলিয়া প্রথম পুত্তলী সুকেশ সিংহাসন হইতে খসিয়া পড়িল। তখন ভোজ আবার সিংহাসনে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিলে জুগেশ পুত্তলী তাঁহাকে নিষেধ করিল এবং রাজার অনুরোধে কঙ্কণের পরজন্মের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিল।

কনকাদিত্য নামক চক্রবর্তী রাজার দ্বিতীয়া পত্নী কলাবতীর গর্ভে কঙ্কণ মুনি বিক্রমাদিত্য নামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—কনকাদিত্যের 'অগ্রজ নন্দন' ছিলেন শকাদিত্য। এই বলিয়া জুগেশ পুত্তলী খসিয়া পড়িল এবং ভোজ পুনর্বার সিংহাসনে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিলে ভীম পুত্তলী বাধা দেয় এবং ভোজরাজের অনুরোধে বিক্রমাদিত্যের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে থাকে। পঞ্চম বৎসর বয়সে বিক্রমাদিত্যের পিতৃবিয়োগ হইল এবং মাতা স্বামীর অনুগমন করিলেন। তখন শকাদিত্য রাজসিংহাসনে

অভিষিক্ত হইলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিক্রমাদিত্য 'তন্ত্র বিধান মন্ত্র করিলা গ্রহণ'। একদিন রাত্রিকালে মহাকালী স্বপ্নে তাঁহাকে বলিলেন—'রাজা হৈয়া কর পুত্র প্রজার পালন।' পরদিন বিক্রমাদিত্য জ্যেষ্ঠের ঘরে গিয়া কথাবার্তা বলিতে বলিতে তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিলেন এবং রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ভীমপুত্তলী এই পর্যন্ত বলিয়া খসিয়া পড়িল। (২৭খ)

তৎপরে রাজার পুনরায় সিংহাসন আরোহণের চেষ্টা এবং নীলসেন পুত্তলী কর্তৃক বাধা প্রদান ও বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের পরবর্তী অংশের বিবরণ প্রদান। এক বৎসর রাজত্ব করিবার পর বিক্রমাদিত্য গুরুর নিকট গমন করিলে গুরু ভ্রাতৃহত্যাকারীর মুখদর্শনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন গুরুর অভিপ্রায়ানুসারে তিনি পাপমুক্তির জন্য পাত্র ও মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যের ভার দিয়া একাকী তীর্থযাত্রা করিলেন।

যাত্রাকালে মহারাজ কহে পাত্রগণে।
কোষমধ্যে ভক্ষ্য দ্রব্য রাখিবে যতনে॥
রাজপাটে কদাচিৎ না ছাড়াবে কোষ।
ভক্ষ্য দ্রব্য পাইলে দেবের হইব সন্তোষ॥ (২৯ক)

রাজার কথামত যত দিন কোষগৃহ খাদ্যপূর্ণ ছিল, ততদিন ভট্ট বেতাল সুখে উহা ভোজন করিল। পরে কোষ শূন্য হইলে তাহারা কিছুদিন উপবাসী থাকিয়া যিনি রাজা হন, তাঁহাকেই ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে বিক্রমাদিত্য ছদ্মবেশে স্বদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। একদিন রাজা নগরের মধ্যে এক ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে কোটাল আসিয়া ব্রাহ্মণকে বলিল—পরদিন তাঁহাকে রাজা হইতে হইবে। এই কথায় সপরিবারে সেই ব্রাহ্মণ অতিশয় বিচলিত হইলেন। রাজা তাঁহার নিকট সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া ব্রাহ্মণের পরিবর্তে নিজে রাজপদ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তারপর যথারীতি তাঁহার অভিষেক হইলে তিনি ভেটের সমস্ত জিনিসের দ্বারা কোষগৃহ পূর্ণ করিয়া রাখিলেন। রাত্রিতে ভট্ট বেতাল সেখানে আসিয়া পরিতোষ সহকারে আহার করিয়া দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হইল। তাহাদের কথোপকথনে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। রাজা তাহাদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল—তোমার 'ভ্রাতৃহত্যা পাপ এখনও দূরীভূত হয় নাই, সেই পাপ দূর হইলে আমরা পরিচয়

প্রদান করিব।' এই পর্যন্ত বলিয়া নীলসেন সিংহাসন হইতে মাটির উপর খসিয়া পড়িল (৩২ খ)।

অতঃপর নল নামক পঞ্চম পুত্তলী বলিতে লাগিল। ভট্ট বেতালের পূর্বোক্ত আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া বিক্রম কিছুদিন পরে পুনরায় গুরুদেবের নিকট গমন করেন এবং গুরুর উপদেশ মত কয়েক মাস 'সজীব সকুনপোনা' ভক্ষণ করেন। পরে সেই মৎস্যের আধার 'মৃতসঞ্চারিণী' কুণ্ডের নিকট পুরী নির্মাণ করিয়া কালীমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে পায়েব আঙুলে আগুন লাগাইয়া ভস্মীভূতদেহ বিক্রমাদিত্য কুণ্ডে পতিত হন এবং পুনর্জীবন লাভ করেন। এইরূপে প্রতিদিন পাঁচ বার হিসাবে সহস্র 'তুসলী' অনুষ্ঠান করিয়া তিনি ভদ্রকালীর কৃপার পাত্র হন এবং দেবীর প্রসাদে পূর্বপাপ হইতে মুক্ত হন ও 'ভট্টবেতাল আদি করি' অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন।

ষষ্ঠ পুত্তলী রক্তাক্ষেব বিবরণ (৩৭খ—৪৪খ) হইতে রাজার সাধনার বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়। বিক্রমাদিত্য দেবপূজায় যথেষ্ট খরচ করিতেন। তাঁহার এক পূজারী ব্রাহ্মণ ছিল। একদিন ব্রাহ্মণ নিজ নামে সঙ্কল্প করায় দেবতা পূজা গ্রহণ করিলেন না এবং স্বপ্নে সে কথা রাজাকে জানাইলেন। পরদিন প্রভাতে রাজা ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া তাহাকে কাজ হইতে বরখাস্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে রাজা বলিলেন—

এক বৃন্তে পাঁচ চাঁপা কনকগঠিত।
আনিবারে পার যদি আমার বিদিত॥
তবে পুনরপি পাবে দেব পূজিবারে। (৩৮খ)

ব্রাহ্মণ রাজনির্দিষ্ট চম্পকের অন্বেষণে দেশদেশান্তর ঘুরিতে ঘুরিতে লোকালয় ছাড়িয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। এক কুমীরের পিঠে চড়িয়া তিনি সেই অরণ্যের নদী পার হইলেন। কিছু দূর যাইয়া তিনি এক আমগাছ দেখিতে পাইলেন। আমগাছ নিজের দৈন্যের কথা প্রকাশ করিয়া রাজার নিকট উহা নিবেদন করিতে ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিল। গাছের দৈন্যের কারণ—গাছের ফল কেহ গ্রহণ করে না। আর কিছু দূর যাইয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ংবরবেশধারিণী পাঁচটি সুন্দরী যুবতী দেখিতে পাইলেন। তাহাদের বর জুটিতেছিল না। তাহারাও তাহাদের দুঃখের কথা রাজাকে জানাইতে বলিল। ছয় মাস এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ব্রাহ্মণ এক 'ঝারা'র নিকট উপস্থিত হইলেন—সেখানে এক বৃন্তে পাঁচটি করিয়া রাজার কথিতমত অসংখ্য কনক-

চাঁপা ভাসিতেছিল। ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া হাজার চাঁপা লইয়া বৎসরান্তে দেশে ফিরিলেন। রাজা কিন্তু সে ফুলে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি গাছ হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে বলিলেন—কারণ, নির্মাল্যপুষ্পে তাঁহার কাজ চলিবে না। কুমীর, আমগাছ ও পঞ্চ যুবতীর কথা শুনিয়া তিনি তাহাদের পূর্বজীবনের কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন—তাহাদের পূর্বজন্মের নিজ নিজ কর্মফলেই তাহাদের বর্তমান দুঃখ। ব্রাহ্মণকে দান ও ব্রাহ্মণ সেবা করিলে তাহারা উদ্ধার পাইতে পারিবে।

অতঃপর ব্রাহ্মণ পুনরায় সেই অরণ্যে গমন করিলেন এবং সরোবরের তীর ধরিয়া চলিতে চলিতে সরোবরের শেষ প্রান্তে এক শিবমন্দির দেখিতে পাইলেন।

কনকনির্মিত শিবলিঙ্গ সেই পুরে।
কঙ্কণের মুণ্ড দেখি ত্রিসক উপরে॥
বিন্দু বিন্দু রক্ত সেই মুণ্ড হইতে ঝরে।
এক বৃন্তে পাঁচ চাঁপা পরে শিবশিরে॥ (৪৩ক)

কঙ্কণের মুণ্ডকে রাজমুণ্ড ভাবিয়া ব্রাহ্মণ নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। পরে দৈববাণীতে আশ্বস্ত হইয়া তিনি চাঁপা লইয়া ফিরিতে লাগিলেন। ফিরিবার পথে কুমীর প্রভৃতিকে উদ্ধার করিয়া আসিলেন। দেশে ফিরিয়া তিনি মুক্তকণ্ঠে রাজার অলৌকিক সাধনার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজাও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ কর্মে পুনরায় নিযুক্ত করিলেন।

সপ্তম পুত্তলী হিঙ্গুলাক্ষ রাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনপ্রাপ্তির ইতিহাস বর্ণন প্রসঙ্গে (৪৫ক-৫৮ক) নেপাল নামক ব্রাহ্মণ রাজা কিরূপে এই সিংহাসন পাইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ দেয়। ইন্দ্র নেপালের সহিত বন্ধুত্ব করিবার অভিলাষে বিশ্বকর্মার দ্বারা এই সুন্দর সিংহাসন প্রস্তুত করান এবং বৈদিক ব্রাহ্মণকুলের রাজা নেপালকে ইহা উপঢৌকন দিয়া তাহার সহিত মিতালি করেন। নেপালের স্ত্রী সুধামুখীর গর্ভজাত মৌনবতী নাম্নী কন্যা পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন—

চারি প্রহর রাত্রেতে বলাব চারি বার।
সেই সে আমার কান্ত কহিলাও সার॥
ধর্মরাজ সাক্ষী করি কন্যা মৌনবতী।
আমারে বলাব যেই সেই মোর পতি॥ (৪৬খ)

রাজার নিমন্ত্রণে নানা দেশ হইতে সহস্র সহস্র রাজকুমার আসিলেন, কিন্তু কেহই রাজকন্যাকে কথা বলাইতে পারিলেন না। ফলে সকলকেই দেবী ভদ্রকালীর সম্মুখে বলি দিয়া দেবীর তৃপ্তি সাধন করা হইল। সুধাকর নামক ভাট কোটালকে ঘুস দিয়া প্রাণে রক্ষা পাইয়া প্রতিজ্ঞা করিল—'যদি সেই কন্যা পাই তবে যাব দেশ'। অতঃপর ভাট নানা রাজার সভায় ঘুরিতে ঘুরিতে কুশাবতী রাজ্যে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইল এবং রাজার নিকট প্রার্থনা করিল—মৌনবতীকে জয় করিয়া তাঁহাকে দিতে হইবে। কালিকার প্রসাদে বিক্রমাদিত্য কর্তৃক মৌনবতীলাভের দীর্ঘ বিবরণ হিঙ্গুলাক্ষ, মকরাক্ষ (৫৮ক—৬২খ), অনল (৬২খ—৭২খ), অনিল (৭২খ—৮৫খ) (৮৫খ—১১৮ক) নামক পুত্তলীর কাহিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। মৌনবতীর সহিত বিবাহে যৌতুক হিসাবে বিক্রমাদিত্য এই সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ছয় মাস পরে দেশে ফিরিয়া রাজা অশেষক্লেশলব্ধ মৌনবতীকে সুধাকর ভাটের হস্তে সমর্পণ করেন।

দ্বাদশ পুত্তলী বকদন্ত যোগিবেশধারী শিব কর্তৃক বিক্রমাদিত্যের ছলনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছে (১ ৮খ প্রভৃতি)। বিক্রমাদিত্য সমাগত যোগীর যথোচিত সমাদর করিলেও যোগিরূপী মহাদেব ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া অধার্মিক রাজার সভা ত্যাগ করেন। বিক্রমের অনুনয়বিনয়ে মহাদেব প্রকৃত ধার্মিক রাজার লক্ষণ ও নাম ব্যক্ত করেন—

তাহারে ধার্মিক বলি সেই ধন্য দেশে।
মর্যাদামস্ত নৃপবর যেই রাজ্যে বৈসে॥
অপরিচয় মৈত্র আর স্ত্রী গোপীনিকা (?)।
সুকোমল তনু ধরে রাজার বালিকা॥
এই চারি জাতি রহে জেই অন্তঃপুরী।
তাহার সভায় পাত্র আমি ভিক্ষা করি॥ (১২০ক—খ)

এই লক্ষণানুসারে প্রকৃত ধার্মিক রাজা বীরবল নামক ভোজ নৃপবর। বীরবলের কন্যা ভানুমতী। এই ধার্মিক নৃপতির প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষভাবে জানিবার উদ্দেশ্যে বিক্রমাদিত্য পাত্রদের উপর রাজ্যের ভার ন্যস্ত করিয়া ভট্ট বেতাল সহ ভোজনগরে উপস্থিত হইলেন এবং প্রথমে অপরিচয়মৈত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ক্ষত্রিয়যুবতী অতঙ্গা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া যায় ও তাঁহার প্রচুর পরিচর্যা করে। সেখান

হইতে রাজা মেধস মুনির কন্যা গণিকা লক্ষহীরার অট্টালিকা দেখিতে পান। লক্ষহীরার প্রতি রাজার গোপন আকর্ষণ বুঝিতে পারিয়া অতঙ্গা লক্ষহীরাকে দেয় শুল্কস্বরূপ লক্ষ মুদ্রা রাজাকে দান করে। মুদ্রা লইয়া লক্ষহীরার গৃহে গিয়া রাজা যখন তাহার সহিত 'হাস্যপরিহাস' করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ এক বানর আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং হীরার অনুরোধে রামায়ণের কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে মহীরাবণের উপাখ্যান বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনী শুনিয়া বিক্রম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং লক্ষ টাকাই বানরকে দান করিলেন। পরদিন অতঙ্গা রাজাকে দুই লক্ষ টাকা দিল। রাজা পুনরায় লক্ষহীরার গৃহে উপস্থিত হইলে শিবের আদেশে এক শুক সেখানে হাজির হইল ও হীরার অনুরোধে মধুকৈটভ বধ প্রভৃতি দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিল। এই বর্ণনা মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী-মাহাত্ম্যাংশ অনুসরণ করিয়া রচিত। দুঃখের বিষয়, পুথি অসমাপ্ত—মহিষাসুরের সেনানীবধ পর্যন্ত ইহাতে আছে।

চোরের পাঁচালি

'চুরিবিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা'—এই প্রসিদ্ধ প্রবাদের দৃষ্টান্ত হিসাবে বহু গল্প বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রচলিত রহিয়াছে। চোরের বুদ্ধির প্রখরতা এই সকল গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই জাতীয় কোন কোন গল্পের সহিত অনেকেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। বাংলার নানা প্রান্তে চুরিবিদ্যার উৎকর্ষ ও চোরের কৃতিত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত কিছু কিছু উপাখ্যান পুস্তক ও পত্রিকা মারফত প্রচারিত হইয়াছে। 'সন্দেশ' নামক অধুনালুপ্ত শিশুদের মাসিকপত্রে 'চোরচক্রবর্ত্তী' নামে এইরূপ একটি উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল। গুরুর নিকট চুরিবিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ করিয়া পাখীর ডানার তলা হইতে পাখীকে না জানাইয়া ডিম চুরি করা, কোনও দ্বীপের রাজাকে পূর্বে সতর্ক করিয়া চুরির উপদ্রবে তাঁহার রাজ্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা প্রভৃতি পরীক্ষায় সর্বথা কৃতকার্যতা লাভ করিয়া চাষীর ছেলে কিরূপে 'চোরচক্রবর্ত্তী' উপাধি ও রাজ্য লাভ করিয়াছিল, তাহার বিবরণ এই উপাখ্যানে আছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তি-প্রণীত 'চোরচূড়ামণি'[১] নামক এক পুস্তকে এক রাজপুত্রের চুরিবিদ্যায় কৃতিত্বের বিবরণ পাওয়া যায়। সমস্ত বিদ্যা অধিগত হইবার পর রাজপুত্র চুরিবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পাখীকে না জানাইয়া তাহার ডানার তলা হইতে ডিম চুরি এবং দেশান্তরের রাজাকে খবর দিয়া তাঁহার কন্যার গলা হইতে বহুমূল্য হার চুরি করা প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সকলকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করেন। যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়-লিখিত 'মজার গল্প' নামক পুস্তকেও চোরের কৃতিত্ববিষয়ক একটি গল্প আছে। চোরের পাঁচালি বা চোরের উপাখ্যান মূলক এক জাতীয় পুস্তক পুরান বাংলা-সাহিত্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ পুরান বাংলায় রচিত এইরূপ একাধিক পাঁচালির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। একখানি পাঁচালি কয়েকবার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার নাম 'চোরচক্রবর্ত্তী'। ১৩১৩ হিজরি বা ১৮৯৫-৬ খ্রীষ্টাব্দের গোলাম মণ্ডলা নামাঙ্কিত মোহরযুক্ত ইহার চতুর্থ সংস্করণের এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-

১। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাসও 'চোরচূড়ামণি' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

পরিষদের পুস্তকালয়ে আছে। ইহার পাতাগুলি তথাকথিত 'মুসলমানী বাংলা পুথি'র মত ডান হইতে বাঁ দিকে সাজান। মূল পুস্তকের রচয়িতা, প্রাপ্তিস্থান ও প্রকাশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে প্রকাশকের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

এই পুস্তকের মুসাবিদাকারক মৃত পশুপতি এবং স্থানে স্থানে বির কাসিস্বর শব্দ লেখা আছে।[২] এই চোরচক্রবর্তীর পুস্তক জেলা বগুড়ার কলুমগাড়ি সাকিনের শ্রীজুত মুন্সি সহরুল্লা ও উক্ত সাহেবের সাগ্রেদ শ্রীমুন্সি জমিরদ্দি আখন্দ সাহেবানদিগের সম্পূর্ণ সাহায্যে ও মেহেরবানিতে ঐ মুসবিদা আমি শ্রীগোলাম মণ্ডলা অনেক পরিশ্রমে ঐ মুসবিদার কাপি সংসোধনপূর্ব্বক এবং স্থানে ২ নিজে রচনা করিয়া নিজ খরচ পত্রে সিবাদহ হাজিপাড়া সাকিনে আমার হবিবি প্রেসে চতুর্থবার ছাপাইয়া প্রকাশ করিলাম।

এই পুস্তকে 'চোরচক্রবর্তী' উপাধিধারী প্রসিদ্ধ চোরের চমকপ্রদ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। এই চোরচক্রবর্তীর কাহিনী অবলম্বনে লিখিত আর একখানি পুস্তকের পুথি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় আছে। দীর্ঘ কাল ধরিয়া নানা প্রসঙ্গে পরিষৎকর্তৃপক্ষ ইহাকে একখানি মূল্যবান্ পুথি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পুথির আলোচ্য বিষয়ের কোনও পরিচয় এ যাবৎ কেহ প্রদান করেন নাই; কি হিসাবে ইহার মূল্য, তাহাও নির্ণীত হয় নাই। বর্তমান প্রবন্ধে এই দুই প্রসঙ্গেরই আলোচনা করা হইবে।

এক প্রসিদ্ধ সুচতুর চোরের চৌর্য কাহিনী বর্ণনাই এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়—ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে পূর্বকথিত মুদ্রিত পুস্তকের সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকিলেও মিল নাই।[৩] এই পুথিতেও বীর কাশীশ্বরের ভণিতা আছে সত্য, তথাপি ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ। বোধ হয়, পুথিতে প্রাপ্ত কাশীশ্বরের

২। কালিকাপ্রসাদে রচে কবি কালিদাসে পৃঃ ৩। বলে বীর কাশীশ্বর সদয় ভগবতী—পৃঃ ১০। বলে বীর কাশীশ্বর দেবীর চরণে—পৃঃ ২০। গোলাম মণ্ডলা কয়—পৃঃ ২৩। বলে বীর কাশীশ্বর কালিকার বরে—পৃঃ ২৮। গোলাম মণ্ডলা বলে—পৃঃ ৭৬।

৩। মাঝে মাঝে দুই এক পংক্তি প্রায় মিলিয়া যায় :—

এক হাতে গুআ পান আর হাতে ঝাড়ি।
স্বামীকে ভেটিতে জায় সাধুর কুমারি। (১৮ খ, পৃঃ ৩১)
অকুলীন ধন হৈলে হয়ত কুলীন।
কুলীন নির্ধন হৈলে হয় বড় হীন। (১৯ ক, পৃঃ ৩২)

গ্রন্থ অবলম্বনে মুদ্রিত গ্রন্থখানি পশুপতিকর্তৃক রচিত ও গোলাম মণ্ডলা কর্তৃক সংস্কৃত হইয়াছিল। পুথির নকলের তারিখ ১১৭২ সাল। দুই পুস্তকেই চোর কালীর উপাসক—মুদ্রিত পুস্তকের মতে কালীর নিকট হইতেই চোর চুরিবিদ্যা শিক্ষা করে (পৃঃ ৩)।[৪] উভয় পুস্তকের বর্ণনীয় বিষয় এক—খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু কিছু পার্থক্য আছে মাত্র। এই সকল পার্থক্যের কথা পুথিখানির বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিম্নে যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। মনে হয়, এক যুগে চোর-চক্রবর্তীর নাম বাংলা দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার কীর্তি-বিষয়ক নানা উপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত উপাখ্যান ও চোরচূড়ামণির উপাখ্যান এই বহুপ্রচলিত বিক্ষিপ্ত উপাখ্যানসমষ্টির অংশবিশেষ বলিয়া মনে হয়। এই উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত এক গ্রন্থের কথা ১২১৩ সনে রাজা পৃথ্বীচন্দ্র-রচিত 'গৌরীমঙ্গল' নামক গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে।[৫] আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের সহিত পৃথ্বীচন্দ্রের উল্লিখিত গ্রন্থ অভিন্ন কি না বলিবার উপায় নাই। বর্তমান অবস্থায় ইহাদের কোনখানিরই রচনা-কাল নির্ণয় করাও সম্ভবপর নহে। তবে এই সমস্ত পুস্তক হইতে দেবতার পাঁচালিপরিপূর্ণ পুরান বাংলা সাহিত্যে এক নূতন ধরণের পাঁচালির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তাই প্রাচীন সাহিত্যামোদীর নিকট ইহার কিছু মূল্য আছে। ইহার একটু বিস্তৃত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল। রূপকথার ইতিহাসের দিক্ হইতেও এই সমস্ত গল্পের মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশে প্রচলিত এই জাতীয় গল্পগুলি সুশৃঙ্খল আলোচনার অভাবে পণ্ডিতসমাজের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাই ব্লুমফীল্ড নামক

৪। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে মহাদেবের পুত্র দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে চৌর্যশাস্ত্রের প্রবর্তক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

৫। চোরচক্রবর্তী কীর্তি ভাষায় রচিল।

বিক্রমাদিত্যের কীর্তি পয়ার করিল।—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৩, পৃঃ ৫০।

এই কবিতায় দুইখানি গ্রন্থের কথা ('চোরচক্রবর্তিকীর্তি' ও 'বিক্রমাদিত্যকীর্তি') উল্লিখিত হইয়াছে মনে হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মনে করেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম সংস্করণের ভূমিকা, পৃঃ ১৩) ইহাতে চোরচক্রবর্তিরচিত বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যানের উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ মার্কিন পণ্ডিত "The art of stealing in Hindu fiction"[৬] নামক বিস্তৃত প্রবন্ধে বাংলা দেশে প্রচলিত উপাখ্যানের বিশেষ বিবরণ প্রদান করেন নাই।

চোরের রীতিনীতি সম্বন্ধে সাধারণকে সচেতন করাই আলোচ্য পুস্তকের উদ্দেশ্য—চোরের প্রশংসা বা চৌর্যের উৎসাহ প্রদান ইহার কাম্য নহে। তাই গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়াছেন,—

চৌরচক্রবর্তিকথা শুনিতে মোধুর।
জে কথা শুনিলে লোক হয় ত চতুর ॥[৭]

চোরের নাম খরবর—পিতা বিজয়নগরের রাজার পাত্র উগ্রসেন, মাতা গুণবতী (পত্র ১ খ, ২ খ)।[৮] কাব্য, জ্যোতিষ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া খরবর 'কৌতুকে শিখিল উত্তম অধম চৌরবিদ্যা' (৩৬ ক)।[৯] অতঃপর, চম্পাবতী নগরীর কর্তৃপক্ষের অত্যাচারে ত্রস্ত হইয়া চোরের দল চোরচক্রবর্তীর নিকট নিজেদের দুঃখের কথা জানাইলে

শুনিঞা প্রতিজ্ঞা কৈল চৌর খরবর ॥
জতেক চোরের মধ্যে আমি নরপতি।
আমা বিদ্যমানে করে এতেক দুর্গতি ॥
শুনিঞা চোরের কথা কোপিল প্রচণ্ড।
চাম্পাবতী পুরীখান করিমু লণ্ডভণ্ড ॥
তবে চৌরচক্রবর্তী নাম সাফল।
চাম্পাবতী পুরীখান করিমু বিকল ॥
নগরিঞা লোক সব করিমু ভিখারী।
কেমতে রাখিবে রাজা আপনার পুরী ॥ (১খ)

৬। *American Journal of Philology*, ৪৪শ খণ্ড, পৃঃ ৯৭-১৩৩, ১৯৩-২২৯।

৭। মুদ্রিত গ্রন্থের মতে 'চোরচক্রবর্তি নাম রহে জার ঘরে। চোরে না দেখিবে চক্ষে তাহার মন্দিরে' (পৃঃ ২)। 'এই পুথি যেই জন ঘরেতে রাখিবে। তার ঘরে চোর চুরি করিতে নারিবে' (পৃঃ ৭৯)।

৮। মুদ্রিত পুস্তকে রাজার নাম রত্নেশ্বর বা বাণেশ্বর, পাত্রের স্ত্রীর নাম কলাবতী, চোরের বাড়ী বিক্রমপুর—'সোনার গ্রাম বিক্রমপুর মোর বাড়ীঘর' (পৃঃ ১১)। পুথিতেও এক স্থানে (৩৬ ক) কলাবতী নাম আছে। এই স্থানে চোরের আসল নামের উল্লেখও আছে—'বাছিঞা রাখিল মোর নাম কৃষ্ণ করি।'

৯। যে চতুঃষষ্টি কলা লোকের নিকট বিশেষ আদর ও সম্মান পাইত, তাহাদের মধ্যে

গোপনে যাওয়া লজ্জার বিষয় মনে করিয়া চোর এক পত্র দ্বারা নিজের প্রতিজ্ঞার কথা প্রথমে রাজাকে জানাইয়া দিল। তার পর চোর 'উর্দ্ধজানু করিঞা' কালীর ধ্যান করিল এবং দেবীর বরে বলীয়ান্ হইয়া প্রত্যূষে যাত্রা করিল। তপস্বীর বেশে চম্পাবতী পুরীতে প্রবেশ করিয়া চৌকিদারের নিকট নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিল—

শিশুকাল হইতে আমি হইলাউ সন্ন্যাস।
অযোধ্যাতে ঘর আমার নাম কৃষ্ণদাস॥
নানাতীর্থ ভ্রমিতে আমি হাবিলাস করি। (৩খ)

তীর্থভ্রমণের দীর্ঘ বিবরণে সন্তুষ্ট না হইয়া চৌকিদার চোরকে রাজার নিকট লইয়া যাইতে চাহিলে চোর কপট ক্রোধের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ভয়ে চৌকিদারও তাহাকে ছাড়িয়া দিল। নগরের মধ্যে রাজার মালীর নিকট প্রকৃত পরিচয় দিয়া চোর তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিল। মালীও তাহাকে অভয় প্রদান করিল—

রাজার প্রসাদে আমি কাকো না ডরাই।
বিশেষে রাজাকে আমি পুষ্প জোগাই॥
মহাসুখে থাক তুমি না ভাবিহ ডর।
নির্ভয়ে থাক তুমি আমার ঘর॥ (৭খ)

চোর তখন তপস্বীর বেশ ত্যাগ করিয়া, সাধু বা সদাগরের বেশ ধারণ করিল।

চুরিবিদ্যারও স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। Two New Lists of Kalas—*Indian Historical Quarterly* (৮।৫৪৭) দ্রষ্টব্য। রাজকুমারেরা অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় চুরিবিদ্যায়ও শিক্ষা লাভ করিতেছেন, এরূপ বর্ণনা দশকুমারচরিত (কালের সংস্করণ, পৃঃ ২২) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই বিদ্যাসম্বন্ধে প্রাচীন যুগে সংস্কৃতে বই লেখা হইয়াছিল। দুই একখানি বইয়ের পুথি এখনও পাওয়া যায়। একখানির নাম ষণ্মুখকল্প, আর একখানির নাম চৌরচর্যা বা চৌর্যস্বরূপ। প্রথমখানির পুথি কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে ও দ্বিতীয়খানির পুথি পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে আছে। কর্ণীসুত বা মূলদেব ছিলেন এই শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থকার। মূলদেব লিখিত কোন বই এখন পাওয়া যায় না। তবে তামিল সাহিত্যে মূলদেবকৃত একখানি চৌর্যশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তিনি নিজেও একজন প্রসিদ্ধ চোর ছিলেন। তাঁহার চুরির গল্পও এক যুগে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার কিছু বিবরণ কথাসরিৎসাগর নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়।

কর্ণের কুণ্ডল খসাঞা মালির হাথে দিল।
বিচারিঞা কেশ মাথে লোটাঞা বান্ধিল॥ (৮ক)

এইরূপ সাধুর বেশ ধারণ করিয়া চোর প্রথম দিন বাজারের গোয়ালিনীকে ঠকাইয়া প্রচুর দধিদ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি করিল—দ্বিতীয় দিন নাপিতকে ঠকাইয়া ক্ষৌরকার্য সমাধা করিল এবং তাঁতীদের ফাঁকি দিয়া বিবিধ মূল্যবান্ বস্ত্র সংগ্রহ করিল। ইহার পর সে নগরের ঘরে ঘরে নিয়মিত চুরি আরম্ভ করিল।

রাত্রি চুরি করে চৌর দিনে যায় নিন্দ।
প্রভাতে উঠিঞা দেখ সর্বঘরে সিন্ধ॥
নগরিঞা লোক কান্দে মাথে হাথ দিঞা।
হায় হায় করে লোক বিকল হইঞা॥ (১৩ ক)

কিন্তু এত সব করিয়াও চোরের মনে তৃপ্তি হইল না—সে রাজগৃহে চুরি করিবার জন্য কালিকার আরাধনা করিতে লাগিল—

নিশিকালী মহাকালী উন্মত্তকালী নাম।
চরণে পড়হু মাতা আইস এই ধাম॥ (১৪ খ)

দেবী বর দিলেন—'যাহ রাজঘরে আমি থাকিব সঙ্গতি' (১৪ খ)। কিন্তু চোরের ধনের আকাঙ্ক্ষা ছিল না—

চোর বোলে ধন লৈঞা আমি কি করিব।
রানি চুরি করি আমি কলঙ্ক থুইব॥ (১৫ ক)

চোর 'রাজার মন্দিরে গিঞা নিদানি ভেজাইল'। সকলে নিদ্রায় অচেতন হইলে

রানিক লইঞা চোর বাহির করিল॥
পথেত যাইতে চোর মোনেত ভাবিলা।
চিড়াকুটির[১০] বাড়ি জাঞা প্রবেশ হৈলা॥
চিড়াকুটির শয্যাতে রানিক থুইঞা।
চিড়াকুটির স্ত্রীকে নিল সঙ্গেত করিঞা॥
ত্বরায় আইল চোর রাজার পুরীতে।
চিড়াকুটির স্ত্রীকে থুইল রাজ্যাতে [রাজার শয্যাতে॥]

নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাজা দেখিলেন—পাশে শুইয়া এক রাক্ষসী। 'গুণী'

১০। মুদ্রিত পুস্তকে চিড়াকুটির স্থানে সূত্রধরের কথা বলা হইয়াছে (পৃঃ ৪৪)।

ডাকা হইল—তাহারা মন্ত্র পড়িয়া রাক্ষসী তাড়াইতে চেষ্টা করিল। এ দিকে চিড়াকুটি ভাবিল—তাহার ঘরে দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাই পাড়াপড়সী সকলে মিলিয়া পূজার আয়োজন করিতে লাগিল। খবর পাইয়া রাজাও আসিলেন এবং তখন সকলে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন।

এবার চোর ঠিক করিল, কোটাল দোসাদুর ঘরে চুরি করিয়া নিজ নামের সার্থকতা প্রতিপাদন করিবে।

তবে চৌরচক্রবর্ত্তী নাম পাড়াব।
জাতিনাশ ধননাশ কোটালের করিব॥ (১৬খ)

দরোয়ানের সহিত কথাপ্রসঙ্গে চোর জানিতে পারিল—কোটালের একমাত্র কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করিয়া সদাগরকুমার বিদ্যাধর দীর্ঘকাল বিদেশে গিয়াছে। কয়েক দিন পরে সদাগরের বেশ ধারণ করিয়া চোর কোটালের বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং কোটালের জামাতা বলিয়া নিজের পরিচয় দিল। ফলে পরম আদর যত্নে সে সেখানে রাত্রি যাপন করিল—লীলাবতী 'যৌবনের মদে পতি না চিহ্নে আপনার' (২০ক)। প্রাতঃকালে কোটাল রাজবাড়ী গেলে চোর রটাইয়া দিল—রাজা কোটালকে বন্দী করিয়াছেন—

হাথেতে বান্ধিঞা রাখিল কারাগারে।
না জানিএ রাজা কিবা করে আরে॥
জাতিপ্রাণ লঞা বুলিল পালাইতে মোরে॥ (২১ক)

সুতরাং চোর কোটালের দুই স্ত্রী, কন্যা, ধনরত্ন লইয়া পলায়ন করিল। এদিকে রাজা চোর ধরিবার কোনও উপায় করিতে না পারিয়া কলাধর নামক সর্বজান বা সর্বজ্ঞকে আনাইলেন। লোক লইয়া কলাধর চোর ধরিবার জন্য যাত্রা করিল।

বেস্ত হঞা জায় চোর স্থান নাই পায়।
পলাইঞা চোর ধোবার ঘাটে জায়॥ (২৪খ)

ঘাটে মনোহর ধোপা কাপড় কাচিতেছিল। চোর তাহাকে বলিল,—'রাজার আদেশে কোটাল তোমাকে কাটিতে আসিতেছে।'

চোর বোলে শুন ধোবা আমার বচন।
জলেত প্রবেশ করি থাকহ এখন॥

এক গোটা পাতিল মুণ্ডের উপর দিঞা।
জলের ভিতরে তুমি থাকহ লুকাঞা ॥ (২৫ ক)

প্রাণের ভয়ে ধোপা চোরের পরামর্শানুযায়ী কাজ করিল—চোর তাহার জায়গায় কাপড় কাচিতে লাগিল। কলাধর এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে ধোপা-বেশী চোর তাহাকে জানাইয়া দিল যে চোর জলের মধ্যে লুকাইয়া আছে। তাহার কথামত রাজার লোকেরা ধোপাকে জলের ভিতর হইতে উঠাইয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। এদিকে চোর ধোপার সমস্ত কাপড় লইয়া পলায়ন করিল।

আসল চোর ধরিতে না পাবায় কোটাল কলাধরকে উপহাস করিতে লাগিল। কলাধরও সাহঙ্কারে বলিল—

তবে মোকে সর্বজান বুলিহ কলাধর।
কালি ধরিঞা দিমু চোর খরবর ॥ (২৭ ক)

এদিকে চোরচক্রবর্তীও চিন্তিত হইয়া চণ্ডী দেবীকে ডাকিতে লাগিল। রাত্রিতে 'গুআপান' ও একখানি কাটারি লইয়া চোর কলাধরেব বাসায় উপস্থিত হইল। অনেক ডাকাডাকিব পর কলাধর জাগরিত হইলে চোর তাহাকে বলিল—'রাজায় গুআপান তোমাকে পাঠাইল।' তখন "গুআপান" গ্রহণ করিবাব জন্য কলাধর হাত বাড়াইবা মাত্র কাটারির এক আঘাতে চোর তাহা দুই খণ্ড করিল। তার পর সেই কাটা হাত লইয়া বাজবাড়ীতে গেল এবং রাজার ঘরে সিঁধ কাটিল। কেহ জাগরিত আছে কি না, দেখিবার জন্য যেই চোর সেই কাটা হাতখানি ঘরেব মধ্যে ঢুকাইয়া দিল, অমনি রাজা তাহার উপর খড়্গাঘাত করিলেন। চোরও কাটা হাত ফেলিয়া পলায়ন করিল। রাজা ভাবিলেন—এইবার চোরকে সনাক্ত করিবার উপায় হইল।

প্রাতঃকালে চোর গণকের বেশ ধারণ করিয়া রাজার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। চোরের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া—

পাজি পুথি এড়ি দৈবক মালসাট মারে।
তবে রুদ্রখড়ি গোসাই বুলিহ আমারে ॥
আমিত ধরিঞা দিব চোরচক্রবর্তি।
নৃপতি বলিল তবে বুজিব তোমার শক্তি ॥ (৩০ক)

তারপর রাজাকে সঙ্গে লইয়া চোর কলাধরের বাসায় উপস্থিত হইয়া বলিল—'এই ঘরে চোর আছে।'

নৃপতির আজ্ঞা পাইয়া সান্তাইল ঘরে।
দেখে শুতিয়া আছে সর্বজান কলাধরে॥
কাটা হাত দেখিঞা সবে বোলে চোর করি।
রাজার সাক্ষাতে লঞা আইলেন ধরি॥ (৩১ক)

রাজা তাহাকে দেখিয়া অনেক তিরস্কার করিলেন এবং তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন। পাইকগণ কলাধরকে বাঁধিয়া লইয়া গেল—নগরের লোকে তাহাকে মনের সুখে প্রহার করিল।

সর্বজানের হাথ টুটা করিল চোরবরে।
নড়িতে না পারে তবে লোকে প্রহার করে॥ (৩৪খ)

ইহা দেখিয়া চোরচক্রবর্তীর মনে দুঃখ হইল এবং রাজার নিকট পূর্বাপর সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। কোটালকে শিক্ষা দেওয়াই যে তাহার উদ্দেশ্যে—চুরি করা যে তাহার উদ্দেশ্য নহে, এ কথা সে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল। কোটালের চোর তাড়াইবার বিপুল আগ্রহকে উপহাস করিয়া সে বলিল—

হেন ছাড় বড়াই করিলে কিসের কারণ।
কন্যা গেল নারী গেল তোমার ব্যর্থ জীবন॥ (৪০খ)

সমস্ত শুনিয়া রাজা সন্তুষ্টচিত্তে চোরের সহিত নিজ কন্যা মালাবতীর বিবাহ দিলেন। চোর কিছু জিনিষ মালাবতীকে দিয়া অপহৃত সমস্ত জিনিষের বাকী অংশ ফিরাইয়া দিল। কোটালের স্ত্রীকন্যাকেও ফিরাইয়া আনিল।

নাগরিকগণ মুক্তকণ্ঠে চোরের প্রশংসা ও কোটালের নিন্দা করিতে লাগিল—

হারাইলে বস্তু সব কেবা দিতে পারে।
ধন্য ধন্য চক্রবর্তী আইল নগরে॥
নগরিঞা লোক বোলে ধন্য নাম থরবর।
বটকের বস্তু না নেহ আপন ঘর॥
অল্প মনিষ্য হঞা কোটাল বড় সাদ।
এমন জনার সনে মরিতে করে বাদ॥
রাজা [র পু] ত্র হইঞা জেবা করে চুরি।
অন্য জন তার সনে নহে বরাবরি॥ (৪১খ)

নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া চোর স্বদেশে গমন করিল। সেখানে ব্রাহ্মণগণকে অনেক টাকা দক্ষিণা দিল এবং সকল চোরকে উপহার প্রদান করিল। তার পর চোরদের উপদেশ দিয়া বলিল—

আপনার সুখে তোমরা জথা তথা জাও।
ব্রাহ্মণ সজ্জন এড়ি চুরি করি খাও ॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন দাতা বৈষ্ণব তিন জন।
ইহার ঘরে চুরি না করিহ কখন ॥ (৪১খ)

———

রেল ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র

বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে বর্তমানে যান-বাহনের নিত্য নূতন পরিবর্তন হইতেছে। এই পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই বিচিত্র ও অচিন্তিতপূর্ব হইলেও বৈচিত্র্যে অভ্যস্ত আধুনিক যুগের মানুষকে তেমন বিস্মিত বা চমকিত করিয়া তুলে না। রেলগাড়ীর প্রথম প্রবর্তনে যখন এই পরিবর্তনের—এই নবীন যুগের প্রথম সূচনা হয় তখন সে যুগের মানুষ সত্যসত্যই বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল। শুনা যায়, ইহাকে জীবন্ত দেবতা মনে করিয়া ইহাকে দর্শন করিবার জন্য—ইহার চরণতলে ভক্তিপূর্ণ উপহার দিবার জন্য আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুদূর পল্লীগ্রামের লোকেরা বাহনহীন এই যানের অতি দ্রুত গমনের বিবরণকে আজগুবি গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা অবশ্য প্রকাশ্যে ইহার নূতনত্ব স্বীকার না করিয়া ইহাকে প্রাচীন নামে অভিহিত করিতে যাইয়া—ইহার সহিত প্রাচীন কালের মত ব্যবহার করিতে যাইয়া অনেক ক্ষেত্রে কৌতূহলপূর্ণ ঘটনার সৃষ্টি করিতেন। একবার কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত নাকি স্টেশনে বসিয়া শাস্ত্রীয় তর্কে নিমগ্ন ছিলেন—যথাসময়ে গাড়ী আসিলেও তাঁহাদের শাস্ত্রচিন্তাব্যাকুল চিত্ত সে দিকে আকৃষ্ট হয় নাই। গাড়ী স্টেশন ছাড়িয়া চলিলে তাঁহাদের চৈতন্য হইল। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে সারথিকে ডাকিতে লাগিলেন—রথ সংযত করিবার জন্য সানুনয়ে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল—তাঁহাদিগকে নিরাশ করিয়া রথ গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। স্টীমার-ঘাটে বসিয়া কয়েকজন পণ্ডিত সন্ধ্যাপূজা করিতেছিলেন—এমন সময় স্টীমার আসিয়া উপস্থিত হইল। কোনওরূপে সংক্ষিপ্ত ভাবে সন্ধ্যাপূজা সারিয়া তাঁহারা স্টীমারে উঠিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন—'হে ইষ্টিমার, তুমি সার্থক-নামা; ইষ্টিকে (যাগ-যজ্ঞ পূজা-অর্চনা) তুমি মারিয়া থাক—সন্ধ্যাপূজায় বাধা দেওয়ার জন্যই তোমার এই নাম।' এই সকল উপাখ্যান কল্পনাবিলাসীর উর্বর মস্তিষ্কের সুফলমাত্র নহে। রেলগাড়ীর প্রথম আবির্ভাব তখনকার সমাজে কিরূপ ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ বিবরণ প্রবীণ বৃদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন পূর্বে 'প্রবাসী' পত্রে প্রদান

করিয়াছেন। সমসাময়িক সাহিত্য হইতেও এইরূপ ভাবের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন বাংলা পুথির বিবরণ সংকলন প্রসঙ্গে এই বিষয়ের একখানি পুথি দেখিবার ও আলোচনা করিবার সুযোগ আমার হইয়াছে। পুথিখানি অত্যন্ত কীটদষ্ট ও জীর্ণ—পাঠোদ্ধার বিশেষ দুরূহ। অন্যান্য বাংলা পুথির মত ইহার লেখাও অতিশয় বর্ণাশুদ্ধ-বহুল। লেখার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিন্দুযুক্ত 'ব', 'এ'স্থলে' 'যে,' 'ও' স্থলে' 'যো', 'যত' 'যে' প্রভৃতি স্থলে 'জত' 'জে' এবং 'ন' ও 'ল' এর সদৃশাকৃতি উল্লেখযোগ্য। পুথির মধ্যে গ্রন্থের বা রচয়িতার নাম নাই। তবে পুথিসংগ্রহের সময় ইহার যে বিবরণ লিখিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা হইতে জানা যায় ইহার নাম রেলপথ-ভ্রমণ-বর্ণনা—গ্রন্থকারের নাম মহানন্দ চক্রবর্তী। এই বিবরণে ইহার বাসস্থান পাকুড় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহানন্দ রচিত 'শ্রীক্ষেত্র-তার্থযাত্রাবর্ণন' নামক বিস্তৃত গ্রন্থের যে পুথি পরিষৎ-পুথিশালায় রহিয়াছে তাহার মধ্যে আধুনিক হাতের লেখা একখণ্ড কাগজে কবির বংশ পরিচয় উল্লিখিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, ইহার যে অংশ বর্তমান রহিয়াছে তাহাতে কবির নাম নাই—কালক্রমে উহা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থ ব্যতীত কবির রচিত আরও দশখানি গ্রন্থের পুথি পরিষৎ-পুথিশালায় রহিয়াছে। পুথিগুলি সমস্তই পাকুড়-রাজধানীর কুমার জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত। এই সংবাদ প্রত্যেক পুথির উপরের বিবরণপত্রে লিখিত আছে। ভাগলপুরের মণীন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কর্তৃক পুথিগুলি পরিষদে প্রদত্ত হইয়াছিল। অধিকাংশ পুথিতেই রচনা বা লেখার তারিখ পাওয়া যায়। সেই তারিখ অনুসারে পুথিগুলির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১। ব্রহ্মপুত্র-গমনবর্ণন। ১২৬৪ সাল, ২৪ বৈশাখ। (পরিষৎ-পুথি সংখ্যা—১৯৬৬)

২। শ্রীক্ষেত্রতীর্থযাত্রাবর্ণন। ১২৬৪, জ্যৈষ্ঠ মাস। (১৯৭০)

৩। স্যমন্তক-মণিহরণ। ১২৬৫, ২৮ ভাদ্র। (১৯৬৮)

৪। স্যমন্তক মণিহরণ। ১২৬৮, ৯ শ্রাবণ। (১৯৬৭)। এই গ্রন্থ এই নামের পূর্বগ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র।

৫। গঙ্গার জন্মবৃত্তান্ত। ১২৭৪, ৪ অগ্রহায়ণ। (১৯৬৩)। গ্রন্থান্তে রচনার তারিখ এইরূপ—

বিরচিল গ্রহ বসু সিন্ধু ইন্দু শকে।
বেদবরে ভানু শশী হয় যার নিকে ॥

চারি খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মাত্র বর্তমান পুথিতে পাওয়া যায়।

৬। খণ্ড রামায়ণ। ইহার আদি, বন ও উত্তর খণ্ডের পুথি পরিষদে আছে। (১৯৬২—৬৪)। ইহাদের তারিখ যথাক্রমে—১২৭৫, ১৫ শ্রাবণ, শুক্রবার; ১২৭৫, ১৫ কার্তিক; ১২৮০, ২০ আশ্বিন, রবিবার, পূর্ণিমা।

গ্রন্থান্তে রচনার তারিখ এইরূপে দেওয়া হইয়াছে—

(১৯৬২)

ফাল্গুনে আরম্ভ শ্রাবণের অর্ধ গতে।
বিরচিল আদি খণ্ড এ তিন মাসেতে ॥
অযোধ্যা কাণ্ডের কথা রচিল বিস্তারি।
কার্তিকের অর্ধ গত সমাপন করি ॥
ইতি সনে পক্ষ শশী সিন্ধু যুক্ত বাণ।
কর্কট অর্ধেক রবির ভৃগু অধিষ্ঠান ॥

(১৯৬৩)

সনে শশীপক্ষ সিন্ধু বাণযুক্ত।
................বারেতে ভার্গব।
গোপিকা মাধব রসরাস পূজা নিশি ॥

(১৯৬৪)

ইতি সন বারশত সাল মিলে রাশি।
.........আশ্বিন কোজাগর পূর্ণমাসী ॥
সমাপ্ত হইল বেলা তৃতীয় প্রহর।
বেদনায় শ্রেষ্ঠ বাবু আছেন কাতর।
ভূপতি বিহীনে রাণী রাজ্য অধিকার ॥

৭। তীর্থযাত্রার নির্ণয় সমস্ত বর্ণন। (১৯৬৫)

৮। পাকুড় রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। (১৯৭২)। শেষোক্ত দুইখানি পুথিতে তারিখ নাই। সর্বশেষখানি কলিকাতায় বসিয়া রচিত (দ্বিজ মহানন্দে রচে কলিকাতায়)।

মহানন্দ আর অন্য কোনও গ্রন্থ লিখিয়াছেন কিনা বলিতে পারা যায় না। তবে উল্লিখিত তালিকা হইতে অনুমান হয় ১২৬৪ সাল হইতে ১২৮০ সাল

পর্যন্ত তিনি প্রায় প্রতি বৎসরই কিছু না কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১২৬৬ সালের ভাদ্র হইতে ১২৭৪ সালের কার্তিক পর্যন্ত ও ১২৭৫ সালের অগ্রহায়ণ হইতে ১২৮০ সালের ভাদ্র পর্যন্ত তারিখের মধ্যে লিখিত তাঁহার কোনও গ্রন্থের পুথি পরিষদে নাই। মনে হয়, ১২৭৫—১২৮০ সালে তিনি রামায়ণের বিভিন্ন খণ্ড রচনায় ব্যস্ত ছিলেন এবং ১২৬৬—১২৭৪ সালেও কোন না গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গঙ্গার জন্মবৃত্তান্ত নামক গ্রন্থের তিন খণ্ডের পুথি পাওয়া যায় নাই। হয়ত তাঁহার রচিত এইরূপ আরও গ্রন্থের পুথিও এখন পর্যন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছে। মহানন্দের রচিত কোনও গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল কি না তাহা বলিতে পারি না।

মহানন্দ একজন মস্ত বড় লেখক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বৃত্তি কি ছিল বলিতে পারা যায় না। তবে তিনি যে নানা কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন এবং অবসরমত গ্রন্থ রচনা করিতেন তাহা তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থের উপসংহার ভাগ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ‘গঙ্গার জন্মবৃত্তান্তের’ শেষে কবি বলিতেছেন—

আষাঢ়ে আরম্ভ অঘ্রাণ চারিদিনে।
সমাপিল পুস্তক ভাবিয়া রাত্র দিনে॥
অবসর মতে ইহা করিল রচন।
শুভদিন পায়া আজি কৈল সমাপন॥

রামায়ণের উত্তরাখণ্ডের শেষেও এইরূপ কথাই পাওয়া যায়—

বিরচিল বচ্ছরেকে অবকাশমতে।

তিনি যে খুব দ্রুত রচনা করিতে পারিতেন তাহাও তাঁহার এই সকল উক্তি ও রচিত গ্রন্থের তালিকা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। দুঃখের বিষয়, বহু-গ্রন্থপ্রণেতা এই কবির পরিচয় সাধারণের অজ্ঞাত—তাঁহার রচিত গ্রন্থের যে পুথি কয়খানি পরিষৎ-পুথিশালায় সযত্নে রক্ষিত হইতেছে তাহাও জীর্ণপ্রায়।

দেশের দুঃখদারিদ্র্যের চিন্তা কবিকে মাঝে মাঝে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। দেশের অনাবৃষ্টি ও অজন্মা তাঁহার কোমল কবিচিত্তকে পীড়িত করিত—ইহার ইঙ্গিত তাঁহার তিনখানি গ্রন্থের উপসংহার হইতে পাওয়া যায়—

স্যমন্তক-মণিহরণ (১৯৬৭)

অবশেষ নাহি ভাষ কেমনে রচিব।
অনাবৃষ্টি হৈল দেশ কিসে রক্ষা পাব॥

খণ্ড রামায়ণ আদি খণ্ড (১৯৬২):—

ঘন না বরিষে ঘন এই······খেদ ॥
অতিমন্দ বরিষণ অনাবৃষ্টি প্রায়।
সবে চিন্তাকুল সে সময়ে বঞ্চয় ॥

খণ্ড রামায়ণ—উত্তরাখণ্ড (১৯৬৪):—

বৃষ্টি বিনে সৃষ্টিনাশ লোকে কষ্ট পায়।
কোথা শস্য উপজিল কোথা কিছু নাই ॥
গ্রামে উপজিল শস্য জল বিনে মরে।
কিঞ্চিৎ হইলে বারি রক্ষা পাইতে পারে ॥
গগনে মেঘের নাহি দেখিয়ে সঞ্চার।
আরম্ভ হইল শীত বৃষ্টি হওয়া ভার ॥
যেছিল সম্বল তাহা হৈল অবশেষ।
এবে কি হইবে তাই ভাবিয়া অশেষ ॥

আলোচ্য গ্রন্থে মোকদ্দমা উপলক্ষে মফস্বল হইতে রেলযোগে কলিকাতায় আগমনের একটী কৌতূহলপূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বিবরণটীর অংশ-বিশেষ এস্থানে উদ্ধৃত হইল। বাংলা ব্যঙ্গরচনার ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর নিদর্শন বর্তমান থাকিলেও ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচ্য বা তজ্জাতীয় গ্রন্থের মূল্য উপেক্ষণীয় নহে। সেই জন্যই অপরিচিত এই ক্ষুদ্র কবির সহিত পরিচয় সাধনের এই প্রয়াস। তার পর রেলপথ প্রবর্তনের সমসময়ের কবির লিখিত এই বিবরণ কল্পনাপ্রসূত হইলেও ইহা নূতন বস্তু দর্শনে তৎকালীন সমাজের বিস্মিত মনোভাবের অকৃত্রিম চিত্র প্রকাশ করিতেছে, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে, ইতিহাসের দিক্ দিয়া ইহার মূল্য যাহাই হউক না কেন, বাঙালি পাঠক ইহা পাঠ করিয়া কথঞ্চিৎ কৌতুক অনুভব করিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

অনেকদিনের আয়োজনের পর অগত্যা কলিকাতা যাওয়া যখন অপরিহার্য তখন 'শুভ' চৈত্র মাসের বিংশ দিবসে—

দশ ঘণ্টা রাত্রিকালে ছাড়িয়া বসতি।
ইষ্টিশানে শক্তিপীঠে করিল বসতি ॥
ধ্যানযোগে বসিয়া থাকিল সর্বজনা।
এক চিত্তে সবে করে বরের প্রার্থনা ॥

বরপত্র পাইলে কামনা সাঙ্গ হয়।
ঘুচয়ে মনের সন্দ ধন্দ দূরে যায়॥
যেইরূপ ভক্তজন চিন্তে চারিভিতে।
হেনকালে জয়ঘণ্টা বাজে আচম্বিতে॥
ঘণ্টারব শুনি তবে য়েকে য়েকে গিয়া।
বরপত্র লইলাম প্রণামি সপিয়া॥
বরপত্র পাইয়া হইল হৃষ্ট মন।
কতক্ষণে দেখা পাব······চরণ॥
ইত্তমধ্যে জয়ঘণ্টা বাজিতে লাগিল।
উত্তর দিকে মহাশব্দ শুনিতে পাইল॥
শব্দ শুনি বোধ হয় কৈলাস হইতে।
শঙ্করী করিয়া দ্বন্দ্ব যান পৃথিবীতে॥

ভক্তগণ যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন তখন

ভক্তের কারণে লয়া শতকে আলয়।
অতি দ্রুত উপনীত আসিয়া তথায়॥
ভক্তগণ সবে উঠে জয় জয় দিয়া।
শিষ্যগণ যায় যত আয়োজন লয়া॥
কেহু কেহু আসি করে চরণ মর্দ্দন।
কেহ পদে তৈল দিয়া শান্তি করে শ্রম॥
কেহু যজ্ঞকাষ্ঠ আনি যোগায় ত্বরিতে।
কেহু শান্তিজল আনি রাখে কলসেতে॥
য়েইরূপ শিষ্যগণ করে ব্যস্ত হইয়া।
আইল প্রধান শিষ্য পুজাদ্রব্য লয়া॥
ভক্তদত্ত প্রণামী করিয়া সমর্পণ।
জোড় করে কয় দেবি করুন মার্জ্জন॥
নানাবিধ স্তব করি করিল সন্তোষ।

দেবী সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলে—

শিষ্যগণ কয় মোরা য়েই বর চাই।
আজন্মাবধি যেন থাকিয়ে সেবায়॥

চরণের ধ্বনি যেন সদা কর্ণে পড়ে।
পাদপদ্মতলে যেন কেহ নাহি পড়ে॥
তব পদ প্রাপ্তি মাত্র মোক্ষ সেই জন।
য়েকবারে ঘুচে তার পৃথিবীভ্রমণ॥
মোক্ষ হৈলে পুন কী আর হেরিব চরণ
অতএব পাদপদ্মে নাহি প্রয়োজন॥
আজন্ম করিয়া সেবা এই বাঞ্ছা করি।
······এই শত পদধ্বনি অধিকারী॥
আমরা সেবকজন নিত্য সেবা করি।
ভক্তগণে মুক্তি দেহ বাঞ্ছা পূর্ণ করি॥
তথাস্তু বলিয়া শিষ্যে বর দিলা দান।
আজ্ঞা হৈল ভক্তবৃন্দ হউক অধিষ্ঠান॥
আজ্ঞা পায়া ভক্তগণ পুলকিত হৈল।
মহাধামে সশরীরে শরীর মিশাইল॥
পুণ্যবান্‌গণ সদা যায় স্বর্গবাসে।
বাজায় স্বর্গের ঘণ্টা পরম হরিষে॥
সেইরূপ শরীরে হইতে অধিষ্ঠান।
শিষ্যগণ ঘণ্টারব করে অবিশ্রাম॥

ঘণ্টা বাজাইয়া তারা দিল বিসর্জন।
মহাশব্দ করি পুন করিল গমন॥
পাশ হইতে নদনদী নগর এড়াইয়া।
স্থকিত চকিত মাত্র পীঠস্থান পায়া॥
নিয়ম হইলে পূর্ণ ভক্তগণ যায়।
বরপত্র ফেলি দিয়া প্রধানের পায়॥
পুণ্যক্ষয় হৈলে যেমন ঘুচে স্বর্গবাসে।
পুনর্বার জন্ম হয় ভূমণ্ডলে যেসে॥
···মুক্তি পদ বাঞ্ছা করে ভক্তগণ।
পুনর্জন্ম হৈলে করি দেবতা অর্চন॥

নির্বাণ হইলে আর জন্ম নাই হয়।
যেমন মেঘের বারি মেঘেতে মিশায় ॥
সেইরূপ দেখি লোক শকটেতে যায়।
পদতলে পড়িলে নির্বাণ মুক্তি পায় ॥
জন্ম নাই হয় তার···ভূমণ্ডলে।
ভূতযোনি প্রাপ্তি হয়া ফিরে নানাস্থলে ॥
নিয়ম হইলে পূর্ণ মুক্ত হয়া যায়।
কেহ বা প্রণামি দিয়া শরীরে মিশায় ॥
পীঠস্থানে যাইতে সে মহাধমে হয়।
কেহ বা বসিয়া ধ্যানযোগে চলি যায় ॥
যেমন নিশায় যায় নিশাচর পাখী।
অন্ধকারে······না নিরখি ॥
·· যাইতে থেস্ত পায় নিশীশ্বর।
প্রহরেকে বর্ধমান এড়াই সত্বর ॥
বহু ভক্তগণ তথা মুক্ত পায়া যায়।
কেহ বা প্রদান দিয়া শরীরে মিশায় ॥
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি ছুটিল দুর্জয়।
যেমন বৃহৎ অশ্ব রজ্জু ছিড়ে ধায় ॥
ভাদ্রপদমাসে যেন নদী বেগমান্।
সেইরূপ যায় নাই করয়ে বিশ্রাম ॥
বৈদ্যবাটী ফরাসডাঙ্গা শ্রীরামপুর এড়ায়।
দশ ঘণ্টা সময়েতে গেলাম হাবড়ায় ॥
পীঠস্থান মধ্যে গিয়া স্থকিত হইল।
যেন চণ্ডীমণ্ডপেতে প্রতিমা বসিল ॥
চারিদিক্ হইতে ধাইল শিষ্যগণ।
একে একে ভক্তগণে করিলো মোচন ॥
বরপত্র হস্তে দিয়া লইল বিদাই।
গোলোকের সঙ্গে যেন গোলোকধামে যাই ॥
কিছু দূর গিয়া দেখি ক্ষুদ্র কাষ্ঠের মন্দির।
তার মধ্যে একজন স্থাপয়ে সুস্থির ॥

তারপর স্টীমার যোগে গঙ্গা পার হইয়া স্বর্গসদৃশ কলিকাতায় পদার্পণ এবং এইখানেই গ্রন্থসমাপ্তি। প্রসঙ্গক্রমে কবি স্টীমার সম্বন্ধে দুই কথা বলিতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিতেছেন—

ঐ দেখ বৈসে আছে ইষ্টিমার বিল।
স্বর্গের দুয়ারে যেন বৈসে শঙ্খচিল॥
যেক পএসা প্রণামী পি……
ইষ্টিমারে পার হয়া হও অব্যাহতি॥
………………………………
………………………………
যেত ভাবি ইষ্টিমারে গঙ্গা হয়া পার।
তপনের তাপ দাপে শরীর কাতর॥
তাহে দুপ্রহর দিবা হইল গগনে।
ছায়া পায়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দুজনে॥

বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মুসলমানী রূপ

সম্প্রতি পল্লীসাহিত্যপ্রচারনিষ্ঠ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সাহেব 'শিরণী' এই নাম দিয়া পাবনা অঞ্চলে প্রচলিত একটি মুসলমানী রূপকথা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন।* গল্পটির নাম বোধ হয় 'দরজীর শাস্তর'। সংক্ষেপে গল্পটি এইরূপ :—

এক দরজী এক বাদশাহের নিকট হইতে পাঁচশত টাকা মজুরী লইয়া একটি সূতার ময়ূর তৈয়ার করিল। 'সতী মার সতী ব্যাটা' পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে ময়ূর উড়িতে পারিবে—দরজী এইরূপ বলিলে বাদশাহ সতীর পুত্রের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু সতীপুত্র পাওয়া গেল না। তখন বাদশাহের সদ্যোবিবাহিত পত্নী সোনালু বিবির গর্ভজাত সাত দিন মাত্র বয়সের রহিমকেই অগত্যা সেই ময়ূরের পিঠে চড়ান হইল। দরজীর অলৌকিক ক্ষমতার বলে ময়ূর উড়িতে উড়িতে বহু উর্ধ্বে উঠিয়া গেল।

---

* শিরণী। দরজীর শাস্তর।—অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, এম-এ সংগৃহীত। কলিকাতা, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, পনের কলেজ স্কোয়ার; দাম বারো আনা। রয়্যাল—/•—।৷৵০ + ১ —৪২।

গ্রাম্য কৃষক যে ভাষায় এই রূপকথার আবৃত্তি করিয়াছে, সংগ্রাহক মহাশয় তাঁহার পুস্তকে সেই ভাষার পরিবর্তন না করিয়া ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকারীদিগের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সাধারণ পাঠকও ভূমিকায় নির্দিষ্ট কতিপয় প্রাদেশিক শব্দের ব্যাখ্যার সাহায্যে ইহা পড়িয়া আমোদ পাইবেন সন্দেহ নাই। পুস্তকখানির মুদ্রণভঙ্গীর একটি বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। আরবী ফারসী উর্দুর ধরনে বইখানি পড়িতে হয় ডান দিক হইতে বাম দিকে। এরূপভাবে বাংলা বই ছাপান অবশ্য এই প্রথম নহে—মুসলমানী বাংলায় লেখা বহু গ্রন্থ এইরূপ ভাবে মুদ্রিত হইয়া মুসলমান সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। তবে সে সব বই কেবল মুসলমান সমাজের মধ্যেই চলে—সাধারণ বাঙালির নিকট তাহা আদৌ পরিচিত নহে। অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন সাহেব বাংলা সাহিত্যে সাধারণ ভাবে এই রীতি প্রবর্তন করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ ভাবে পুস্তকখানি ছাপিয়াছেন কি-না তাহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই। ভূমিকায় তিনি এই মুদ্রণরীতি সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। মনসুর উদ্দীন সাহেবের মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ যে সকল আধুনিক মুসলমান সাহিত্যিকের লেখসম্ভারে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে তাঁহাদের মধ্যে অন্য কেহ তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থে এরূপ রীতি অনুবর্তন করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

দরজীর নিষেধসত্ত্বেও বাদশাহ তাহাকে আরও উপরে উঠাইতে বলিলেন। ক্রমে ময়ূর চক্ষুর অগোচর হইয়া গেল। তখন তাহাকে নীচে নামান দরজীর ক্ষমতার বাহিরে। তাই দরজী আর তাহাকে নামাইতে পারিল না।

সাতদিন পরে সমুদ্রের ওপারে ময়ূর নামিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে—রহিমকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক ফুলবাগানে রাত্রি কাটাইতে হইল। পরদিন দেখা গেল—অনেকদিনের মরা বাগানে ফুল ফুটিয়াছে। মালিনী সকালে ফুল তুলিতে গিয়া রহিমকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। রহিম তাহাকে 'মাসী' বলিয়া ডাকিল—নিজেকে তাহার বোনপো বলিয়া পরিচয় দিল এবং তাহারই কুটীরে আশ্রয় লইল। মালিনী বাদশাহের বাড়ি ফুল জোগাইত। বাদশাহ, তাঁহার স্ত্রী, উজীর এবং 'তোলাপতি' কন্যা—এই চারজনকে সে মালা দিত। এক দিন মাসীকে অনুরোধ করিয়া রহিম মালা গাঁথিবার ভার লইল এবং তোলাপতি কন্যার মালা বিনা সূতায় গাঁথিয়া উহার উপর নিজের নাম লিখিয়া দিল। কন্যা মালা দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং মালিনীকে ধামা ভরিয়া 'জিলাপী, মণ্ডা, সন্দেশ ইত্যাদি অনেক দিল।' মালিনীর বাড়ীতে নূতন কেহ আসিয়াছে কি না জানিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করায় অগত্যা মালিনী বলিল যে তাহার একটি বোনঝি আসিয়াছে। কন্যার অনুরোধে মালিনী তাহাকে বোনঝিটি দেখাইতে স্বীকৃত হইল। ইতিমধ্যে একদিন রহিম ময়ূরে আরোহণ করিয়া বাদশাহের বাড়ি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া আসিল।

নির্দিষ্ট দিনে মনোহর স্ত্রীবেশে সজ্জিত হইয়া রহিম মালিনীর সহিত তোলাপতির অন্দরমহলে প্রবেশ করিল এবং তাহার খাটের নীচে বসিয়া রহিল। যথাসময়ে উভয়ে সাক্ষাৎ হইল। তোলাপতির বহু অনুরোধেও কিন্তু মালিনী তাহার বোনঝিকে বাদশাহের বাড়িতে রাখিয়া যাইতে রাজী হইল না।

ইহার পর রহিম ময়ূরে চড়িয়া তোলাপতির অন্দরে যাওয়া আসা করিতে লাগিল। ক্রমে তোলাপতির গর্ভসঞ্চার হইল। তাহাকে প্রতিদিন ওজন করা হইত—তোলাদারের কাছে তাহার ওজনবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া বাদশাহ চোর ধরিবার জন্য কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন। তোলাপতি ওজনবৃদ্ধি বিষয়ে বলিল—খাওয়া বেশী হওয়ায় এবং টক খাওয়ায় শ্লেষ্মার জন্য তাহার শরীর ভার হইয়াছে।

পাহারাদার চোর ধরিবার জন্য নূতন রকম মতলব আঁটিয়া বাদশাহের দ্বারা হুকুম দেওয়াইল—রাত্রিতে কোন ধোপা কাপড় কাচিতে পারিবে না। তারপর সে এক মণ তেল ও এক মণ সিন্দুর লইয়া তোলাপতি কন্যার মহলের সমস্ত জায়গায় মাখাইয়া দিল।

রহিম রাত্রিতে যখন থাম বাহিয়া তোলাপতির মহলে নামিল তখন তাহার সমস্ত কাপড়-চোপড় সিন্দুরে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ ধোপাবাড়ি গিয়া ধোপা এবং তাহার স্ত্রীকে সেই রাত্রেই তাহার কাপড় কাচিয়া দিবার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করিল এবং পাঁচশত টাকা বক্‌শিস দিতেও রাজী হইল। অনেক কথা কাটাকাটির পর অর্থলোলুপ ধোপা স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে অগত্যা কাপড় কাচিতে লাগিল। কাপড় কাচার শব্দ শুনিয়া কোতোয়াল আসিয়া তখনই তাহাকে ধরিল। রহিম কাছেই বসিয়াছিল। তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল।

বাদশাহের হুকুমে জল্লাদ রহিমকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া বধ্যস্থানে লইয়া গেল। তোলাপতি তেতলার ছাদে ছুরি হাতে দাঁড়াইয়া রহিল এবং রহিমের মৃত্যুসংবাদ পাইলেই সে আত্মহত্যা করিবে এইরূপ সঙ্কল্প করিল।

এদিকে জল্লাদেরা রহিমের অদ্ভুত ময়ূরের কথা শুনিয়া তাহার উপর চড়িয়া দেখিল এবং রহিমকে একবার চড়িতে অনুরোধ করিল। এই অবসরে রাহম ময়ূরে চড়িয়া উপরে উঠিয়া গেল এবং ময়ূরের পাখার আঘাতে বাদশাহের বাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। তখন বাদশাহ কন্যার উপদেশানুসারে গলবস্ত্র হইয়া যুক্তকরে ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—'তুমি যে দেবতা হও, আমার দোষ ক্ষমা কর। আমি তোমার নিকট কন্যার বিবাহ দিব।'

এই কথা শুনিয়া রহিম তখনই ময়ূর লইয়া নামিয়া আসিল। বাদশাহ ভাল দিন দেখিয়া তাহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন। পরে যখন জানিতে পারিলেন যে রহিমও বাদশাহের ছেলে তখন তিনি খুবই সন্তুষ্ট হইলেন।

এইখানেই গল্পের প্রথম অংশ শেষ। তোলাপতির সহিত বিবাহের পর কিছুদিন সুখে কাটাইয়া এবং কয়েকটি পুত্র লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবার পথে রহিম ও তাহার স্ত্রীপুত্রদিগকে নানাস্থানে কিরূপে নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল পরবর্তী অংশে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

আমরা এই প্রবন্ধে গল্পের পূর্বাংশ লইয়াই আলোচনা করিব। এই অংশের সহিত বাংলা দেশে সুপরিচিত বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যানের অনেকাংশে যে সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান নানাস্থানে নানা আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপাখ্যানের এবং এজাতীয় অন্যান্য উপাখ্যানের বিভিন্ন রূপের পরিচয় আমি অন্যত্র দিয়াছি।[১] আলোচ্য গল্পে আমরা এই উপাখ্যানের আর একটি রূপ পাইতেছি বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের আদিরূপ কি, ইহার মূল উৎস কোথায় এবং এজাতীয় অন্যান্য উপাখ্যানের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি, এই সব বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনার অবকাশ আছে। তাই এই গল্পটির দিকে সাহিত্যিকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য। এই গল্পে বিদ্যা অথবা সুন্দরের নাম নাই সত্য, তবে ইহা যে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের অনুরূপ তাহা অস্বীকার করা চলে না।[২] সুন্দর বিনা সূতায় মালা গাঁথিয়া এবং সেই মালার মধ্যে নিজ পরিচয়-শ্লোক লিখিয়া মালিনী মাসীর মারফত রাজবাড়িতে বিদ্যার নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। এখানে রহিমের তোলাপতির নিকট মালা প্রেরণ তাহার অনুরূপ। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে সুন্দর শুকপক্ষীর সাহায্যে বিদ্যার বাড়ির অনেক খবর সংগ্রহ করিয়াছিল—এই গল্পে রহিম ময়ূরের সাহায্যে নিজেই তোলাপতির বাড়ির সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে। বিদ্যা ও সুন্দরের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় স্নানের ঘাটে—এখানে রহিম ও তোলাপতির প্রথম সাক্ষাৎ তোলাপতির বাড়িতেই হয়। দুই গল্পের পার্থক্য এই যে, সাক্ষাৎকারের সময় রূপকথার নায়ক স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়াছিল এবং এই সাক্ষাৎকারের সময় পরস্পরের কোনও আলাপ হওয়ার ইঙ্গিত রূপকথায় নাই। বিদ্যাসুন্দরের মিলন কতকগুলি উপাখ্যানের মতে সুরঙ্গপথে হইত, রূপকথার নায়ক নায়িকার মিলন হইত আকাশপথে। রূপকথার ন্যায় বিদ্যাসুন্দরের কোন কোন উপাখ্যানে সিন্দূরের সাহায্যে চোরকে ধরিবার কথা পাওয়া যায়। তবে

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৩৫, পৃঃ ৫১ প্রভৃতি। কালিকামঙ্গল (সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী সং ৭৯)—ভূমিকা (পৃ. ৵৹—৸৹)

২। আশ্চর্যের বিষয় অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন সাহেবের চোখে এই সাদৃশ্য আদৌ ধরা পড়ে নাই। তিনি 'শিরণী'র ভূমিকায় এই গল্পের সহিত Enchanted Horse নামক আরবীয় গল্পের যে কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানে দেখিতে পাই যে, চোর বিদ্যার ঘরেই ধরা পড়িয়াছিল—রূপকথায় কিন্তু দেখি চোর ধরা পড়িল ধোপার বাড়িতে। রূপকথার বাদশাহ নায়কের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মরক্ষার জন্য একরূপ বাধ্য হইয়াই নিজ কন্যার সহিত নায়কের বিবাহ দিয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানে কিন্তু এরূপ বাধ্যতার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং সুন্দরের প্রেমের গভীরতা ও গুণবত্তায় রাজা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন এরূপ ইঙ্গিতই বিদ্যাসুন্দরের কোন কোন উপাখ্যানে পাওয়া যায়।

সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে এই যে বাংলায় বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানগুলিতে ধর্মপ্রচারের যে ভাব স্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছে রূপকথায় তাহার কোনও উল্লেখ নাই। ধর্মপ্রসঙ্গবর্জ্জিত এই রূপকথা বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানগুলির মূল ভিত্তি, কি বিদ্যাসুন্দরের প্রচলিত উপাখ্যান অবলম্বনে এই রূপকথা পরিকল্পিত তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে এমন হওয়া আশ্চর্য নয় যে, প্রথমে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ধর্মপ্রসঙ্গবর্জিত বিশুদ্ধ প্রেমের কথামাত্র ছিল। কালক্রমে এই কথার মধ্য দিয়াই নানা দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার করিবার চেষ্টা করা হইতে লাগিল।

এই গল্প বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মূল হউক বা না হউক কাশীনাথের বিদ্যাবিলাপ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের মত ইহাতে সুড়ঙ্গের উল্লেখ না থাকায় ইহাকে প্রাচীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে ইহা কতদিনের পুরাতন তাহা নির্দিষ্টভাবে বলিবার উপযোগী কোনও প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন[১]—'বহু প্রাচীন ফার্সীতে রচিত একখানি প্রাচীন বিদ্যাসুন্দর আমরা দেখিয়াছি।' এই ফার্সী গ্রন্থ ঠিক কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল এবং তাহার সহিত বর্তমান রূপকথার কোনও সম্পর্ক আছে কি-না তাহা বলিতে পারা যায় না। মোটের উপর বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানমূলক বিস্তৃত সাহিত্য-রাজ্যে এই রূপকথা কোন্ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই রূপকথা এবং দীনেশবাবুর উল্লিখিত ফার্সী বিদ্যাসুন্দরের সময় নিরূপণের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা সাহিত্যিকগণকে—বিশেষতঃ মুসলমান সাহিত্যিকবর্গকে—অনুরোধ করি। বিদ্যাসুন্দরের ফার্সী গল্পটি প্রচার করাও দরকার।

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (পঞ্চম সংস্করণ)—পৃঃ ৪৭৭।

বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের প্রথম পরিকল্পনা ভারতচন্দ্র করেন নাই। তাঁহার পূর্বে কঙ্ক, কৃষ্ণরাম, কবিশেখর প্রভৃতি একাধিক কবি এই উপাখ্যান অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র এই উপাখ্যানকে সাধারণের নিকট বিশেষ ভাবে প্রচারিত ও আদৃত করিয়াছিলেন মাত্র। এই সর্বজনসমাদৃত উপাখ্যানের মূল উৎস এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত রূপকথার মত কোন সর্বজনপ্রচলিত রূপকথার মধ্যেই হয় ত একদিন উহা আবিষ্কৃত হইবে। সকল দেশের রূপকথাই কালক্রমে সাহিত্যের ভিত্তিবন্ধন করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের রূপকথা এখনও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আগ্রহের সহিত আলোচিত হয় নাই।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ

বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলি যখন সাহিত্যের আসরে নিজেদের আসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা করিতেছিল, তখন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাদের ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ফলে কিছুদিনের জন্য নবজাত প্রাদেশিক সাহিত্য অভিজাতসমাজে কোনও স্থান পায় নাই। প্রাদেশিক ভাষার কোন কোন গ্রন্থকে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া বা সংস্কৃতের সাহায্যে তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে ভদ্রসমাজে প্রবেশ করিবার পথ করিতে হইতেছিল। অনেক স্থলে ভাষাগুলির সম্মানবৃদ্ধির জন্য সংস্কৃত ভাষায় তাহাদেব ব্যাকরণ রচনা করা হইতেছিল।[১] এই সকল গ্রন্থে কৃত্রিমতার পরিচয় যথেষ্ট ছিল সত্য ; কিন্তু প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতির ইতিহাসে প্রথম সোপান হিসাবে এগুলির মূল্য বড় কম নয়।

কিন্তু এরূপ অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। কালক্রমে ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া গেল—প্রাদেশিক সাহিত্য নিজের আসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল না—সংস্কৃতের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যও সে অধিকার করিতে উদ্যত হইল। প্রাদেশিক সাহিত্যের গ্রন্থ সংস্কৃতে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত না হইয়া তাহার বিপরীত কার্য হইতে লাগিল। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়া করিবার সূচনা দেখা গেল। অবশ্য সর্বপ্রথম এই কার্যের সূত্রপাত হইল—পুবাণেব মধ্য দিয়া। পুরাণের আদর চিরকালই জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে বর্তমান ছিল। দেবমন্দিরাদিতে সাধারণের সমক্ষে পুরাণ পাঠ বা তাহার ব্যাখ্যা বহু দিন হইতে ভারতে ও বৃহত্তর ভারতে চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কালে সংস্কৃত ভাষা একেবারে দুরধিগম্য না হইয়া পড়ার জন্যই হউক বা কারণান্তরবশতই হউক, সাধারণে ইহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিত বলিয়া মনে হয়। কালক্রমে জ্ঞানস্পৃহাবৃদ্ধি ও

১। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (১৯২৮, পৃঃ ৪৬৩-৪৭২) মল্লিখিত Sanskrit Works Pertaining to Vernacular and Exotic Culture প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রাদেশিক সাহিত্যের পরিপুষ্টির সঙ্গে এই সকল সর্বজনসমাদৃত গ্রন্থের পূর্ণ পরিচয় নিজ নিজ ভাষার মধ্য দিয়া লাভ করিবার প্রবল আগ্রহ সকলের হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠিল। ফলে, রামায়ণ, মহাভারত ও নানা পুরাণ পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হইতে লাগিল। অবশ্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাতে সংস্কৃত ভাষার ভাবী অনাদরের আশঙ্কা করিয়া এইরূপ অনুবাদ কার্যকে প্রবল ভাবে নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলিলেন,—

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥

কিন্তু এ ভীতি প্রদর্শন নিষ্ফল হইল। প্রাদেশিক সাহিত্যের স্বাভাবিক পরিপুষ্টি কেহ রুদ্ধ কবিতে পারিলেন না। বস্তুতঃ, পুরাণের অনুবাদ বা পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত নানা গ্রন্থই প্রাদেশিক সাহিত্যসমূহের মূল ভিত্তি হইয়া উঠিল। তবে কালক্রমে কেবল পূরাণ নহে, অন্যান্য শাস্ত্রও প্রাদেশিক ভাষায় অনুদিত বা ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। নীলকণ্ঠ প্রভৃতি তান্ত্রিক গ্রন্থকারগণ প্রাদেশিক ভাষায় রচিত মন্ত্রের প্রামাণ্য মানিয়া লইয়া প্রাদেশিক সাহিত্যের গৌরব বাড়াইয়া দিলেন। প্রাদেশিক ভাষার পুষ্টির ফলে সংস্কৃত ভাষালোচনায় শৈথিল্য এবং সংস্কৃত-সাহিত্যে সাধারণের অনভিজ্ঞতাই এইরূপ অবস্থা আনয়নের কারণ হইতে পারে। সাধারণ লোক যে সকল শাস্ত্র আলোচনা করিত, বিশেষ পরিশ্রম না করিয়া—সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার নিদারুণ ক্লেশ স্বীকার না করিয়া যাহাতে তাহারা সেই সমস্ত শাস্ত্রের স্থূল মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এ জন্য নানা গ্রন্থ প্রাদেশিক ভাষায় প্রণীত হইতে লাগিল। বিবিধ বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচিত হওয়ায় স্বল্পপ্রসার প্রাদেশিক সাহিত্যগুলি যে প্রভূত পরিপুষ্টি লাভ করিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ লোককে বিভিন্ন শাস্ত্রের মূল তত্ত্বগুলির সহিত পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যেই এই সকল গ্রন্থ লিখিত হয়। সংস্কৃতের অনুবাদ বলিয়া এই সকল গ্রন্থের ভাষা একটু সংস্কৃতভাবাপন্ন তথাকথিত পণ্ডিতী বাংলা। তবে কোন গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা এ সমস্ত পুস্তকে নাই—সাধারণ লোকের বাহিরে পণ্ডিতসমাজে ইহাদের বিশেষ আদর ছিল না।

অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সময়েই চীনা, তিব্বতী, আরবী, কবি প্রভৃতি বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষায় ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসমূহ অনূদিত হইতে থাকে। নানা

পত্র-পত্রিকায় তাহাদের আলোচনা বিশেষ কৌতুকপ্রদ ও মূল্যবান্। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সময়ে বিদেশী জাতিসমূহ ভারতের শাস্ত্রগ্রন্থ-নিচয় আগ্রহসহকারে অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইল, সে সময় ভারতবর্ষে জনসাধারণের মধ্যে প্রাদেশিক সাহিত্যের ভিতর দিয়া সংস্কৃতে নিবদ্ধ নিগূঢ় তথ্যসমূহের প্রচারের তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও চেষ্টা হয় নাই। সুশৃঙ্খল ভাবে এই চেষ্টার সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুদ্রাযন্ত্র প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে। তাহার পূর্বে বিক্ষিপ্তভাবে নানা স্থানে বিভিন্ন ভাষায় কিছু কিছু প্রাথমিক প্রযত্নের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। এই প্রযত্ন বিক্ষিপ্ত হইলেও ইহা পরবর্তী সুসম্বদ্ধ চেষ্টার মূলীভূত এবং আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। আমরা এই প্রবন্ধে সেই সকল প্রযত্নের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এ জাতীয় গ্রন্থ কত অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহার পরিচয় লঙ্ সাহেবের প্রস্তুত তৎকালীন মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা ও সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নামক পুস্তকের 'সাহিত্য' অংশ হইতে পাওয়া যাইবে। এই সকল গ্রন্থে অনুল্লিখিত উনবিংশ শতাব্দীর দুই চারিখানি পুস্তকমাত্র বর্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে।

ঠিক কোন্ সময় হইতে প্রাদেশিক ভাষায় এ জাতীয় গ্রন্থ রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে ১৮২৮ শক বা ১২১৩ বঙ্গাব্দে রচিত পৃথ্বীচন্দ্রকৃত 'গৌরীমঙ্গল' গ্রন্থ[২] হইতে জানা যায় যে, পৃথ্বীচন্দ্রের বহু পূর্ব হইতেই বাংলায় এ জাতীয় গ্রন্থ রচনার প্রচলন হয় এবং তাঁহার সময়ে ইহাদের বহুল প্রচলন ছিল। তিনি লিখিয়াছেন :—

অনেক পুরাণ উপপুরাণ হইল।
দ্বাপরে মনুষ্যগণ ধারণে নারিল ॥
স্মৃতি করি মুনিগণ সংগ্রহ করিল।
কলিযুগে তাহা লোকে বুঝা ভার হইল ॥
মতে ভাষা আশা করি কৈল কবিগণ।
স্মৃতি ভাষা কৈল রাধাবল্লভ শর্ম্মন ॥
বৈদ্যক করিয়া ভাষা শিখে বৈদ্যগণে।
জ্যোতিষ করিয়া ভাষা শিখে সর্ব্বজনে ॥

২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১৩০৩, পৃঃ ৫০)

বিভিন্ন বিভাগে রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে বিষয়ানুক্রমে দেওয়া যাইতেছে।

পুরাণ

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ভাষাতেই বোধ হয় সর্বপ্রথম নানা পুরাণের অনুবাদের সূত্রপাত হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কানাড়ী ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারত অনূদিত হয়। একাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে তেলেগু ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতের কয়েকখানি অনুবাদ হয়। কানাড়ী ভাষায় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদ হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতেই তামিল ভাষায় মহাভারত প্রচারিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কেণ্ডেয়-পুরাণ তেলেগু ভাষায় অনূদিত হয়। বিষ্ণুপুরাণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কানাড়ীতে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে তেলুগুতে অনূদিত হয়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে তেলেগুভাষায় কূর্ম, মৎস্য, বরাহ, পদ্ম ও ভাগবত পুরাণ এবং স্কন্দপুরাণের অংশবিশেষের অনুবাদ হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে তামিলভাষায় লিঙ্গ ও কূর্ম-পুরাণ অনূদিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে মালয়ালম্ ভাষায় ভাগবত, ব্রহ্মাণ্ড ও শিবপুরাণের অনুবাদ হয়।[৩]

বাংলা ভাষায়ও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পুরাণ নানা ব্যক্তির দ্বারা অনূদিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে কৃত্তিবাস, কাশীদাস প্রভৃতি বিভিন্ন কবি নানা পুরাণের অনুবাদ বা পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

তন্ত্র

মধ্যযুগে তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনা সমগ্র ভারতে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। তান্ত্রিক সাধনার মূল তত্ত্বগুলি জানিবার এবং তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে অন্ততঃ কিছু দূর অগ্রসর হইবার প্রবল আগ্রহ অনেকেরই ছিল। তাহারই ফলে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তন্ত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু গ্রন্থ রচিত হয়।

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কামরত্ন তন্ত্রের ও সাত্বত তন্ত্রের অসমীয়া অনুবাদ,

৩। Farquhar—Outlines of the Religious Literature of India—পৃঃ ৩৬৬, ৩৭২।

কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন ও কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ শৈবগ্রন্থ লল্লাবাক্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কামরত্ন তন্ত্রের অসমীয়া অনুবাদ গ্রন্থ অনুমান তিন শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। ইহা আসামের প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত ও আসাম রাজসবকার কর্তৃক ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। পঞ্চরাত্র সম্প্রদায়েব সাত্বত তন্ত্রের অসমীয়া অনুবাদ হইতে অংশবিশেষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি' নামক গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত সাধকরঞ্জন নামক বাংলা গ্রন্থের রচয়িতা কমলাকান্ত খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে সোজা ভাষায় প্রাণায়াম, ষট্চক্র প্রভৃতি তান্ত্রিক বিষয় আলোচিত হইযাছে। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত প্রভৃতিব শ্যামাসঙ্গীতে ও মঙ্গলকাব্যাদি অন্যান্য গ্রন্থেও প্রসঙ্গতঃ এই সকল বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়বঞ্জন সেন মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বঙ্গভাষায় রচিত একখানি কৌলধর্ম্মের গ্রন্থের পুথির পরিচয় দিয়াছেন।[৪]

সংস্কৃত অনুবাদ সহ লল্লাবাক্য একাধিক বার প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রিয়ার্‌সন্ ও অধ্যাপক বার্ণেট কৃত রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত সংস্করণে বিস্তৃত টিপ্পনী প্রদত্ত হইয়াছে।

কমলাতন্ত্রান্তর্গত সত্যনারাযণ ব্রতকথার জনার্দন ভট্টাচার্যকৃত অনুবাদের একখানি পুথি মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সঙ্কলিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে' (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৪১) উল্লিখিত হইয়াছে।

মহিম্নঃস্তবের বাংলা অনুবাদের একখানি পুথির বিবরণ সাহিত্য-পরিষদের 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে' (১ম খণ্ড—সংখ্যা ৫৮৯) দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল গ্রন্থ ছাড়া, প্রাদেশিক ভাষায় রচিত কতকগুলি তান্ত্রিক মন্ত্রও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজ পর্যন্ত ওঝা, গুণী প্রভৃতি সম্প্রদায় মারণ, উচ্চাটনাদি তান্ত্রিক কর্মে অতি দুর্বোধ্য—প্রায় অর্থহীন—সংস্কৃত-প্রাদেশিক-মিশ্রিত ভাষায় রচিত মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই জাতীয় বহু মন্ত্র

৪। ৩৭শ খণ্ড—পৃঃ ১২৫-৩৩

শাবরতন্ত্র, ডামরতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার ভূতডামর তন্ত্র নামক (১৮২৭) প্রচলিত ভূতডামর তন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ একখানি গ্রন্থের পুথি এইরূপ কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টিমাত্র। প্রাদেশিক ভাষায় মন্ত্র প্রয়োগ করিবার প্রথা কত প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। তবে শিবতাণ্ডবীয়াঙ্কযন্ত্রব্যাখ্যা নামক তন্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা শৈব নীলকণ্ঠ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কোন কোন তান্ত্রিক ভাষামন্ত্রের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

স্মৃতি

অসংস্কৃতজ্ঞ যাজনব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের পক্ষে স্মৃতির স্থূল কয়েকটী বিষয় বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও জানা শক্ত ছিল। তাই বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে সাহায্য করার চেষ্টা হইয়াছিল। ফলে বাংলায় আমরা একাধিক স্মৃতির গ্রন্থ পাইতেছি।

ইহাদের মধ্যে রাধবল্লভ-রচিত স্মৃতিকল্পদ্রুম[৫] ও ভাষাস্মৃতিসংক্ষেপ,[৬] ভাষা-সংক্ষেপাশৌচপ্রকরণ,[৭] ব্যবস্থাতত্ত্ব[৭] ও রাধাকৃষ্ণ সার্বভৌম-রচিত তত্ত্বভাষা[৮] প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

এই রাধাবল্লভ ও পৃথ্বীচন্দ্রের গৌরীমঙ্গলে উল্লিখিত রাধাবল্লভ এক বলিয়াই মনে হয়। ভাষাস্মৃতিসংক্ষেপে ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্মৃতিকল্পদ্রুমের পুথিতে রাধাবল্লভের 'কবিবাগীশ' এই উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। পরিষৎপুথিশালার স্মৃতিকল্পদ্রুমের (১৫৬১) পুথির লিপিকাল ১৭২৯ শক। এই পুথির শেষ পুষ্পিকা হইতে জানা যায়, রাধাবল্লভের পিতার নাম মুকুন্দ মিশ্র। স্মৃতিকল্পদ্রুমে অধ্যায়গুলির নাম দেওয়া হইয়াছে মঞ্জরী। বিভিন্ন মঞ্জরীতে শুদ্ধি, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

৫। Notices of Sanskrit Manuscripts (New Series) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫৬।

৬। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৩৪শ ভাগ, পৃঃ ২২৩, ২২৮-৯।

৭। ঐ ৮ম ভাগ, পৃঃ ৪৩।

৮। ইহা একখানি বিস্তৃত স্মৃতিসংগ্রহ গ্রন্থ। ইহার অন্তর্গত 'প্রায়শ্চিত্তপপঞ্জিকা' নামক দ্বিতীয় অংশ হুগলী কৈকালা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

দর্শন

দর্শনশাস্ত্রের—বিশেষ করিয়া ন্যায়ের মূল তত্ত্বগুলি বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দিবার জন্য কতকগুলি পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল। বাংলা দেশে ন্যায়শাস্ত্রের বহুল প্রচারই ইহার কারণ। অনেক ক্ষেত্রে বর্ণপরিচয়ের পরই অথবা সংস্কৃত ভাষায় অতি সাধারণ জ্ঞানলাভের পরই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন আরম্ভ করা হইত। সেই জন্য বোধ হয়, ছড়া বাঁধিয়া ন্যায়ের কোন কোন বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করা হইত। "বান্ মান্ বর্জিয়া সাধ্য আন গর্জিয়া" প্রভৃতি ছড়া আজ পর্যন্ত পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত।

স্বতন্ত্র গ্রন্থের মধ্যে দুইখানি উল্লেখযোগ্য। একখানি ভাষাপরিচ্ছেদ নামক প্রসিদ্ধ প্রকরণগ্রন্থের অনুবাদ। আর একখানিরও নাম ভাষাপরিচ্ছেদ; তবে ইহা অনুবাদ নহে। ইহাতে ন্যায় বৈশেষিকের গোড়ার কথাগুলি গোতম ও তাঁহার শিষ্যদিগের কথোপকথনক্রমে দেওয়া হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গোতমকৃত ন্যায়দর্শনে পদার্থসংখ্যা ষোল হইলেও এই গ্রন্থে গোতম নিজেই বলিতেছেন,—'পদার্থ সপ্তপ্রকার।' শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩০৪, পৃঃ ৩২৫) ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে (৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৫৫০) ১১৮১ বঙ্গাব্দে লিখিত এক পুথি হইতে এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। অনুবাদ গ্রন্থখানি আড়িয়াদহ-নিবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রচিত এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত।

এই গ্রন্থে ভাষাপরিচ্ছেদের আক্ষরিক অনুবাদ নাই। ভাষাপরিচ্ছেদের প্রসিদ্ধ টীকা সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর সারার্থ ইহাতে যথাসম্ভব সরল বঙ্গভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থের আখ্যাপত্র এইরূপ:—

A
System of Logic
Written in Sunscrit By
The Venerable sage Boodh
And Explained In A Sunscrit Commentry By
The Very Learned Viswonath Turkaluncar
Translated Into Bengalee

By

Kashee Nath Turkapunchanun

মহর্ষি গোতমকৃত

ন্যায় দর্শন ;

মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার কৃত তদীয়

ভাষাপরিচ্ছেদঃ।

শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কৃতস্তদীয়ার্থ সাধুভাষা সংগ্রহ ;

গ্রন্থনাম পদার্থকৌমুদী।

স্কুল বুক সোসাইটি দ্বারা কলিকাতা মিলন মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

CSBS

Calcutta :

Printed for the Calcutta School Book Soceity:

At the Baptist Mission Press, Circular Road.

1821

গ্রন্থের প্রারম্ভপত্রে আখ্যাপত্রের বাংলা অংশটী ঈষৎ পরিবর্তন সহ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, গ্রন্থমুদ্রণের তারিখ বাংলা সন ১২২৭, ২রা চৈত্র।[৯]

গ্রন্থোৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাংলা পদ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে পদ্যে গোতমকৃত ন্যায়সূত্রের প্রথম সূত্রের অনুবাদ করা হইয়াছে। যথা,—

প্রমাণ প্রমেয়গণ, বাদ জল্প প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্ত তর্ক ছল। বিতণ্ডা জাতি সংশয়, অবয়ব বিনির্ণয়, হেত্বাভাস নিগ্রহের স্থল॥ গোতম কথিত সেই, ষোড়শ পদার্থ এই, কহিলাম করিবা স্মরণ। ন্যায় ভাষা পরিচ্ছেদে, দ্রব্যাদি-পদার্থভেদে, তার জ্ঞান হয় একারণ॥ পরম ঈশ্বরে ভাবি, কহে কাশীনাথ কবি, উপনাম তর্কপঞ্চানন। ভাষাপরিচ্ছেদ সিন্ধু, উদ্ধারে পরমবন্ধু, সাধুভাষা কৃত

৯। এই গ্রন্থের এক খণ্ড এসিয়াটীক সোসাইটির পুস্তকাগারে আছে। আমি তাহা হইতেই আখ্যাপত্রটী তুলিয়া দিলাম। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের আর এক খণ্ড হইতে প্রারম্ভপত্রস্থিত পরিচয়টী প্রকাশ করিয়াছেন (বঙ্গলক্ষ্মী—মাঘ, ১৩৩৯—পৃঃ ১৭২ পাদটীকা)।

সেতুগণ॥ দৃষ্টি করি পূর্বাপর, মূল অর্থ পরস্পর, ঘুচাবে সন্দেহ হয় যদি। ভাবিলে ভাবনা যাবে, অন্ধকারে আলো হবে, দৃষ্টিমাত্র পদার্থকৌমুদী॥

বঙ্গীয় ১৩১০ সালে প্রকাশিত ভাষাপরিচ্ছেদের অনুবাদের ভূমিকায় (পৃঃ ৵০) পণ্ডিত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর বলিয়াছিলেন,—'এ পর্য্যন্ত কোন ন্যায়শাস্ত্রের কৃতবিদ্য মহোদয়ই এই কার্য্যে অগ্রসর হইলেন না দেখিয়া অনুবাদ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি।' আমাদের বর্ণিত গ্রন্থ আলোচনা করিলে মনে হয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তি আংশিক সত্য। বোধ হয়, তিনিই সর্বপ্রথম সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত ভাষাপরিচ্ছেদের আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছিলেন।

দর্শনবিভাগেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও তজ্জাতীয় অন্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে গীতার খণ্ডিত অনুবাদের পুথিতে অতি সরলভাবে বক্তব্য বিষয় বুঝান হইয়াছে।[10] যথা,—

কৌমার যৌবন জরা শরীরে যেমন।
বিনা যত্নে হয় যায় না রহে কখন॥
দেহান্তরপ্রাপ্তি হেনমতে ব্যবহার।
পণ্ডিতে না ভুলে ভেদ জানিয়া তাহার॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে' (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৩) বর্ণিত অনুবাদের পুথিতেও এইরূপ সারল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,—

বিষয়বৈরাগ্য সদা বশে রহে চিত্ত।
পরমাত্মা চিন্তন আছে যার নিত্য॥
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমান।
পাইলে না জন্মে ক্ষোভ উভয় সমান॥

এই প্রসঙ্গে পূর্ণানন্দগীতা নামক গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে গীতা, মোহমুদ্গর প্রভৃতি গ্রন্থের কতগুলি নির্বাচিত শ্লোকের পদ্যানুবাদ আছে। (বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা, পৃঃ ১০০)।

প্রাদেশিক ভাষায় রচিত ভগবদ্গীতাবিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন মারাঠী ভাষার জ্ঞানেশ্বরীই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। জ্ঞানেশ্বরী গীতার

১০। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৪ খণ্ড, পৃঃ ২২৭।

অনুবাদ নহে—দশ সহস্র কবিতাত্মক এই গ্রন্থে অদ্বৈতমতে গীতার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নিবৃত্তিনাথের শিষ্য জ্ঞানেশ্বর কর্তৃক রচিত হয়। এই নিবৃত্তিনাথ গণিনাথের শিষ্য এবং গণিনাথ প্রসিদ্ধ নাথগুরু গোরক্ষনাথের শিষ্য। জ্ঞানেশ্বরী মহারাষ্ট্রীয় সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আলোচিত হইয়া থাকে। সাধারণের মধ্যে যাহাতে ইহার বহুল প্রচার হয়, সেই উদ্দেশ্যে বর্তমানে এই গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।[১১]

প্রাচীন মারাঠীতে দর্শন সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। জ্ঞানেশ্বরই অদ্বৈত শৈবদর্শন সম্বন্ধে পদ্যে অমৃতানুভব নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[১২] ইহা ছাড়া, মুকুন্দরাজ-রচিত বেদান্তব্যাখ্যা 'বিবেকসিন্ধু' মহারাষ্ট্রীয় সমাজে বিশেষ আদৃত। কেহ কেহ মনে করেন, বিবেকসিন্ধু খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল এবং ইহা মারাঠী সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে মুকুন্দরাজ অত প্রাচীন নহেন—তিনি প্রসিদ্ধ কবি তুকারামের সমসাময়িক।[১৩]

ব্যাকরণ

সংস্কৃত ব্যাকরণ বাংলা ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা সর্বপ্রথম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই করিয়াছিলেন—ইহাই সাধারণের ধারণা। কিন্তু সে ধারণা সত্য নহে। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালেও যে এরূপ চেষ্টা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ দুই একখানি পুথি হইতে পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় 'বালবোধিনী' নামে একখানি ব্যাকরণের পুথি আছে। উহাতে মধ্যে মধ্যে বাংলায় বিষয়গুলি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।[১৪] যথা—যাহার শ্লাঘা করিয়ে তত্র চতুর্থী…যাহারে কোপ করি তত্র চতুর্থী…যাহারে ভয় করিয়ে তত্র পঞ্চমী…যাহারে সুনিয়ে তত্র পঞ্চমী॥ যাহা হইতে বারিয়ে তত্র পঞ্চমী॥…জাহা হইতে প্রভবিয়ে তত্র পঞ্চমী॥…যাহারে স্মরণ করিয়ে তত্র দ্বিতীয়াপঞ্চম্যৌ ভবতঃ॥

১১। Modern Review—August, ১৯৩২, পৃঃ ১৯৫।

১২। Farquhar—Outlines of the Religious Literature of India, পৃঃ ২৩৪-৫।

১৩। ঐ, পৃঃ ২৯৬।

১৪। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৩৮শ খণ্ড—পৃঃ ২৬১।

জ্যোতিষ

জ্যোতিষের প্রয়োজনীয় বচনগুলি ছড়ার আকারে গাঁথিয়া অনেকগুলি পুস্তিকা প্রাচীন বাংলায় রচিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় বহু পুস্তিকার পুথি নানা স্থানে পাওয়া যায়। এইরূপ কয়েকখানি পুথির বিবরণ মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সঙ্কলিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে' প্রদত্ত হইয়াছে।[১৫]

বৈদ্যশাস্ত্র বেশ কঠিন শাস্ত্র। এই শাস্ত্রে অধিকার লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিবার চেষ্টা করা দরকার। সংস্কৃত ভাষার দৃঢ় জাল ভেদ না করিয়াও যাহাতে মোটামুটিভাবে চিকিৎসার কাজ চালান যাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। রোগপ্রয়োগ,[১৬] কবিরাজী পাতড়া[১৭] প্রভৃতি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের গ্রন্থ

প্রাচীন বাংলায় যত সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বেশী বোধ হয় চৈতন্যসম্প্রদায়ের গ্রন্থ। এই সম্প্রদায় বাংলার মধ্য দিয়াই বৈষ্ণব মত প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিদগ্ধসমাজে সম্মান পাওয়া যায় না বলিয়া তাঁহারা সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহাদের প্রযত্নে ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে স্বতন্ত্র এক বিশাল ও সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।[১৮] অসংস্কৃতজ্ঞ সাধারণ বৈষ্ণবের সুবিধার জন্য এই বিশাল

১৫। ১৯২, ২৪৭, ৫৩২ ও ৫৪১ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১৬। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৩৪শ ভাগ, পৃ: ২২৩, ৫৩২।

১৭। ঐ, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ৫১।

১৮। এই সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute পত্রে (১০ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪—১২৬) প্রকাশিত মল্লিখিত Sanskrit Literature of the Vaisnavas of Bengal প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে।

সাহিত্যের অনেক অংশ বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। যাঁহারা এই অনুবাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান যদুনন্দন দাস।[১৯]

কেবল বৈষ্ণব কাব্য নাটক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সরল ও উপাদেয় গ্রন্থই যে অনূদিত হইয়াছিল তাহা নহে। বৈষ্ণব স্মৃতিবিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হরিভক্তিবিলাসের কানাইদাসকৃত একখানি অনুবাদের পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে।[২০] অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ উজ্জ্বলনীলমণি ১৭০৭ শকাব্দে শচীনন্দন বিদ্যানিধি কর্তৃক বাংলা পদ্যে অনূদিত হয়। এই অনুবাদের নাম উজ্জ্বলচন্দ্রিকা।[২১] উদাহরণপ্রসঙ্গে মূল গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, বিদ্যানিধি মহাশয় সেগুলিও অতি সরল ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। রসশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বনে একাধিক স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। এ জাতীয় গ্রন্থগুলি প্রকাশিত ও আলোচিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। এইরূপ কতকগুলি গ্রন্থের মধ্যে অষ্টরস,[২২] রাধাকৃষ্ণ দাসকৃত রসভক্তিলহরী, পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী, গোপালদাসের রসকল্পবল্লী[২৩] প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অবলম্বনে রচিত বিবিধ গ্রন্থ হিন্দী সাহিত্যকেও পরিপুষ্ট করিতেছে।[২৪]

কামশাস্ত্র

কামশাস্ত্র শাস্ত্রান্তরের ন্যায় জনসমাজে বিশেষ প্রচলিত না হইলেও বাংলা ভাষায় কামশাস্ত্র সম্বন্ধেও একাধিক গ্রন্থ পাওয়া যায়।

পদ্মপুরাণান্তর্গত বলিয়া নির্দিষ্ট 'রতিশাস্ত্রের' পদ্যানুবাদের একখানি পুথি শ্রীযুক্ত আবদুল করিম কর্তৃক বিবৃত হইয়াছে।[২৫] পুথিখানি একবার ১১৪৭

১৯। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (পঞ্চম সংস্করণ), পৃঃ ৩৩৮ প্রভৃতি।

২০। Indian Antiquary, ১৯২৮, পৃঃ ২। এই গ্রন্থের ক্ষেত্রনাথকৃত অনুবাদের বিবরণ 'পঞ্চপুষ্পে' (চৈত্র, ১৩৩৯, পৃঃ ৫২৫) দ্রষ্টব্য।

২১। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ) দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা পৃঃ, ১—৪।

২২। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা—পৃঃ ১৮।

২৩। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৩৩৭, পৃঃ ৯৯ প্রভৃতি।

২৪। A History of Hindi Literature— F. F. Keay পৃঃ ৩৭, ৪৬ ইত্যাদি।

২৫। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা—পৃঃ ২৬০।

বঙ্গাব্দে এবং আর একবার ১২৫০ বঙ্গাব্দে সংশোধিত হইয়াছিল—পুথির শেষে এইরূপ নির্দেশ আছে। ইহা হইতে মনে হয়, বইখানির কিছু কিছু প্রচলন তখনকার সমাজে ছিল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৫৫২ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি একই গ্রন্থের।[২৬] পরিষদের পুথির নকলের তারিখ ১২৫২ বঙ্গাব্দ। গ্রন্থের প্রারম্ভে কামশাস্ত্রের প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার বলিতেছেন,—

শিববিধিকৃত যত পুরাণাদি তন্ত্র।
দেখহ বিচারি মনে সর্ব এই মন্ত্র॥

* * *

যত শুন তন্ত্র এই রতিশাস্ত্র পুরাণ।
তন্ত্রসার আদি বেদে সর্ব এই প্রমাণ॥

* * *

শাক্ত শৈব বৈষ্ণব সৌর গাণপত্য।
পঞ্চ উপাসকের মূল নিত্যের এই নিত্য॥

গ্রন্থকার স্পষ্টভাবেই ইহাকে পদ্মপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন:—

কহি রতিশাস্ত্র কথা শুন দিয়া মন।
পদ্মপুরাণের শ্লোক ভাষায় রচন॥

এই গ্রন্থ গর্গমুনি ও পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের কথোপকথনরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে। পরিষৎপুথিশালার ৯২৫ সংখ্যক 'রতিশাস্ত্র' নামক পুথিতেও উহাকে পদ্মপুরাণান্তর্গত বলা হইয়াছে।

পরিষৎপুথিশালার 'শৃঙ্গাররসপদ্ধতি' নামক ২১২৫ সংখ্যক পুথিতে বঙ্গানুবাদের পূর্বে সংস্কৃত মূল সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থান্তে গ্রন্থকার বাংলায় নিজেও কিছু কিছু নূতন উপকরণ সংযোজন করিয়াছেন। নিজরচিত অংশের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন,—

অতএব সংস্কৃত কবিতা বেতিত।
বিরচিব চারি বন্ধ শাস্ত্রের অতীত॥

২৬। পরিষদের ২১২৯ সংখ্যক পুথির সহিতও এই পুথির আংশিক মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

মূল গ্রন্থকর্তা অথবা অনুবাদকের নাম বিশ্বম্ভর দত্ত।[২৭] এই পুথিখানি কোনও মুদ্রিত সংস্করণ হইতে নকল করা বলিয়া মনে হয়। মুদ্রিত সংস্করণের আখ্যাপত্র, বোধ হয়, পুথির প্রারম্ভে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। পুথির প্রথম পত্র এইরূপ :—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥
শ্রীচরণ ভরসা ॥
শৃঙ্গার রস পদ্ধতি ॥

সংস্কৃত এবং তদ্ভাষা ॥
শ্রীহরিচন্দ্র দত্তের ॥
বিদ্যাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল ॥:॥
বহরা গ্রামে ॥
বঙ্গাব্দা ১২৪৮ দানিশাব্দা ৯১ সংখ্যক ॥

২৬৮৬ সংখ্যক পুথিখানি এই গ্রন্থেরই অন্য এক মুদ্রিত সংস্করণের নকল।[২৮] পুথির পুষ্পিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ভবসিঙ্গ যন্ত্রে মুদ্রাঙ্ক হয়ে হলো ব্যাপ্ত ॥
শৃঙ্গারতিলক গ্রন্থ হইলো সমাপ্ত ॥

সন ১২৬৩ সাল তারিখ ॥ ৬ মাঘ সাক্ষরকারি শ্রীচন্দ্রশেখর সরকার তস্য অধিকার জানিবেন। শকাব্দা ১৭৭৮ ॥ রবিবার বেলা নেত্রদণ্ড মধ্যস্থে সমাধান হইল সাং গোবিন্দপুর ॥

কামশাস্ত্রের আর একখানি পুথির বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৬ষ্ঠ ভাগ, পৃ: ৫১) প্রদত্ত হইয়াছিল।

বিবিধ

উপরিনির্দিষ্ট গ্রন্থগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি সাধারণের রুচিকর ও পরিচিত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বেতাল-

২৭। শ্রীবিশ্বাম্বর দত্তর কৃত শোলপ্রকার রতী সাঙ্গ।

২৮। মুদ্রিত হইলেও কামশাস্ত্রের গ্রন্থ বলিয়া এই সকল পুস্তক সাধারণ্যে তেমন প্রচারলাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাই এসকল গ্রন্থের উল্লেখ পর্যন্ত অন্যত্র পাওয়া যায় না।

পঞ্চবিংশতি,[২৯] শান্তিশতক[৩০] ও যুক্তিকল্পতরুর[৩১] অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় ব্যবহারপ্রদীপ (১৫৬০) নামক একখানি গ্রন্থ এবং মোহমুদ্গর নামে অভিহিত বিভিন্ন গ্রন্থে (৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ১৬৭৩) সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ কতকগুলি নীতিশাস্ত্রবিষয়ক সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে হিন্দী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য নৈষধচরিত[৩২] ও শৃঙ্গারশতকের টীকার[৩৩] উল্লেখ করা যাইতে পারে।

২৯। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১।৪১৯

৩০। ,, ১।৩২০

৩১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৪শ ভাগ, পৃঃ ২২৮।

৩২। গ্রীয়ারসন্—Vernacular Literature of Hindusthan, পৃঃ ৯৪।

৩৩। Journal of the United Provinces Historical Society, প্রথম খণ্ড (১৯১৭) পৃঃ ৫৯ প্রভৃতি। এই গ্রন্থ ১৮৬২ বিক্রমসংবতে লিখিত একখানি পুথি হইতে R. P. Dewhurst কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল।

বঙ্গে সূর্যপূজা ও সূর্যের নূতন পাঁচালি

বর্তমানে স্বতন্ত্র সৌরসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই সত্য কিন্তু তথাপি হিন্দু-সমাজে সূর্যদেবের সম্মান বিশেষ কমিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পাঁচটি প্রধান দেবতার পূজা করিয়া থাকে বলিয়া আধুনিক কালের হিন্দু 'পঞ্চোপাসক' নামে অভিহিত। এই পাঁচ দেবতার[১] মধ্যে সূর্য অন্যতম। সমস্ত ধর্মকৃত্যের প্রারম্ভে বিঘ্ননাশের জন্য যেমন বিঘ্নবিনাশন গণেশের অর্চনা করিবার বিধান আছে, সেইরূপ সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যদান করিবারও নিয়ম রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্তব্য সন্ধ্যোপাসনায় সূর্যের উপাসনাই যে প্রধান স্থান অধিকার করে তাহা সর্বজনবিদিত।

বঙ্গের নানাস্থানে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তি এক কালে বঙ্গে সূর্যপূজার বহুল প্রচারের সূচনা করে।[২] প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস তাঁহার একটি পদে[৩] সূর্যপূজার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, বঙ্গের নানা স্থানে বিভিন্নসময়ে সূর্যপূজা, সূর্যব্রত ও আনুষঙ্গিক উৎসবাদির প্রচলন আজ পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।[৪] এই সকল অনুষ্ঠান সাধারণতঃ স্ত্রীসম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশী প্রচলিত। কুমারী-

১। এই পাঁচ দেবতার নাম সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এক মতে 'সূর্যো বহ্নিঃ শিবো দুর্গা ততো বিষ্ণুশ্চ পঞ্চমঃ।' আর এক মতে—'গণেশঃ সবিতা বিষ্ণুঃ শিবো দুর্গা ইতি ক্রমাৎ।'

২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩শ খণ্ড) চুচুড়ায় প্রাপ্ত এক সূর্যমূর্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত একটী সূর্যমূর্তি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রহিয়াছে। বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোণারঙ্গ ও আবদুল্লাপুর প্রভৃতি গ্রামে এখনও প্রতিষ্ঠিত সূর্যমূর্তি পূজিত হইতেছে (যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ঐতিহাসিক চিত্র, ১৩১৬, পৃঃ ৫৩৯)।

৩। চণ্ডীদাসের পদাবলী (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—পৃঃ ২৮)

৪। সূর্যদেবতাকে আশ্রয় করিয়া নানা লৌকিক কৃত্য কেবল বাংলা দেশে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ছিল এবং আছে। জগতের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে সূর্যদেবতার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। ভারতের নানা স্থানে জনসাধারণের মধ্যে সূর্যপূজার স্বরূপ ক্রুক্ (W. Crook) সাহেবের *An introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India* গ্রন্থের ৪-৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

দিগের মাঘব্রত বা মাঘমণ্ডলব্রত, গৃহিণীদিগের চুঙীর ব্রত বা ইথুপূজা ও বর্ষীয়সীদিগের চাকরী বা সূর্যব্রত সূর্যোপাসনারই বিভিন্ন প্রকার[১]।

সূর্যমাহাত্ম্যদ্যোতক এবং সূর্যচরিতবর্ণনাত্মক বিভিন্ন কাহিনী এই সকল ব্রতাদি উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধার সহিত গীত ও কথিত হইয়া থাকে। এই সকল কাহিনীর মধ্যে রুমুনা-ঝুমুনা (মতান্তরে, রূপনা-ঝুপনা বা জয়া-বিজয়া)—এই দুই ভগ্নীর করুণ বিবরণপূর্ণ কাহিনী বেহুলা-লখীন্দর, কালকেতু-ফুল্লরা এবং শ্রীমন্ত ও ধনপতি সদাগরের কাহিনীরই ন্যায় করুণরসপূর্ণ। তবে দুঃখের বিষয়, সাহিত্যিকসমাজে এই কাহিনী তেমন পরিচিত নহে। সূর্যপূজার কথা হিসাবে মেয়েলি ব্রতকথার পুস্তকগুলিতে এই কাহিনীটী বর্ণিত হইয়াছে। ১৬৩১ শকে রামজীবন এই কাহিনী অবলম্বন করিয়া সূর্যের এক পাঁচালি রচনা করেন। এই পাঁচালি চট্টগ্রামের স্বর্গগত কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় কর্তৃক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters-এর পঞ্চদশ খণ্ডে ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছিল। সূর্যের বাল্যলীলা, বিবাহ ও দাম্পত্যজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ-পূর্ণ আর একটি সরস উপাখ্যানের কিয়দংশ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় গ্রন্থে[২] প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে[৩]। সম্প্রতি আমি ফরিদপুরের কোটালিপাড়া হইতে সংগৃহীত সূর্যের এক পাঁচালিতে এই উপাখ্যানের বিস্তৃত বিববণ পাইয়াছি।. তবে আমার সংগৃহীত উপাখ্যানও বোধ হয় সম্পূর্ণ নহে—অনেক স্থলেই ইহাব অংশবিশেষের পরিসমাপ্তি নিতান্তই আকস্মিক বলিয়া মনে হয়। মাঘমণ্ডল ব্রতোপলক্ষ্যে মাঘমাসে

১। এই সকল অনুষ্ঠানের পূর্ণ বিবরণ এখনও স গৃহীত হয় নাই। চুঙীর ব্রত পূর্ববঙ্গে প্রচলিত। এই ব্রতে অগ্রহায়ণ মাসে রবিবারে নল গাছের চোঙার মধ্যে একুশগাছি দূর্বা ভরিয়া উহা দুগ্ধে স্নান করাইয়া সূর্যকে নিবেদন করা হয়। ইহার 'কথা' পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ইথুপূজার 'কথা'র অনুরূপ। মাঘমাসের রবিবারে কোথাও কোথাও অষ্টলোকপাল বা সূর্যের ব্রতের অনুষ্ঠান হয়। চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এই ব্রতের বিবরণ শ্রীরাজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক Journ. Anthrop. Soc. Bombay নামক পত্রে (১৩।৩১৬) প্রদত্ত হইয়াছে।

২। বঙ্গসাহিত্যপরিচয়—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪ প্রভৃতি।

৩। Journal of the Department of Letters, পঞ্চদশ খণ্ড।

প্রাতঃকালে কুমারীগণ মধুর স্বরে এই পাঁচালি গান করিয়া থাকে। মাঘমণ্ডল ব্রতের কিছু বিবরণ দেওয়া এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ব্রত শ্রীহট্টে প্রচলিত মাঘব্রতের অনেকটা অনুরূপ। ফরিদপুর অঞ্চলে কুমারীগণ গৃহপ্রাঙ্গণে বৃত্তাকার মণ্ডল উৎকীর্ণ করিয়া পাঁচ বৎসর যাবৎ মাঘ মাসে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে। এই বৃত্তের উপরে ও নীচে বৃত্তাকারে ও অর্ধবৃত্তাকারে যথাক্রমে সূর্য ও চন্দ্রের প্রতীক কল্পিত হইয়া থাকে। প্রতিবর্ষে এক একটি মধ্যবৃত্ত বর্ধিত করিয়া পঞ্চম বর্ষে প্রতিষ্ঠার সময় পাঁচটি বৃত্ত অঙ্কিত হইয়া থাকে [১]।

প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া ব্রতিনীকে দূর্বাগুচ্ছ সহযোগে চোখে এবং মুখে জল ছিটাইয়া দিতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'চউখে মুখে পানি দেওয়া'।

সূর্য উদিত হইলে 'বারৈল' ভাসাইতে হয় এবং এই প্রসঙ্গেই সূর্যের পাঁচালি গান করা হয়। মাটী দিয়া তৈয়ারী করা সূর্য ও গৌরীর প্রতীকের নাম বারৈল। এই বারৈল দুইটীকে ফুল দূর্বা দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া একখানি পিড়িতে বসাইয়া ব্রতিনী নিম্নোক্তরূপে গান করিতে করিতে উহা পুষ্করিণীর জলে ভাসাইয়া দেয়।

বারৈল যান ভাসিয়া ভাই আসেন হাসিয়া
হলদিয়া পক্ষীটী ডালে ডালে
আমার ভাই আস্‌তে লাগ্‌ছেন কড়িয়া জাঙ্গালে।
কড়িয়া জাঙ্গাল কড়িয়া জাঙ্গাল কিষ্ট মালুম মাজা।
ভাই আমার লক্ষেশ্বর বাপ আমার রাজা॥
দই লো লোচা লো চা।
সূর্যাইরে দিব মোরা ক্ষীরোদের কোছা।
ক্ষীরোদের কোছা না লো গরদের জোড়।
আন্‌ গৌরীরে ডাক দিয়া বড় ঘরের ছাইচ দিয়া।
বড় ঘর কড় মড় করে গৌরীর কানের সোনা লড়ে।

১। এইরূপ ব্রত অনেকদিন পূর্ব হইতেই ভারতের নানা স্থানে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। গৌতমধর্মসূত্রের ব্যাখ্যায় (২।২।২০) হরদত্ত এইরূপ একটী ব্রতের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'মেষস্থে সবিতরি চৌলেষু কুমার্যো নানাবর্ণৈ রজোভি কুমাবাদিত্যং সপরিবারমালিখ্য সায়ং প্রাতঃ পূজয়ন্তি।" (গৌতমসূত্র, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ, পৃঃ ৮৫)। তবে হরদত্তের উল্লিখিত ব্রত মাঘমাসে অনুষ্ঠিত না হইয়া বৈশাখে হইত।

গৌরী গো রসে মোর কন্ম দশে।
গৌরীর মায় ঝাটিকাটি গুয়া কাটে কুটি কুটি
পান সাজায় বাটা বাটা।
খাও লও গৌরীর জামাই চুনে আর খড়ে।
তবে সে দিব মোরা গৌরমণিরে দানে॥
ও গাঙের জালিয়া কে
সোনার বারৈল জলে দিয়া জল ছিটাইয়া দে।
আম কাঠালিয়া পিড়িখানি ঘৃতে ম ম করে।
তাতে বসিবে কে
আমার ভাই··· তাতে বসিবে সে॥

বারৈল ভাসানের পর মণ্ডলের উপর ফুল ছড়াইতে হয়। এই অবসরে নিম্নলিখিত ছড়াগুলি আবৃত্তি করা হয়।

মাঘমণ্ডল মাঘমণ্ডল সোনার কুণ্ডল সোনার কুণ্ডল।
সোনার কুণ্ডলে ঢালিয়া লাড়ু শাখার আগে সোনার খাড়ু॥
মাঘমণ্ডল ··· ··· ··· ··· ···
সোনার কুণ্ডলে ঢালিয়া মৌ আমি বড় মানুষের পুতের বৌ॥
রুক্মিণী পূজি কি বড় মাগি।
আপনি স্থির সোয়ামী হইলেন পৃথিবীর বীর॥
আগ পূজিয়া মাগলাম বর ছোট জামাই বড় ঘর॥
ঘাইটী কাটিয়া লো ভাইটী পাইলাম।
ভাইটীর দুইটী শত্রু নখে খুটিয়া ফেলাইলাম।
দহেশ্বর কাটি মোরা পাজা পাজা
ভাই মোর লক্ষেশ্বর বাপ মোর রাজা॥
সূর্যদেব তুমি ফের বাড়ী বাড়ী।
আমি কাটি তোমার চাম্পা[১]র দাড়ী॥

১। ঘাই, দহেশ্বর, চাম্পা—ঘাসজাতীয় বিভিন্ন উদ্ভিদ্। ছড়া আবৃত্তির সময় এইগুলি নখ দিয়া ছিঁড়িতে হয়।

সূর্যের কাণে দিয়া ফুল ভরিয়া উঠুক দুই কুল।
চন্দ্রের কাণে দিয়া ফুল ভরিয়া উঠুক দুই কুল ॥
মধ্যের আকে[১] দিয়া ফুল ভরিয়া উঠুক দুই কুল ॥

পিতৃকুল ও পতিকুলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা এই ব্রতের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পতিবিষয়ক প্রার্থনার মধ্যে 'বড় মানুষের পুতের বৌ' হইবার ইচ্ছা, 'ছোট জামাই বড় ঘর' লাভের আগ্রহ এবং 'পৃথিবীর বীর' স্বামী পাইবার ঔৎসুক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। ধনী এবং বীর স্বামী পাইবার লোভ সকল দেশের ও সকল সময়ের স্ত্রীলোকেরই স্বভাবসিদ্ধ। 'ছোট জামাই' পাইবার প্রার্থনা পুরুষের বহুবিবাহ-প্রথার বহুল প্রচলনের যুগের ইঙ্গিত দেয়।

এই মাঘমণ্ডলব্রতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সূর্যের পাঁচালির বিভিন্ন অংশ গীত হয়। শীতের প্রত্যূষে কুমারীকণ্ঠনিঃসৃত এই মধুর সঙ্গীত ঘরে ঘরে শুনিতে পাওয়া যায়। যিনি একবার এই সঙ্গীত শুনিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। অবশ্য এই পাঁচালি সর্বত্র সুসঙ্গত নহে—ইহার সর্বাংশের অর্থও তেমন সুপরিস্ফুট নহে। তথাপি ইহার অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ ও করুণরস শ্রোতৃমাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করে। সূর্যের পূর্বরাগের বিবরণ সর্বলোকপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণের পূর্বরাগের কথা মনে জাগাইয়া দেয়। বিবাহের পরে গৌরীর শ্বশুরগৃহাভিমুখে যাত্রাকালীন যে করুণ দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা বর্তমানকালে অল্পপরিচিত হইয়া উঠিলেও একেবারে অপরিচিত হইয়া পড়ে নাই। অন্যান্য গ্রাম্যসঙ্গীতের ন্যায় ইহাও অজ্ঞাত কবির হৃদয় হইতে স্বত-উৎসারিত; তাই ইহা অনায়াসেই শ্রোতার এবং পাঠকের প্রাণ স্পর্শ করে।

আমি এই পাঁচালি আমার নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। সাধারণের বোধসৌকর্যার্থে কোন কোন স্থলে শব্দের গ্রাম্য রূপ ত্যাগ করিয়া সাধু রূপ দিয়াছি মাত্র।

এই পাঁচালিতে উল্লিখিত সূর্যের শ্বশুর উড়িয়া ব্রাহ্মণ রাজা কে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পুরাণমতে সূর্যের স্ত্রীর নাম ছায়া—আমাদের আলোচ্য পাঁচালির মতে তাঁহার নাম গৌর, গৌরমণি, গৌরা বা পার্বতী। সূর্যকে একস্থানে পাঁচালির মধ্যে শিবাই শঙ্কর (১১৬ পংক্তি) বলা হইয়াছে। সূর্যের সহিত শিবের এই অভেদস্থাপনের মূল কোথায় জানি না। তবে এই

১। আক—দাগ, বৃত্ত।

পাঁচালিতে এবং অন্যত্র একাধিক স্থলে সূর্যের সহিত বিষ্ণুরও অভেদ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই পাঁচালিতে (৬০, ৮৩, ১১৪ পংক্তিতে) সূর্যকে জগন্নাথ, নারায়ণ ও গদাধর বলা হইয়াছে। সূর্যের অন্যান্য কোন কোন কাহিনীতে সূর্যনারায়ণ বা ইথুনারায়ণ শব্দেও সূর্য ও নারায়ণের অভিন্নত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়[১]। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা কর্তব্য যে শ্রীহট্টে অনুষ্ঠিত সূর্যব্রতে স্ত্রীলোকেরা কৃষ্ণের গান গাহিয়া থাকে।[২]

এই সকল কাহিনীতে কয়েকটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। দুই একটি বিবরণে সূর্যের আকৃতির বর্ণনা বিশেষ কৌতুকপ্রদ। যথা—

'ইথু নারায়ণ ঠাকুর নমঃ নমবর্ণে, তাঁমাহন কর্ণে, গেরুয়াবস্ত্র পরনে, হাতে শোঁটা ক'রে...
মহিলাব্রতকথা, কিরণবালা দাসী, (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদগ্রন্থাবলী), পৃঃ ৭৫

'লাটার ল্যাখান চৌখ, বাটার ল্যাখান মুখ, কুলার ল্যাখান কান, মুলার ল্যাখান দাত, তামকুণ্ডের মত মাথা, লাল লাঠি হাতে, রুদ্রাক্ষের মালা গলায়—চুণ্ডীর ব্রতের কথা (ফরিদপুর)

শক্তিপূজায় যেরূপ কোন কোন স্থানে সাধক স্বগাত্র-রুধিরাদি দ্বারা দেবীর তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন, সূর্যপূজায় সেইরূপ আচারের ইঙ্গিত আমরা সূর্যের এক কাহিনীতে পাইতেছি। যথা—

'"পাত্রের রাণী আপনার জিব কেটে সল্‌তে ক'রে প্রদীপ দিলেন, হাঁটুর মালুইচাকি কেটে তাইতে ক'রে ধূপ দিলেন, মাথার চুল দিয়ে চামর ঢুলাইতে লাগিলেন।—মহিলাব্রতকথা, কিরণবালা দাসী, পৃঃ ৭৮।

এই মুখবন্ধের পর আমরা নিম্নে আমাদের সংগৃহীত পাঁচালিটি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

[সূর্যের জাগরণ]

ওঠো ওঠো রাউল রে ঝিমিমিকি দিয়া।
সুবর্ণের পঞ্চম খাড়ু নিশিরে থুইয়া॥

১। সূর্য ও নারায়ণের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও অভেদ এবং অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিয়া গ্রিয়ার্‌সন্ সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সূর্যপূজা হইতেই বৈষ্ণব বা ভাগবত ধর্ম উদ্ভূত হইয়াছে। সম্প্রতি ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় (Bulletin of the School of Oriental Studies পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৯৬৯ পৃষ্ঠায়) গ্রিয়ার্‌সন সাহেবের এই মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

২ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ)—অচ্যুতচরণ চৌধুরী, পৃঃ ৯৩-৪।

১ রাউল—রাজা, যোদ্ধা। (এই পাদটীকাগুলি পাঁচালির পংক্তির সংখ্যানুসারে দেওয়া হইয়াছে)।

২ পঞ্চমখাড়ু—অলঙ্কারবিশেষ। নিশিরে—শিশিরে।

নিশিরে থুইয়া না লো ঝামুর ঝুমুর।
আমাদের রাউলের হাতে তাম্বুল॥
হাতে তাম্বুল না লো পাছে থুইয়া।
নিয়া গেল বাওন ঝি কোলে করিয়া॥
নিলি নিলি বাওন ঝি ও তোর কে।
ভাসুর পো না লো স্যাওর পো॥
স্যাওর পো হৈয়া কি কাম করে।
রাজার দুয়ারে পাশা খেলে॥
খেলুক পাশা জিনুক কড়ি।
তা দিয়া কেন্‌বো মোরা সূর্যাই রাউলের পিড়ি॥
সূর্যাই রাউলের পিড়িখানি নেতে পিছল।
তাতে লাইগ্‌গা গেল ধোপাঝির আচল॥
নে নে ধোপাঝি নেতখান ধুইয়া।
যাইট কাওনের পান গুয়া খাইয়া॥
যাইট কাওন না লো ঝড়ার মূল।
ভায়া যাবেন লো বিক্রমপুর॥
বিক্রমপুর না লো বড় বড় লাড়ু।
মার লৈয়া আনবেন লো সুবর্ণের খাড়ু॥
বাপের লৈয়া আনবেন লো দোলা ঘোড়া।
ভাইর লৈয়া আনবেন লো পাজি পুথি॥
বুইনের লইয়া আনবেন লো খেলার ডুখি॥
সতাইর লৈয়া আনবেন কুইয়া পুঠি।
এইয়া শুনিয়া সতাই তুমি সুন্দর বনে যাও।

১৩ নেত—রেশমনির্মিত বস্ত্র।
১৪ লাইগ্‌গা—লাগিয়া।
১৬ কাওন—কাহন।
২৩ ডুখি—মৃত্তিকা-নির্মিত খুড়িজাতীয় বস্তু।
২৪ কুইয়া পুঠি—অতি ছোট ছোট পুঁটিমাছ।
৫ সতাই—সৎমা, বিমাতা।

সুন্দরবুনিয়া বাঘ ওরে সতাইরে ধরিয়া খাও ॥
ছাপ ছিপ না লো বেড়ের মাটি ॥
আমাগো বাপ ভাই লোহার কাঠি ॥
লোহার কাঠি হইয়া কি কাজ করে।
স্বর্গে উঠিয়া জোকার পাড়ে ॥
জয় দিব না লো জোকার দিব।
সোনার দুইটি ভাই বুইন কোলে করিয়া নিব ॥
আগর খোল লো দুয়ার মেল লো।
জুতি মালতী মেলিয়া মারলাম ঘরে।
কত নিদ্রা যাও রে সূর্যাই জোর বাসর ঘরে ॥
সূর্যাইর ঘরের দুয়ারে সোনার মৃদঙ্গ বাজে।
তবু না সূর্যাই রাউলের নিদ্রা ভাঙ্গে ॥
ওঠো রাউল উদয় দিয়া   নগুণ পৈতা গলায় দিয়া
ছগুণ ছাতি মাথায় দিয়া   রাঙা লাঠি হাতে কইরুআ
বাওন বাড়ীর উপর দিয়া।
বাওনের মাইয়া বড় সেয়ান   পৈতা কাটে অতি বেয়ান ॥
ওঠো রাউল উদয় দিয়া ... ...
মালীর মাইয়া বড় সেয়ান   ফুল জোগায় অতি বেয়ান।
ওঠো রাউল . ...
কুমারের মাইয়া বড় সেয়ান   মাটি জোগায় অতি বেয়ান ॥
ওঠো রাউল .. ..
বারইর মাইয়া বড় সেয়ান   পান জোগায় অতি বেয়ান ॥
ওঠো রাউল .. ..
তেলির মাইয়া বড় সেয়ান   তেল জোগায় অতি বেয়ান ॥
ওঠো রাউল ... ...
ধোপার মাইয়া বড় সেয়ান   কাপড় জোগায় অতি বেয়ান ॥
ওঠো রাউল ... ...
বাওনের মাইয়া বড় সেয়ান   ফুল চন্দন জোগায় অতি বেয়ান ॥

২৬ সুন্দরবুনিয়া—সুন্দরবনের।   ২৭ বেড়—ডোবা।
৩০ জোকার—উলুধ্বনি।   ৩৪ মেলিয়া মারলাম—ছুড়িয়া মারিলাম।

সূর্যাই ওঠেন কোন বর্ণে
সূর্যাই ওঠেন তাম্বুল বর্ণে।
সূর্যাই ওঠেন কোন দিক্ দিয়া
সূর্যাই ওঠেন পূব দিক্ দিয়া
তিতৈল গাছের আড় দিয়া
তিতৈল গাছ মেলিল পাত
সূর্যাই ঠাকুর জগন্নাথ।
আমতলার শীতল পানি   তাতে সূর্যাইর গাড়ু গামছা ধোয়া পানি
চন্দনতলার শীতল পানি   তাতে সূর্যাইর মুখধোয়া পানি॥

[গৌরীর পরিচয়]

যখনে জন্মিলেন গৌরী বিদর্ভনগরে।
আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥
এই কন্যা বিয়া করবে সূর্য দিবাকর রে।
দিনে দিনে হইল কন্যা দশম বৎসব রে॥
সোনার কলসী লইয়া জল ভরিতে যায় রে।
কোথা হইতে আইচ্ছ কন্যা কোথায় তোমার ঘর রে।
কাহার কন্যা তুমি কি বা তোমার নাম রে॥
কিসের কলসী তোমার কক্ষের উপরে রে।
বিদর্ভেতে জন্ম আমার মথুরাতে ঘর।
উড়িয়া রাজার কন্যা আমি গৌরামালা নাম॥
সুবর্ণের কলসী আমার কক্ষের উপর।

সূর্যের পূর্বরাগ]

উড়িয়া রাজার দুইটি কন্যা বসিয়া রৈছে খাটে।
তা দেখিয়া সূর্যাই ঠাকুর ফেরেন মাঠে মাঠে॥
উড়িয়া রাজার দুই কন্যা মেলিয়া দিছে সাড়ী।
তা দেখিয়া সূর্যাই ঠাকুর ফেরেন বাড়ী বাড়ী॥

৫৫ তাম্বুল—এস্থলে ইহার অর্থ 'তাম্র'।

উড়িয়া রাজার দুই কন্যা মেলিয়া দিছে কেশ রে।
তা দেখিয়া সূর্যাই ঠাকুর ধরেন নানা বেশ রে॥
উড়িআ রাজার দুই কন্যা মলখাড়ু দিছে পায় রে।
তা দেখিয়া সূর্যাই ঠাকুর বিয়া করতে চায় রে॥

[সূর্যের স্বপ্ন দেখান]

শুইয়া রইছ ব্রাহ্মণ ঠাকুর নিদ্রায় দিছ মন রে।
চক্ষু মেলি চাইয়া দেখ শিয়রে নারায়ণ রে॥
তোমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা সতী।
তার মনে বড় ইচ্ছা সূর্যাইরে পাবে পতি॥
তোমাব ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা নাম।
শঙ্খবস্ত্র দিয়া কন্যা সূর্যাইরে কর দান॥

[স্বপ্নবৃত্তান্ত কথন]

ব্রাহ্মণে উঠিয়া বলে ব্রাহ্মণীর স্থানে।
কি স্বপ্ন দেখিলাম আমি আজিকার রাত্রে॥
আমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা সতী।
তাহার মনে বড় ইচ্ছা সূর্যাইরে পাবে পতি॥
আমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা নাম।
শঙ্খ বস্ত্র দিয়া কন্যা সূর্যাইরে করছি দান॥

[কন্যার পিতাকে সূর্যের সাহায্য দান]

ব্রাহ্মণী বলেন—'ব্রাহ্মণ, বুদ্ধি নাই তোর ঘটে।
ভিক্ষা করি খাও রে ব্রাহ্মণ কন্যা দিবা কারে।'
'কেমন করি দিব রে কন্যা আমার চালে নাই ছোন রে।'
সূর্যদেবের বরে লাম্‌লো ঘরামি চৌদ্দ জন রে॥
'কেমন করি দিব রে কন্যা আমার উঠান ভরা বন রে।'
সূর্যদেবের বরে লাম্‌লো ভূঁইমালি চৌদ্দ জন রে॥
ঘর হৈল দুয়ার হৈল হৈল টাকা কড়ি।

৯৯ ভূঁইমালি—যাহারা ভূমি পরিষ্কার করে।

সূর্যদেবের বরে হৈল সোনার চৌয়াড়ি ॥
যে দোকানে গৌরমণি শঙ্খ কেনতে যায় রে।
সেই দোকানে ছাওয়াল সূর্যাই চত্র ধরেন শিরে রে।
সাক্ষী থাইকৃক দেবধর্ম দিবা আর রাতি।
অকুমারী গৌরা আমি সূর্যাই ধরেন ছাতি ॥
সম্মান নারিকেলের তেলে কামারে দোকান মেলে।
সোনা দিব সেরে সেরে (আরে) রূপা যত লাগে।
এমন করি গড়্‌বা গয়না আমার গৌরীর অঙ্গে লাগে ॥
দেখ দেখ মালিয়া রে কিসের ভরা আইসে।
অর্ধেক গাঙ্‌ জুড়িয়া রে ফুল মটুকের ভরা আইসে ॥
আসুক আসুক আসুক ভরা লাগুক আসি ঘাটে।
আমার গৌরমণির বিয়া শুভ মঙ্গলবারে।

[সূর্যের বিবাহ যাত্রা]

ওপারে কিসের বাদ্য বাজে।
রাউলের বেটা গদাধর বিয়া করতে সাজে ॥
আম পাতা মচ মচ করে কাঠাল পাতা কড়মড় করে
শিবাই শঙ্কর বিয়া করে।
সাজ সাজ গদাধর পায়ে নূপুর দিয়া।
ঘরে আছে গৌরা পার্বতী তুলিয়া দিব বিয়া ॥
সূর্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন মায়ের আজ্ঞা লৈয়া।
মায়েতে আশীর্বাদ করেন শিরে হাত দিয়া ॥
বাচিয়া থাইক্‌কো ওরে সূর্যাই চিরঞ্জীবী হৈয়া।
সূর্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন বাপের আজ্ঞা লৈয়া ॥
বাপেতে আশীর্বাদ করেন শিরে হস্ত দিয়া।
বাঁচিয়া থাইক্‌কো ওরে সূর্যাই দিগ্বিজয়ী হৈয়া ॥
সূর্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন গুরুপুরৈতের আজ্ঞা লইয়া।

১০৫ অকুমারী—কুমারী, অবিবাহিতা।
১১০ ভরা—নৌকাপরিপূর্ণ জিনিষ।

গুরু পুরৈতে আশীর্বাদ করেন শিরে হস্ত দিয়া।
বাচিয়া থাইক্‌কো ওরে সূর্যাই রাজরাজেশ্বর হৈয়া॥
আমের ছত্র বিল্বপত্র দধির আছরা দিয়া।
সূর্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন (সুমুখে) সোনার ঘটি লইয়া॥
জননীতে ধোয়ায় হাত দুগ্ধেতে ডুবাইয়া।
অঞ্চলে মুছাইয়া মুখ বলে কর্ণে গিয়া॥
একেশ্বরে যাও গো রাম দোসরে আসিও।
পরের ঝিরে পাইয়া না জননী পাসর॥
সূর্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন সুমুখে সোনার ঘটী।
আগে পাছে লোক লস্কর মধ্যে নাচে নটী॥
সূর্যাই ঠাকুর যাত্রা করিয়া এদিক্‌ ওদিক্‌ চান।
যেদিকে শোনেন বাজনার শব্দ সেই দিকে চলিয়া যান॥
চন্দন গাছ কাটিয়া দে রে সূর্যাই হবেন পার।

[সূর্যের বিবাহ]

নব রত্তন পিড়িখানি মধ্যে মধ্যে সোনা।
দেবগণে ধরিয়া তোলেন পিড়ির চাইরো কোনা॥
দেবগণ দেবগণ রত্নসিংহাসন।
চারি চক্ষে দুই মুখে হইল দরশন॥
সূর্যাই ভাল বিচার কর
নিকটিয়া ফুলের মালা উদয় মেলিয়া ধর।
এক ফুল খোটেন সূর্যাই আরো ফুল চান।
মালিয়ার মালঞ্চ পুষ্প অধরে যোগান॥
লামা লামা ডাক পড়ে লামা স্থিতিস্থলে।
পঞ্চ হরতকী দিয়া দিয়া কন্যা দান করে॥
মানুষ জনে ডাকিয়া বলে আকাশে নাই রে তারা।
শীঘ্র করিয়া তুলিয়া স্থাও রে সূর্যাইর বিয়ার দাড়া॥
শাশুরীতে রান্ধেন দাড়া দুধে আর গুড়ে।

১৩২ একেশ্বর—একাকী। দোসরে—দুজনে।

শালাবৌতে ঢালেন দাড়া স্ববর্ণের থালে ॥
শাশুরী আইলেন ভাত দিতে
খসিয়া পইল সাড়ী।
রাম রাম বলিয়া সূর্যাই নাকে দিলেন হাত।
কেন বা আসিলাম আমি শাশুরীর সাক্ষাৎ ॥
তোমরা বল আমার সূর্যাই পাগল পাগল।
আমার সূর্যাই পাগল নয় রে রসের নাগর ॥

[সূর্যের গৃহপ্রত্যাগমনের প্রস্তাব]

স্ববর্ণের খাটপাট নেতের মশারী।
তাহার মধ্যে শয়ন করেন সূর্যাই আর গৌরী ॥
কাউয়ায় করে কল বল কোকিলের ধ্বনি।
জাগ রে জাগ রে গৌরমণি দেশে যাব আমি ॥
'তোমার দেশে যাব রে আমি মা বলিব কারে।'
'ঘরে আছে আমার মা যে মা বলিও তারে ॥'
'শোন রে বুদ্ধির সাগর বুদ্ধি নাই তোর ঘাড়ে।
পরের মারে মা বলিলে কার প্রাণ ভরে ॥
পরের বাপকে ডাকলে বাপ কার প্রাণ ভরে ॥'
দৌড় দিয়া যায় গৌরমণি মায়ের ও রে কাছে।
'আমারে যে নিতে আইছে লুকাইয়া রাখ পাশে ॥'
'টাকা নয় রে পয়সা নয় রে বাক্‌সে তুলিয়া থোব।
পরের লইয়া হইছ গৌরা পরেরে সে দিব ॥'

১৫২ দাড়া—বিবাহের দিন কন্যার মাতা বা মাতৃস্থানীয়া অন্য কেহ ধান সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া সেই ধানের চাউল প্রস্তুত করেন। সেই চাউল হইতে রাত্রিতে অন্ন প্রস্তুত হয়। ধান সিদ্ধ করিবার সময় একটী আখের পাতায় আঠার জন স্ত্রৈণ পুরুষের নাম লিখিয়া তাহা হাড়ির মধ্যে দেওয়া হয়, আড়াইটী আখের পাতা অন্য কাঠের সঙ্গে উনানে দেওয়া হয়। রন্ধন কারিণীকে মুখে মিষ্ট দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে হয়। বিবাহান্তে বর এই অন্ন উচ্ছিষ্ট করিয়া নববধূকে খাইতে দেয়। নববধূ ইহার কিছু অংশ গ্রহণ করে। এই অন্নের নামই দাড়া।

[গৌরীর প্রতি মায়ের প্রবোধ]

"আজ যাও গৌরী লো কাঁদিয়া কাটিয়া।
কাল আসিও গৌরী লো হাসিয়া রসিয়া॥
আজ যাও গৌরী লো ত্যানা-তোনা পড়িয়া।
কাল আসিও গৌরী লো চেলির সাড়ী পড়িয়া॥"

[সূর্যের ভ্রাতার বধূ আনয়নের প্রস্তাব]

খাটো খাটো কলা গাছটা বাইয়া পড়ে মৌ।
সূর্যাই ঠাকুর বিয়া করছে বড় সুন্দর বৌ॥
ছোট ভাই উঠিয়া বলে "বড় দাদা ভাই।
গাদি ভরা পান দেও বউ আনিতে যাই॥"
ছোট ভাই .. ...
কলসী ভরা তেল দেও ...
ছোট ভাই ... ...
থান ভড়া সিন্দুর দেও.. ...

[গৌরীর শ্বশুর বাড়ী যাত্রা ও সকলের বিলাপ]

সূর্যাই গৌরাই যাত্রা করাইয়া দিয়া।
গৌরমণির মায় কান্দে শানে পাছাড় খাইয়া॥
আরসী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে রইয়া।
গৌরমণির যে মা-ধন কান্দে শানে পাছাড় খাইয়া॥
আরসী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে পর।
গৌরমণির মা-ধন কান্দে বেলা আড়াই ফর॥
"আগে যদি জান্‌তাম মা-ধন পরে নিবে তোরে।
কোলের ছাওয়াল মাটিতে রাখিয়া কোলে নিতাম তোরে॥
আগে যদি ... ...
কানের সোনা খসাইয়া থুইয়া কানে রাখতাম তোরে॥

১৭৪ ত্যানা-তোনা—ছেঁড়া কাপড়, ন্যাকড়া।
১৭৯ গাদি—স্তূপ, গাদা।
১৮৫ শান—পাথর। পাছাড়—আছাড়।

আগে যদি ... ...
গলার হার খসাইয়া থুইয়া গলায় রাখতাম তোরে ॥”
আরসী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে রৈয়া।
গৌরমণির যে বাপ-ধন কান্দে মুখে গামছা দিয়া ॥
চৌদ্দ দাড়ের নৌকা খানি ষোল ছয়জন মাঝি।
“নাইয়ারে দিব তার-বয়লা মাঝিরে দিব কড়ি।
ধীরে ধীরে বাও রে নৌকা মায়ের কান্দন শুনি।
ধীরে ধীরে বাও রে নৌকা বাপ ভাইর কান্দন শুনি ॥
এখন কেন কান্দ মা-ধন শানে পাছাড় খাইয়া।
সেইকালে কৈছিলাম মা দূরে না দিও বিয়া ॥
এখন কেন কান্দ বাবা মুখে গামছা দিয়া।
সেইকালে কৈছিলাম বাবা দূরে না দিও বিয়া ॥
এখন কেন কান্দ ভাই-ধন মুখে কাপড় দিয়া।
সেইকালে কৈছিলাম ভাই-ধন দূরে না দিও বিয়া ॥
এখন কেন কান্দ বুইন খেলার সজ্জা লইয়া।
সেইকালে কৈছিলাম বুইন দূরে না দিও বিয়া ॥
এখন কেন কান্দ ভাইর বউ লেমু পাম্বা লৈয়া।
সেইকালে কৈছিলাম বউ দূরে না দিও বিয়া ॥”

[সূর্যের গৃহপ্রত্যাবর্তন]

“বিয়া করলা সূর্যাই ঠাকুর দানে পাইলা কি ?”
“ভাঙ্গা গাড়ু ভাঙ্গা থাল উড়িয়া রাজার ঝি ॥
থাল পাইলাম গাড়ু পাইলাম অন্নজল খাইতে।
উড়িয়া রাজার ঝি পাইলাম গৃহ বাস করিতে ॥
ভাঙ্গা গাড়ু ভাঙ্গা থাল ফেলিয়া আইলাম পথে।
উড়িয়া রাজার ঝিরে লইয়া আইলাম সাথে ॥”

১৯৯ নাইয়া—নৌকার মালিক।

পাঁচু ঠাকুরের পাঁচালি

পশ্চিম-বঙ্গের স্ত্রীসমাজে পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ বা পাঁচু ঠাকুরের পূজা সমধিক প্রচলিত। শিশুদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে এই লৌকিক দেবতার আরাধনা করা হয়। পশ্চিম-বঙ্গের প্রায় পল্লীতেই পঞ্চাননপূজার নির্দিষ্ট স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চাননের স্মৃতিপূত বহু স্থান পঞ্চাননতলা নামে পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বহুলপরিচিত দেবতার সম্বন্ধে প্রচলিত সাহিত্যের পরিমাণ নিতান্ত কম।

রেভারেণ্ড ওআর্ড[১] ও লালবিহারী দে[২] মহাশয় এই দেবতার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, তাহার আকর মনে হয় জনশ্রুতি। বিশ্বকোষে[৩] প্রদত্ত নাতিসংক্ষিপ্ত বিবরণে মনোহর ব্যাসকৃত এই দেবতার একখানি মঙ্গলকাব্য হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে এইরূপ আরও গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ব্যাসকৃত গ্রন্থের উপাখ্যান এইরূপ—

হস্তিনাপুরের সুরথ নামক রাজা পঞ্চাননের বরে পুত্র লাভ করেন। পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজদম্পতী দেবতার কথা একরূপ ভুলিয়াই যান। ক্রুদ্ধ দেবতা ডাইনীদের দ্বারা বালককে অপহরণ করান। পরে রাজার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন। রাজাও আড়ম্বরের সহিত দেবতার পূজা করেন, একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবতার মহাত্ম্যকীর্তন ও পূজার প্রচার করেন।

১। *A View of the History, Literature, and Mythology of the Hindoos* (Serampur 1815), ২য় খণ্ড।

২। *Bengal Peasant Life*, পৃ. ৬২-৫ (১৯২৬ সালের সংস্করণ)।

৩। বিশ্বকোষকারের মতে পঞ্চানন ও তাঞ্জোরের নিকটবর্তী স্থানের তিরুবয়র নামক দেবতা অভিন্ন। কিন্তু তাঁহার এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। তাঞ্জোরের দেবতার সংস্কৃত নাম পঞ্চনদীশ্বর এবং তাঁহার মাহাত্ম্যবর্ণনাপূর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থের নাম পঞ্চনদমাহাত্ম্য।

ব্যাসের গ্রন্থের কোনও পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিশ্বকোষে উল্লিখিত অন্য কোনও গ্রন্থের নাম বা পরিচয় পাওয়া যায় না।[৪]

তবে কলিকাতার রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালায় বৃহদ্রুদ্রযামল নামক যে অজ্ঞাতপূর্ব তান্ত্রিক গ্রন্থের তিনখানি পুথি আছে, এই দেবতার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করাই তাহার অংশবিশেষের উদ্দেশ্য। এই সকল অংশে বাংলা মঙ্গলকাব্যের অনুকরণে জনসাধারণের নিগ্রহানুগ্রহ বিষয়ে এই দেবতার অলৌকিক শক্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবতার মত ইনিও সন্তুষ্ট হইলে ভক্তদের ইষ্ট সাধন করেন এবং অসন্তুষ্ট হইলে অবজ্ঞাকারীর অশেষ ক্লেশের কারণ হইয়া থাকেন। হইতে পারে, এই গ্রন্থও কোন বাংলা মঙ্গলকাব্য অবলম্বনে রচিত—কিন্তু ইহার উপাখ্যান বিশ্বকোষে উদ্ধৃত উপাখ্যান হইতে স্বতন্ত্র। লৌকিক দেবতার বিববণ সংস্কৃতে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত না হইলেও দুর্লভ—তাই এই গ্রন্থখানিব কিছু মূল্য আছে। অবশ্য এই গ্রন্থের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য সন্দেহাত্মক। 'বৃহৎ' এই বিশেষণটি ইহার অর্বাচীনতার সাক্ষ্য দান করে, এরূপ সংশর অসঙ্গত নহে। বস্তুতঃ পঞ্চাননের পূজার গৌরববৃদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থের সহিত ইহার উপাখ্যানের সংযোগসাধনের প্রয়াস অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে। মনে হয়, ইহা বাংলা দেশে রচিত বাংলার লৌকিক দেবতাবিষয়ক এক অর্বাচীন গ্রন্থ। ইহার যে তিন খানি পুথির বথা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা সকলই বঙ্গাক্ষবে লিখিত। ইহার কোনও উল্লেখ কোনও প্রচলিত নিবন্ধগ্রন্থে পাওয়া যায় না। তন্ত্রের যে সমস্ত প্রচলিত তালিকা আছে, তাহার মধ্যে এই গ্রন্থের নাম নাই। কিন্তু বাংলার অতিপরিচিত দেবতার বিস্তৃত কাহিনী বর্ণনা করে বলিয়া প্রাচীন হউক বা অর্বাচীন হউক, এই গ্রন্থের মূল্য অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

গ্রন্থের পুথি তিনখানি দীর্ঘকাল যাবৎ সোসাইটীর পুথিশালায় রক্ষিত হইলেও ইহাদের বিশেষ কোনও আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই। রামানন্দের

৪। [পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার অনেক পরে কয়েকখানি পঞ্চাননমঙ্গল গ্রন্থের পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। (শ্রীসুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১।৭৯২, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল—পুঁথি পরিচয়, ২য় খণ্ড)। শ্রীকালিদাস দত্ত দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণা অঞ্চলে প্রচলিত পঞ্চানন্দের গান প্রকাশ করিয়াছেন (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—৬৪।৮১—৯১)।]

টীকা-সহিত খণ্ডচতুষ্টয়াত্মক সমগ্র গ্রন্থের পুথিখানি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিঅম কলেজ কর্তৃক প্রথম সংগৃহীত হয়, পরে ইহা ঐ কলেজের অন্যান্য পুথির সহিত সোসাইটীতে স্থানান্তরিত হয়। দ্বিতীয় পুথিতে গ্রন্থের সটীক দ্বিতীয় খণ্ডটি মাত্র রক্ষিত হইয়াছে।[৫] ইহা ১৮৯০-১ সালে সংগৃহীত হয়। চতুর্থ খণ্ডের টীকাহীন মূলমাত্র তৃতীয় পুথিখানি ১৯১৪ সালে সংগৃহীত।

রামানন্দের মতে আলোচ্য পুথিতে গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার মাত্র সংকলিত হইয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের পুষ্পিকার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া রামানন্দ স্পষ্ট বলিয়াছেন—বৃহদ্রুদ্রযামল নামক গ্রন্থ বাইশ খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে গণপতির উপাসনার বিবরণ, দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ খণ্ডে পঞ্চাননের জন্ম ও কর্মের বিবরণ, দ্বিতীয় তৃতীয়ে বন্ধ্যালক্ষণ, চতুর্থে ব্রহ্মচর্য-নিরূপণ। নারদেব দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া বিষ্ণু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের সার বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই জন্যই এই গ্রন্থের নাম বৃহদ্রুদ্রযামলীয় বা বৃহদ্রুদ্রযামল হইতে উদ্ধৃত। প্রাপ্ত পুথির আলোচ্য বিষয়ের অনেকাংশ রামানন্দের বর্ণনার অনুরূপ। ইহাতে তিন অধ্যায়ে সমাপ্ত প্রথম খণ্ডে গণেশের উপাসনা, দ্বিতীয় খণ্ডে ত্রিশ অধ্যায়ে পঞ্চাননের বিস্তৃত উপাখ্যান, তৃতীয় খণ্ডে বাইশ অধ্যায়ে বন্ধ্যার লক্ষণ ও পঞ্চাননের পূজাদি সাহায্যে তাহার প্রতীকারের উপায়বর্ণনা, চতুর্থ খণ্ডে পাঁচ অধ্যায়ে বিভিন্ন পূজা পদ্ধতি, বর্ণবিভাগ প্রভৃতি সাধারণ কথা এবং পঞ্চম খণ্ডে[৬] কালীর উপাসনা। দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ণনীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদানই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বর্ণিত উপাখ্যানের অনুরূপ উপাখ্যান লোকমুখে কোথাও প্রচলিত আছে কি না অথবা পঞ্চাননের উপাসকদিগের নিকট পরিচিত কোনও বাংলা গ্রন্থে পাওয়া যায় কি না, অনুসন্ধান করিয়া দেখা দরকার।

এই খণ্ডের প্রারম্ভে দেবতাদের এক মন্ত্রণাসভার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। দেবতারা স্থির করিলেন, নিজেদের শক্তির সমবায়ে নূতন দেবতার সৃষ্টি করিতে হইবে (অধ্যায় ১)। শিবের দেহ, বিষ্ণুর মস্তক ও অন্যান্য সকল দেবতাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া এই দেবতা আবির্ভূত হইলেন (অধ্যায় ২)।

৫। সম্ভবতঃ এই পুথিখানিরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্বর্গগত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল (*Notices of Sanskrit Mss* —১।২৫০)।

৬। উল্লিখিত প্রথম পুথিতেই এই খণ্ড আছে। পুষ্পিকায় ইহা চতুর্থ খণ্ড বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু খণ্ড-প্রারম্ভে ইহাকে পঞ্চম খণ্ড বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে—'ইত্র হ পঞ্চমে খণ্ডে কালীধর্মে। নিরূপিতঃ' (পৃঃ ১০৪)।

শিব তাঁহাকে চারি জন দূত দিলেন। ইহাদের লইয়া দেবতা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন এবং কাঞ্চননগর নামক স্থানে বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষের তলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই গাছের তলায় পাথরের উপরে তাঁহার উদ্দেশ্যে পূজা করিলে বিশেষ ফল লাভ হইবে, পঞ্চানন এইরূপ প্রচার করিয়া দিলেন (অধ্যায় ৩)।

এই সময় সমীপবর্তী পুষ্করিণীতে স্নান করিবার উদ্দেশ্যে চারি জন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবীন দেবতা সদাচারভ্রষ্ট জনসমূহের মঙ্গলের জন্য স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—দূতেরা এই কথা বলিলে তাঁহারা উপহাস করিতে লাগিলেন। ইহাতে দেবতা স্বভাবতই অপমানিত বোধ করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হইলেন (অধ্যায় ৪)। দূতেরা ব্রাহ্মণদের বাড়ী যাইয়া তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রদিগকে এক অভিনব ব্যাধি-দ্বারা আক্রান্ত কবিলেন। ফলে তাহাদের সমস্ত দেহ শুষ্ক হইয়া গেল। চিকিৎসকেরা রোগ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইলেন (অধ্যায় ৫)। যথানিয়মে ব্রাহ্মণেরা পঞ্চাননের পূজা করিলে বোগ বিদূরিত হইল (অধ্যায় ৭)।

এক মালী এই অপরিচিত দেবতাকে মালা যোগাইতে অস্বীকৃত হইলে তাহাকেও এইরূপ ভাবে দণ্ড দিয়া পরে ক্ষমা করা হইল (অধ্যায় ৮)। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদম্পতীর দীর্ঘকাল পূর্বে মৃত পুত্রকে পঞ্চাননের পূজার দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিয়া দূতেরা এই দেবতার অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিল (অধ্যায় ৯)।

কাঞ্চননগরের রাজা নরধ্বজ অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার আট রাণী লইয়া দুঃখে কালযাপন করিতেছিলেন। পূর্বোল্লিখিত নিগৃহীত ব্রাহ্মণচতুষ্টয়ের উপদেশানুসারে পঞ্চাননের পূজা করিয়া রাজা প্রত্যেক রাণীর গর্ভে একটি করিয়া পুত্র লাভ করিলেন (অধ্যায় ১০-১২)। তিনি প্রতিদিন দেবতার পূজা করিতেন। কালে দেবতার উদ্দেশ্যে একটি স্বর্ণমন্দির প্রস্তুত করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তাঁহার পুত্রেরা লঙ্কা হইতে স্বর্ণ আনয়ন করিতে সম্মত হইলেন। এই লঙ্কানগরী বড় ভীষণ। মন্ত্রীরাও কেহ এখানে যাইতে সাহস করেন নাই। তাঁহাদের ভীতি অকারণ নয়। রাজপুত্রেরা সাহস করিয়া যাত্রা করিলেন সত্য; কিন্তু পথে নানা বাধাবিঘ্ন তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তবে পঞ্চাননের অনুগ্রহে তাঁহারা সকল বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। পথে রাজা কীর্তিধ্বজের অনুচরেরা তাঁহাদিগকে বাধা দেয়, নূতন

দেবতার নাম শুনিয়া ঠাট্টা করে এবং দেবতার চক্রান্তে নিহত হয় (অধ্যায় ১৫)। তখন কীর্তিধ্বজের পুত্র বীরসেন আসিয়া আট ভাইকে পরাস্ত করে। তাঁহারা পঞ্চাননের সাহায্য প্রার্থনা করিলে দূতেরা আসিয়া তাঁহাদের রক্ষা করে এবং বীরসেনকে বধ করে (অধ্যায় ১৬)। কীর্তিধ্বজের ইষ্টদেবতা বিষ্ণু সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া পঞ্চাননের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন এবং এইরূপ শক্তিশালী দেবতার ভক্তদিগের বিরুদ্ধতাচরণ করার জন্য কীর্তিধ্বজকে তিরস্কার করিলেন। কীর্তিধ্বজও নরধ্বজের পুত্রদের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং অধিকতর অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন (অধ্যায় ১৭)। রাজকুমারগণ আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তপস্যারত এক ব্রাহ্মণের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহারা অন্ধ হইয়া গেলেন। পঞ্চাননকে স্মরণ করায় তিনি আসিয়া বুঝাইয়া দিলেন—এই ব্রাহ্মণের সমস্ত জিনিষপত্র চুরি হইয়া যাওয়ায় ইনি এইরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার আশ্রমের এক ক্রোশের মধ্যে যে মানুষ আসিবে, সেই অন্ধ হইয়া যাইবে। পঞ্চাননের এই বিষয়ে প্রতীকারের কোন হাত ছিল না। রাজকুমারেরা তাঁহার পরামর্শ মত ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করিয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলেন (অধ্যায় ১৮-২)।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাইলেন। জলপানের উদ্দেশ্যে তাহার মধ্যে নামিলে এক কুমীর ও তাহার স্ত্রী তাঁহাদিগকে গিলিয়া ফেলিল। কুমারেরা তাহাদের উদরের অভ্যন্তর হইতেই পঞ্চাননকে ডাকিতে লাগিলেন। পঞ্চাননের নির্দেশে কুম্ভীরদম্পতী রাজকুমারদিগকে উগরাইয়া দিল (অধ্যায় ২১)।

অতঃপর তাঁহারা এক চন্দনবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা দেখিলেন এক রৌপ্যমন্দির, আর তাহার প্রাচীর সোনার তৈয়ারী। মন্দিরের অধিপতি শিব তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বরে হনুমান্‌কে আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন। তাঁহাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া হনুমান্ তাঁহার বিশাল লাঙ্গুলের দ্বারা শিলাময় সেতুর ভগ্নস্থান[৬] পার হইতে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিলেন এবং তাঁহারা নির্বিঘ্নে লঙ্কানগরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন (অধ্যায় ২২)।

৬। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ যখন লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন লক্ষ্মণ সেতুর এক অংশ ভাঙ্গিয়া দেন।

হনুমানের সুপারিসে লঙ্কার রাজা বিভীষণ তাঁহাদিগকে সোনা দিলেন (অধ্যায় ২৩)।

তারপর তাঁহারা সোনায়-ভরা নৌকা লইয়া দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। দেশে ফিরিলে পিতামাতা প্রজা আত্মীয়স্বজন সকলে সানন্দে তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিলেন (অধ্যায় ২৪)। বিশ্বকর্মার সাহায্যে তখন নরধ্বজ এক সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিলেন। যথানিয়মে আড়ম্বরের সহিত এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইল। এই সময়ে পঞ্চানন ও অনুচরবর্গের যথোচিত পূজা করা হয়। এই প্রসঙ্গে ইঁহাদের সকলেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, পঞ্চানন শুভ্রবর্ণ, পঞ্চমুখযুক্ত এবং বলীবর্দ তাঁহার বাহন। আর তাঁহার ত্রিবিধ অনুচরের মধ্যে একদল হরিদ্রাভ, গজারোহী ও ধনুর্ধারী, আর একদল রক্তাভ, অশ্বারোহী ও ত্রিশূলধারী এবং তৃতীয় দল কৃষ্ণবর্ণ, উষ্ট্রারোহী ও অসিধারী (অধ্যায় ২৫)।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পর পঞ্চানন তাঁহার পূজাপ্রচারের জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন। রাজাও দেবতার অলৌকিক শক্তির উল্লেখ করিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। দেবতার পূজা প্রচারিত হইল। রাজা জরাসন্ধ ঘোষণা-পত্রের অবমাননা কবিয়া উহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ফলে পঞ্চাননের ক্রোধ তাঁহার উপর নিপতিত হইল। তাঁহার পুত্রেরা মরিয়া গেল—তিনি নিজে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন। এই সময়ে নারদ তাঁহার মঙ্গলের জন্য পঞ্চাননের পূজা করিলে জরাসন্ধের পূর্ব অবস্থা ফিরিয়া আসিল এবং তিনি পঞ্চাননের একজন প্রধান ভক্ত হইয়া পড়িলেন (অধ্যায় ২৬)। পঞ্চানন তখন এই নিয়ম করিয়া দিলেন, যে সমস্ত লোক, বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোক ও শিশু, প্রচলিত রীতিনীতি লঙ্ঘন করিবে, তাহাদের উপর তাঁহার অনুচর ও ভূতপ্রেতবর্গের পূর্ণ অধিকার থাকিবে (অধ্যায় ২৮)। তারপর, রাজপুত্র ও রাণীদিগের সহিত রাজাকে লইয়া পঞ্চানন রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গেলেন। সুমেরু-শিখরে অবস্থিত একবিংশতি স্বর্গের অন্যতম নির্মল নামক স্বর্গে সপরিবারে রাজার স্থান হইল। (অধ্যায় ৩০)।

এইখানেই জন্মখণ্ড বা পঞ্চাননের উৎপত্তি ও প্রচারের বিবরণ শেষ হইল। এই দেবতার বিস্তৃত পূজা-পদ্ধতিযুক্ত অন্য খণ্ড ছিল কি না, বলিতে পারা যায় না। তন্ত্রগ্রন্থে দেবতার পূজাপদ্ধতিরই প্রাধান্য দেখিয়া মনে হয়, এই দেবতারও সেইরূপ পদ্ধতি গ্রন্থের অপর অজ্ঞাত খণ্ডবিশেষে বিবৃত হইয়াছে।

ত্রিনাথ

পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যার নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত এক লৌকিক দেবতার নাম ত্রিনাথ। ইঁহার কোনও মূর্তি, মন্দির বা উপাসনার নির্দিষ্ট স্থান নাই। সাধারণ দেবতার পূজার মত ইঁহার পূজায় পুষ্প বিল্বপত্র বা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। যে কোন দিন সন্ধ্যার সময় উঠানে বা বারান্দায় কয়েক জনে মিলিত হইয়া ইঁহার আরাধনা করা যায়। এজন্য দরকার মাত্র তিনটি পয়সার—এক পয়সার সরিষার তেল, এক পয়সার পান-সুপারি এবং এক পয়সার গাঁজা। জিনিষগুলি তিন ভাগে সাজাইতে হয়। সরিষার তেলে তিনটী প্রদীপ জ্বালাইতে হয়। পান-সুপারি তিন ভাগে রাখিতে হয় এবং তিন কলিকা গাঁজা তৈয়ারী করিতে হয়। এইগুলি পূজার অপরিহার্য উপকরণ। তবে সমাগত লোকদের জন্য কিছু বাতাসারও ব্যবস্থা সাধারণতঃ করা হয়। উপকরণগুলি সামনে সাজাইয়া দেবতার উপাখ্যান বা কথা বলা হয়। তারপর দেবতার মাহাত্ম্যসূচক গান ও ছড়া[১] আবৃত্তি, প্রসাদ

১। ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়া অঞ্চলে নিম্নলিখিত ছড়াগুলি সুর করিয়া আবৃত্তি করা হয়:—

আমার ঠাকুর তেন্‌নাথ কিছু নয় রে খায়।
এক পয়সার ত্যাল দিয়া তিন বাতি জ্বালায়।
আমার ঠাকুর তেন্‌নাথ কিছু নয় রে খায়।
এক পয়সার পানগুয়া তিন ভাগে সাজায়।
আমার ঠাকুর তেন্‌নাথ কিছু নয় রে খায়।
এক পয়সার গাজা দিয়া তিন কল্‌কি সাজায়।
আমার ঠাকুর তেন্‌নাথ যে করিবে হেলা।
হাত পাও শুকাইয়া যাবে বস্ত্র হইবে কালা।
আমার ঠাকুর তেন্‌নাথ যে করিবে হেলা।
হাত পাও শুকাইয়া যাবে চউখ দিয়া বাইর হবে ড্যালা।
কলিতে তেন্‌নাথের মেলা।
খোড়ায় নাচে কাণায় দেখে বোবায় বোলে বোমভোলা।
সাধু রে ভাই দিন গেলে তেন্‌নাথের নাম লইও।
তেল খায় ব্রহ্মা[র]রে ভাই বিষ্ণু[র] খায় রে পান।
মহাদেবের সিদ্ধি খাইলে শীতল হয় রে প্রাণ।

বিক্রমপুরে প্রচলিত রমাই ফকিরের রচিত কয়েকটি ছড়া শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিক্রমপুরের ইতিহাসে (প্রথম সংস্করণ—পৃ. ৩১২) প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রহণ ও গঞ্জিকাসেবন। কয়েক জনে মিলিত হইয়া অনুষ্ঠান করা হয় বলিয় ইহার নাম ত্রিনাথের মেলা। সংসারের নানাবিধ বিপদ্ আপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ত্রিনাথের মেলা মানত করা হয়।

চৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বন্তরি মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অষ্টাদশ খণ্ডে (পৃ. ২৫-৭) ত্রিনাথের মাহাত্ম্যসূচক এক উপাখ্যানের বিবরণ দিয়াছিলেন।[২] তাঁহার এই উপাখ্যান কোন্ স্থান হইতে সংগৃহীত, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। তবে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এই দেবতার কোনও পাঁচালি তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রবন্ধের পাদটীকায় পত্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছিলেন—'আমরা উহা সংগ্রহ করিয়াছি। আগামী সংখ্যায় উক্ত পাঁচালীর বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।' দুঃখের বিষয়, পরিষৎ-পত্রিকায় এই পাঁচালি লইয়া এ পর্যন্ত আর কোনও আলোচনা হয় নাই। ত্রিনাথের পাঁচালির কোনও পুথি সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় নাই। কিন্তু ত্রিনাথের পাঁচালি নামে একাধিক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে কোন কোনখানি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন—অধিকাংশই আধুনিক। ইহাদের মধ্যে মহেশচন্দ্র দাস-রচিত পাঁচালি ১০৫নং অপার চিৎপুর রোড হইতে কানাইলাল শীল কর্তৃক (কলিকাতা, ১৩৩৬) ও ৮২নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট হইতে তারাচাঁদ দাস কর্তৃক (কলিকাতা, ১৩৪১) প্রকাশিত। তারাচাঁদের প্রকাশিত পুস্তিকা নবম সংস্করণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই পাঁচালি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন হওয়া সম্ভব। প্রধানতঃ ইহাতে বর্ণিত কাহিনী অবলম্বন করিয়া কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন (১৬২নং নিমু গোস্বামীর লেন হইতে শ্রীজগন্নাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত —সন ১৩৩৫ সাল) ও অশ্বিনীকুমার সোম তত্ত্বনিধি (প্রকাশক, এ. কে. সোম এণ্ড সন্স, সোম লাইব্রেরী, ফেনী, নোয়াখালী—১৩৩৮) দুইখানি পাঁচালি রচনা করেন। খুলনার ডাক্তার অম্বিকাচরণ বিশ্বাস (বাইসান্তা, পোঃ—চালনা) ১৩২৫ সালে উড়িয়া ভাষা হইতে অনূদিত একখানি পাঁচাল প্রকাশ করেন। তাঁহার অবলম্বিত মূল উড়িয়া পুথি ত্রিনাথমেলা নামে কাঁথির নীহার

২। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার বিক্রমপুরের ইতিহাসে (প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৩৭২) ও অচ্যুতচরণ চৌধুরী শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে (১৮৮) বিক্রমপুর ও ত্রিপুরায় এই দেবতার পূজার উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রেস হইতে বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে (সপ্তবিংশ সংস্করণ—সন ১৩৪০ সাল)।

বিভিন্ন স্থান হইতে প্রকাশিত এই সমস্ত পুস্তিকা ত্রিনাথের জনপ্রিয়তার নির্দশন সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যে বর্ণিত মূল কাহিনীর ঐক্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়[৩]। এই কাহিনীতে দেবতার স্বরূপের যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক।

ও হে হরি দীনবন্ধু অনাথ জনার বন্ধু
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি মহেশ্বর।
তিন দেব একত্তরে পূজা প্রকাশের তরে
ত্রিনাথ হইল তদন্তর ॥—মহেশচন্দ্রের পাঁচালি।

বাংলা কাহিনী হইতে উড়িয়া কাহিনীটি বিস্তৃততর। মূল কাহিনীটি এইরূপ— এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সর্বস্ব একটী গরু হারাইয়া যায়। আত্মহত্যা করিতে উদ্যত নিরুপায় ব্রাহ্মণ দৈববাণীদ্বারা ত্রিনাথের পূজা করিতে আদিষ্ট হন। দেবতার নির্দেশে তিনি নদীতীরে তিনটি পয়সা পাইয়া উহা দিয়া তেল, গাঁজা ও পান কেনেন। তিনি কোঁচার কাপড়ে তেল লইতে চাহিলে মুদি তাঁহাকে ঠকাইবার চেষ্টা করে ও নিজে অপদস্থ হয়। ব্রাহ্মণ ত্রিনাথের ধ্যানে মগ্ন হইলে তাঁহার গুরু আসিয়া উপস্থিত হন এবং লাথি মারিয়া সমস্ত পূজোপকরণ নষ্ট করিয়া দেন এবং সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এদিকে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরে শিষ্যের অনুগ্রহে ত্রিনাথের কলিকাপোড়া ভস্ম গায়ে মাখাইয়া তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিতে সমর্থ হন। ফলে তিনি নিজেও ত্রিনাথের মেলার আয়োজন করেন। অনেক লোক সেই উপলক্ষ্যে তাঁহার বাড়ী আসিতে থাকে। পথে এক বোবা ও খঞ্জ যাত্রীদের নিকট ত্রিনাথের বৃত্তান্ত শুনিয়া পূজা মানত করিল এবং তাহাদের অন্ধত্ব ও খঞ্জত্ব দূর হইল।

উড়িয়া কাহিনীর মতে ব্রাহ্মণের এই নবীন দেবতার পূজায় রাজা অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পূজায় বাধা দেন এবং নানারূপে বিপন্ন হন। পরে ত্রিনাথের পূজা

৩। আশ্চর্যের বিষয়, ধন্বন্তরি মহাশয় বর্ণিত উপাখ্যানের সহিত এই কাহিনীর মিল নাই। এক বণিকের উপদেশে ত্রিনাথের পূজা করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যমুক্ত হইবার কথা উপাখ্যানে আছে।

করিয়া বিপন্মুক্ত হন। এক সদাগর ত্রিনাথের পূজা বিস্মৃত হইয়া কিরূপে বিপন্ন হন ও ত্রিনাথের কৃপায় উদ্ধার পান, তাহার কাহিনীও উড়িয়া পাঁচালিতে দেওয়া হইয়াছে। গুরুর কাহিনী উড়িয়া পাঁচালিতে একটু পৃথক্। এক বৈষ্ণব ত্রিনাথের মেলায় আসিতেন, তাঁহার গুরু একদিন তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে মেলায় আসিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন এবং মেলার জিনিষপত্র লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ফলে তিনি নানা বিপদে পড়েন ও পরে ত্রিনাথের কৃপায় উদ্ধারলাভ করেন।[৪]

[৪। শ্রীসুকুমার সেন বলিয়াছেন, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও সত্যনারায়ণ মিলিয়া ত্রিনাথে পরিণত হইয়াছেন ইহা কোন কোন পুথিতে পাওয়া যায়। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮২২)।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে গোরক্ষনাথ, মীননাথ ও হাড়িপা এই তিন নাথই ত্রিনাথ নামে পরিচিত (গোপীচন্দ্রের গান, পৃঃ ১৸০)।]

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য চর্চা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা অবধি আজ প্রায় সত্তর বৎসর ধরিয়া নিয়মিত ভাবে শিক্ষিত বাঙালি সমাজে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চর্চা চলিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত আরবী ফারসী প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় এসিয়াটিক সোসাইটী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে যে পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ও সেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার কার্য আরম্ভ করে। এসিয়াটিক সোসাইটির মত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ও প্রাচীন পুথি সংগ্রহ, প্রাচীন পুথির বিবরণ সংকলন ও প্রকাশ এবং প্রাচীন গ্রন্থের গবেষণামূলক সংস্করণ প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করে। ক্রমে অন্যান্য কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ও স্বতন্ত্রভাবে কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। ফলে আজ আমরা প্রাচীন বাংলার ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান্ তথ্য জানিতে পারিয়াছি—বিপুল প্রাচীন সাহিত্যসম্পদের প্রচুর নিদর্শন আজ আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে। আজ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। শিক্ষার উচ্চতম স্তরেও অনেকে এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। তবে এই অবস্থায় আত্মসন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না—আমাদিগকে কঠোর ভাবে আত্মপরীক্ষা করিতে হইবে—আমাদিগের দোষত্রুটি অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে—যাহাতে অবস্থার উন্নতি হইতে পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আমাদের প্রধান অসুবিধা এই যে আমাদের গণ্ডী অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ—প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ফলে কৃত কার্যের নিন্দা ও প্রশংসার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। বস্তুতঃ বাংলা—বিশেষ করিয়া প্রাচীন বাংলা—সম্পর্কে গবেষণার সার্থক সমালোচনা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কর্মীদের উৎসাহের অভাব ঘটে এবং আশানুরূপ ভাল কাজের পরিমাণ খুব কম হয়।

কার্যের গুরুত্ব ও ইহার আনুষঙ্গিক অসুবিধার কথা বিবেচনা করিলে ইহাতে যথোচিত উৎসাহদানের প্রয়োজন অনুভূত হইবে। প্রাচীন পুথির

বিবরণ সংকলন ও প্রাচীন গ্রন্থের সংস্করণ প্রণয়ন আপাতদৃষ্টিতে যতটা সহজ মনে হয় আসলে ইহা তত সহজ নয়। এই কার্যের জন্য বিশেষ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। পুথির বিবরণ প্রণয়নের কাজে দীর্ঘ সময় ও প্রচুর পরিশ্রমের দরকার হয়। পুথির বিষয়বস্তু, ইহার বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করিয়া সমবিষয়ের অন্য পুথির সঙ্গে ইহার পার্থক্য প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গের যথাসম্ভব আলোচনা পুথির বিবরণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ও অক্স্‌ফোর্ডের বোডলিঅন লাইব্রেরির সংস্কৃত পুথির বিবরণ এই দিক্ দিয়া আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, এই আদর্শকে আমরা আমাদের কার্যের মধ্যে এখনও প্রতিফলিত করিতে পারি নাই। আমরা সাধারণতঃ পুথির আরম্ভ, মধ্য ও শেষ হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়াই আমাদের কার্য সমাপ্ত করি। বস্তুতঃ পুথি আলোচনার ব্যাপারে আমরা এখন পর্যন্ত যথোচিত সাফল্যলাভ করিতে পারি নাই। নানা প্রতিষ্ঠানে বিস্তর পুথি সংগৃহীত হইয়াছে সত্য কিন্তু অনেক সংগ্রহের বিবরণ ত দূরের কথা, কোন তালিকা পর্যন্ত প্রকাশিত বা সংকলিত হয় নাই। অথচ কোথায় কি পুথি আছে তাহা জানিতে না পারিলে—তাহার বিবরণ না পাইলে এবং পণ্ডিতসমাজের মধ্যে তাহার আদান প্রদান ও ব্যবহারের সুব্যবস্থা না হইলে পুথির যথোচিত আলোচনা হইতে পারে না—ইহাকে সার্থক ভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে না। এজন্য যেমন দ্রুত সমস্ত সংগ্রহের বিবরণ বা তালিকা সংকলনের বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন বিবরণ ও তালিকা অবলম্বনে প্রস্তুত একখানি কোষগ্রন্থের। সংস্কৃত পুথি সম্পর্কে সংকলিত এইরূপ কোষ গ্রন্থ 'ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগোরাম' যাঁহাদের সংস্কৃত পুথি ব্যবহার করিতে হয় তাঁহাদের পক্ষে অপরিহার্য। ইহার আদর্শে বাংলায় একখানি প্রাচীন সাহিত্যকোষ সংকলনের প্রস্তাব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্তৃক প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্বে গৃহীত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে ঐ প্রস্তাব এখন পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয় নাই।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রাচীন গ্রন্থের সংস্করণের উৎকর্ষ ও গৌরব পুথি আলোচনার ত্রুটিহীনতা ও নৈপুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য চাই যথেষ্ট শিক্ষা ও প্রচুর অভ্যাস। যদৃচ্ছাক্রমে সংগৃহীত একাধিক পুথির একখানির পাঠকে মূলপাঠ রূপে গ্রহণ করিয়া মধ্যে মধ্যে অপর পুথিগুলিতে প্রাপ্ত পাঠান্তর লিপিবদ্ধ করিলেই বৈজ্ঞানিক সংস্করণ প্রস্তুত হয় না। লিপিকাল

ও লিপিস্থান হিসাবে পুথিগুলিকে সাজাইয়া তাহাদের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট ধারা আবিষ্কার করিতে পারিলে পাঠবিচার ও প্রকৃত পাঠনির্ণয়ের সুবিধা হইতে পাবে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সংগৃহীত পুথি এবং ভারত ও বৃহত্তর ভারত হইতে সংগৃহীত অন্যান্য উপকরণ বিশ্লেষণ করিয়া পঞ্চতন্ত্র, মহাভারত ও রামায়ণ গ্রন্থের আদর্শ সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছে ও হইতেছে। সমগ্র বাংলা দেশ ও ইহার ব্যাপক অংশ জুড়িয়া প্রচলিত প্রাচীন গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে এইরূপ চেষ্টা করা যাইতে পারে। তবে একজনের চেষ্টায় এ কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এজন্য সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা আবশ্যক। চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ-প্রকাশের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এইরূপ চেষ্টার আয়োজন কবিয়াছিলেন। তাহারই আনুষঙ্গিক ফল শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'। শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে এই জাতীয় চেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। দীর্ঘদিন এদিকে আর তেমন কোনও চেষ্টাব পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। এবিষয়ে তৎপর হওয়া আমাদের জাতীয় বর্তব্য।

যে সমস্ত গ্রন্থের প্রসিদ্ধি ও প্রচার ক্ষুদ্র অঞ্চলবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ—যাহাদের প্রাপ্ত পুথির সংখ্যা নগণ্য—এক বা দুইখানি মাত্র—তাহাদের স্থলে পুথির তুলনামূলক আলোচনা সম্ভবপর নয়। তাই সেক্ষেত্রে পাঠনির্ণয়ের জন্য বহিঃপ্রমাণের উপর বেশী নির্ভর করিতে হয়। এজন্য গ্রন্থসম্পাদকের নানাবিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া, প্রাচীন সাহিত্যের সহিত ব্যাপক পরিচয় এই প্রসঙ্গে বিশেষ উপযোগী। প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের পুথি প্রায়শই অশিক্ষিত লোকের হস্তলিখিত এবং বর্ণাশুদ্ধিবহুল—বানানের কোন সুনিদিষ্ট নিয়ম প্রাচীন বাংলা পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অধুনা প্রকাশিত সংস্করণে পুথির বানান অপরিবর্তিত রাখা হইবে বা পরিবর্তিত হইবে এবং পরিবর্তন করিতে হইলে কতটা ও কিরূপ পরিবর্তন সঙ্গত হইবে তাহা ধীরভাবে বিচার করিয়া ঠিক করা দরকার—সম্পাদকের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে এবং হইতেছে। তাহা ছাড়া, অধুনা অপ্রচলিত গ্রাম্য ভাষায় অপরিচিত গ্রাম্য আচার-ব্যবহারের যে সব বর্ণনা ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহাদের প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করা বা তাৎপর্য গ্রহণ করা দুরূহ। প্রাচীন ভাষা, সাহিত্য, গ্রাম্যভাষা ও লোকাচারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

পরিচয় ছাড়া এ কার্য সম্ভবপর নয়। অথচ একত্র এরূপ বহুগুণের সমাবেশ দুর্লভ। ফলে প্রাচীন গ্রন্থের ত্রুটিহীন আদর্শ সংস্করণের অভাব অনুভূত হইতেছে—প্রকাশিত সংস্করণের পঠনপাঠনে নানা অসুবিধা দেখা যাইতেছে। একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাঠ্যরূপে নির্বাচিত প্রাচীন গ্রন্থগুলির অনেক অংশ আমাদের নিকট দুর্বোধ্য। প্রাচীন গ্রন্থের সংস্করণগুলির টীকাটিপ্পনী যথেষ্ট নহে। পক্ষান্তরে, অনেকক্ষেত্রে ইহা ভ্রম ও অপব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে আমরা অনেকটা উদাসীন। গ্রন্থের পঙ্‌ক্তিব্যাখ্যা আজ উপেক্ষিত—প্রাচীন বা আধুনিক সাহিত্যগ্রন্থের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা আজ অনাদৃত। এমন কোন গ্রন্থ নাই যাহার সাহায্যে এই সমস্ত গ্রন্থের অর্থবোধ সুসাধ্য হইতে পারে। প্রাচীন বাংলা শব্দকোষ,গ্রাম্য শব্দকোষ ও লোকাচারকোষ সংকলিত হইলে অসুবিধা অনেকটা দূর হইতে পারে। কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের খ্যাতনামা সম্পাদক শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ মহাশয় একখানি প্রাচীন বাংলা শব্দকোষ সংকলনের কল্পনা করিয়াছিলেন। সে কল্পনা কার্যে পরিণত হয় নাই। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে সংযোজিত শব্দসূচীর মধ্যে এই শব্দকোষের মূল্যবান্ উপকরণ সংগৃহীত হইয়া আছে। গ্রাম্য শব্দকোষের সংকলন সম্পর্কে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বাংলার বিভিন্ন অংশের বহু শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অনেকগুলি সংগ্রহ পরিষৎপত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। অন্য কোন কোন পত্রিকায় ও স্বতন্ত্র পুস্তকেও এইরূপ শব্দ প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসী পত্রিকায় (১৩৪৯ জ্যৈষ্ঠ) রবীন্দ্রনাথের অন্তিম অভিলাষ-অনুযায়ী একখানি গ্রাম্য শব্দকোষ প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমিও এ বিষয়ে কৃত কাযের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলাম (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৯)। দীর্ঘ দিন পূর্বে যে কাযের সূচনা হইয়াছিল—নানা মনীষী নানাভাবে যাহাকে পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা ও বাঙালির পরম প্রয়োজনীয় সেই কার্য আজও উপেক্ষিত অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে?

বাংলার লৌকিক দেবতা ও লোকাচারের বহু বিবরণ বিক্ষিপ্তভাবে নানা পত্রিকা ও পুস্তকের পৃষ্ঠায় ছড়ানো রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই বিবরণসংগ্রহের মূল্য সম্বন্ধে ছাত্রসমাজকে উদ্‌বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই

কাজের জন্য ছাত্রদের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আবেদন কতটা সার্থক হইয়াছিল বলিতে পারি না। তবে, নিয়মবদ্ধভাবে এ বিষয়ে কোনও কাজই এখন পর্যন্ত হয় নাই। আর এক মস্ত অসুবিধা এই যে, কোন বিষয়ে কেহ কিছু প্রকাশ করিলে সহজে তাহার সন্ধান পাওয়া ও সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয় লাভ করার কোন ব্যবস্থা নাই। নিয়মিত গ্রন্থপঞ্জী বা প্রবন্ধপঞ্জী প্রকাশিত না হইলে এ অসুবিধা দূরীভূত হইতে পারে না। 'সাহিত্যবার্তা' নাম দিয়া কয়েক বৎসর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এই পঞ্জী-প্রকাশের সূচনা করা হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে তাহা স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। ১৩৪৩ সালে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের বিংশ অধিবেশনে এই সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার কোন চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া জানি না।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন আধুনিক-পূর্ব যুগে সাধারণ লোকের মধ্যেই প্রচলিত ছিল—শিক্ষিত সমাজে ইহার তেমন আদর ছিল না। শিক্ষিত সমাজ সংস্কৃত ও আরবী-ফারসীব চর্চায় ব্যস্ত থাকিতেন—দেশজ ভাষায় রচিত গ্রন্থকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা দূরে থাকুক ইহাকে স্পষ্টতঃ অবজ্ঞা করিতেন—এই ভাষার লেখকেরা শিক্ষিতসমাজে তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন না। দেশজ ভাষায় পুরাণকাহিনী শ্রবণ বা পাঠ করিলে নরকভোগ করিতে হয়—এই ভাষায় রামায়ণ-মহাভারত রচনা করিয়া কৃত্তিবাস কাশীদাস দেশের সর্বনাশ করিয়াছেন—এই ছিল দেশের শিক্ষিতসমাজের অভিমত। রাজা কংস বা গণেশ বা হোসেন শাহ, পরাগল খান, ছুটি খানের মত ক্বচিৎ দুই একজন রাজা, নবাব বা রাজদরবারের লোকের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা কোন কোন লেখকের ভাগ্যে জুটিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রায় সকলেরই আসল পৃষ্ঠপোষক জনসাধারণ। জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রাচীন কবিগণ কাব্যরচনা করিতেন—জনসাধারণের আসরে তাঁহাদের কাব্য গীত বা পঠিত হইত—তাহারা ইহা শুনিয়া পুণ্যার্জন করিত। সাধারণ লোকের জন্য রচিত এই সাহিত্য স্বভাবতই শিক্ষিত সমাজের তৃপ্তিবিধান করিতে পারিত না—তাঁহারা সংস্কৃত বা ফারসীর মারফত তাঁহাদের সাহিত্য-রসপিপাসা পরিতৃপ্ত করিতেন—নিজেদের মাতৃভাষায় রচিত গ্রন্থ তাঁহারা আলোচনার যোগ্য বিবেচনা করিতেন না। এই অবস্থায় প্রাচীন বাংলাভাষায় রচিত সাহিত্য যথোচিত উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে অল্পশিক্ষিত সাধারণের মধ্যে ইহার আলোচনা

সীমাবদ্ধ থাকায় কালক্রমে নানারূপ বিকৃতি ও অশুদ্ধি ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে ইহার আসন নির্দিষ্ট হইলেও ইহা ছাত্রসমাজে বা শিক্ষিত মহলে তেমন সমাদর ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। ছাত্রদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনা পরীক্ষার প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যচর্চাকে যাঁহারা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এমন পণ্ডিতের সংখ্যা নগণ্য। অথচ নিছক সাহিত্যের দিক্ দিয়া এই সাহিত্যের মূল্য যাহাই হউক না কেন ইতিহাসের দিক্ দিয়া—ভাষাতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ধর্মতত্ত্বের দিক্ দিয়া—ইহার মূল্য অবিসংবাদিত। প্রকৃত দেশকে যদি জানিতে হয়, দেশের জীবনধারার সঙ্গে যদি পরিচয় লাভ করিতে হয় তাহা হইলে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দ্বারস্থ হইতে হইতে হইবে—ইহার প্রতিটি পঙ্‌ক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিতে হইবে—ইহার যথার্থ পাঠ উদ্ধার করিয়া অর্থ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হইবে।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, নানা দিকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যচর্চার বিস্তৃত ক্ষেত্র রহিয়াছে। এজন্য উপযুক্ত কর্মী গড়িয়া তুলিতে হইবে—কর্মসম্পাদনের যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যাঁহাদের অনুরাগ আছে তাঁহাদের সকলকেই এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে এবং যথাশক্তি এই কার্যের সহায়তা করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

পুথির কথা

শতাধিক বৎসর যাবৎ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত প্রাচীন পুথির অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ চলিয়া আসিতেছে। ফলে, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ইতিহাস সমাজতত্ত্ব লিপিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে—ভারতীয় সাহিত্যের বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছেন। আবিষ্কৃত প্রাচীন পুথির সাহায্যে অনেক অজ্ঞাত অল্পজ্ঞাত নষ্টপ্রায় গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার সম্ভবপর হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের পুথির সাহায্যে মহাভারত প্রভৃতির ন্যায় সুপরিচিত ও প্রক্ষিপ্ত অংশে ভারাক্রান্ত গ্রন্থের যথা-সম্ভব বিশুদ্ধ পাঠনির্ণয়ের কার্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু এখনও দেশের সমস্ত পুথির সন্ধান পাওয়া যায় নাই—যে সকল পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদেরও সংগ্রহ, সংরক্ষণ বা সম্যক্ আলোচনার যথোচিত সুব্যবস্থা হয় নাই। অথচ এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক না হইলে—সত্বর যথাবিহিত ব্যবস্থা না করিলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা[১]।

দেশের বিবিধ প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে পুথিই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা ভঙ্গুর—অথচ পুথির মধ্যে দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের যত তথ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে এত আর কোথাও নাই। দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে প্রাচীন জীর্ণ পুথির পাতা হইতে অমূল্য তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। দেশের শিল্প-সম্পদের প্রত্যক্ষ নিদর্শনগুলির সংরক্ষণের যথাসম্ভব সুব্যবস্থার জন্য পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন। কিন্তু সেই শিল্প-সৃষ্টির বিধি যে সমস্ত গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের তাদৃশ ব্যবস্থা কোথায়? বস্তুতঃ, এই কার্যের জন্য পুরাতত্ত্ব বিভাগের একটি স্বতন্ত্র শাখার প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, পুরাতত্ত্ব

১ এ বিষয়ে ঔদাসীন্য বা কালক্ষেপের বিষময় পরিণামের কথা একাধিক মনীষিকর্তৃক অতি স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে। Gough-সংকলিত Collection and Preservation of Ancient Sanskrit Literature নামক গ্রন্থের ৭, ২৪ ও ২১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিভাগ এ সম্পর্কে উদাসীন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এ বিষয়ে এই বিভাগের একটা আশাপ্রদ আগ্রহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল—এই বিভাগের চেষ্টায় স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহচর্যে প্রায় বার হাজার প্রাচীন পুথি সংগৃহীত ও কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। অবশেষে, এসিয়াটিক সোসাইটীর হস্তে ইহাদের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া পুরাতত্ত্ব বিভাগ অব্যাহতিলাভ করিয়াছেন।

দেশের জনসাধারণের—এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ বিষয়ে তাদৃশ আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় না। সত্য বটে, দেশের বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে পুথিসংগ্রহ একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে—বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনুষ্ঠিত নানা প্রদর্শনীতে পুথিপ্রদর্শন একটা শোভার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সংগৃহীত পুথির সংরক্ষণ, বিবরণ-সংকলন, এমন কি তালিকা-প্রণয়ন পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ফলে, স্তূপীকৃত পুথির রাশি ক্রমে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা পুথির যে রকম যত্ন করিতেন—তাঁহাদের খড়েব ঘবেব বাঁশের মাচাব উপর পুথিগুলি যে-আদর পাইত—বর্তমানে দোতলা তিনতলা বাড়ীর সুন্দর লাইব্রেরী ঘরের দামী আলমারিতে আবদ্ধ পুথিগুলি সে আদর পাইতেছে না। তাই দুরন্ত পোকা সেগুলিকে নষ্ট করিতেছে। আগেকার দিনে পণ্ডিতেরা পুথিগুলি নিয়মিত নাড়াচাড়া কবিতেন—মাঝে মাঝে বৌদ্রে দিতেন এবং ঝাড়িতেন—তাহাদিগকে যেমন পুত্রের মত আদব করিতেন, তেমনই কাপড় ও দড়ি দিয়া তাহাদিগকে শত্রুর মত বাঁধিয়া রাখিতেন। ফলে পুথি নষ্ট হইত কম।

সত্য সত্যই পুথির রক্ষণাবেক্ষণ অতি কষ্টসাধ্য। ঝাড়-পোছের জন্য নিয়মিত লোকের ব্যবস্থা করা ও তাহাব কার্যের তদারক করা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তার পর, কি উপায়ে সহজে ইহাদের রক্ষার সুব্যবস্থা হইতে পারে তাহা এখনও নির্ধারিত হয় নাই। কতদিনই বা কালের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই ক্ষণভঙ্গুর জীর্ণ পত্রগুলিকে অনিবার্য ধ্বংসের কবল হইতে বাঁচাইয়া রাখা যাইবে? মূল্যবান্ পুথিগুলির নকল করা বা আলোকচিত্র সাহায্যে প্রতিলিপি গ্রহণ করা অনেক সময় ও ব্যয়সাধ্য। তাই

বহু অর্থ ও পরিশ্রমের দ্বারা সংগৃহীত অনেক অমূল্য পুথি বিভিন্ন প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানেও চক্ষের সম্মুখে নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

যথোচিত আলোচনা ও মুদ্রণের সাহায্যে পুথিগুলির রক্ষার একটা ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু তাহা অনায়াসসাধ্য নহে। সমস্ত পুস্তক মুদ্রণযোগ্য নহে। মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও সকল ক্ষেত্রে সে কার্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর নহে। কেবল একখানি পুথি থাকিলেই মুদ্রণ করা চলে না। মুদ্রণের জন্য নানা অসুলভ বিষয়ের একত্র সমাবেশের প্রয়োজন—চাই অর্থ, চাই উপযুক্ত সম্পাদক, চাই একাধিক পুথি। তাই অনেক ক্ষেত্রে পুথির বিস্তৃত বিবরণ সংকলন ও আলোচনা বিশেষ উপযোগী। এই বিবরণ ও আলোচনার ফলে পুথির প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হইতে পারে—অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির গোচরীভূত হইতে পারে। অবশ্য এরূপ, কার্যও সুসাধ্য নহে—ইহার জন্যও দীর্ঘ সময়, প্রচুর অর্থ ও উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ জাতীয় কার্য করিবার আশা সুদূর-পরাহত। কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। প্রাচীন পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের বড় আদরের পুথিগুলি আজ অনেকের গৃহে অনাদরে উপেক্ষায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সেই সকল পুথি সংগ্রহ করিয়া কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানে সাধারণের আলোচনার সুবিধার জন্য সমবেত করার মূল্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু পুথির রাশি স্তূপীকৃত করিয়া রাখিলে—যক্ষের ধনের মত সেগুলিকে গৃহকোণে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাতে লাভ কি? এইভাবে পুথিসংগ্রহের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি পায় কি? অনেক প্রতিষ্ঠানে পুথি যেভাবে রক্ষিত হইতেছে তাহা আদৌ প্রশংসনীয় নহে। অপ্রিয় হইলেও একথা বর্ণে বর্ণে সত্য যে, কৃপণের মত আমরা সঞ্চয়েই পরিতৃপ্ত—সঞ্চিত বস্তুর সদ্ব্যবহারের আগ্রহ আমাদের নাই।

এই বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে—সাধারণের কর্তব্যবোধ জাগরিত করা। আমাদের পূর্বগৌরবের অমূল্য নিদর্শনগুলি—আমাদের পিতৃপিতামহের প্রাণাধিক আদরের সম্পদ্গুলি কিভাবে অতি দ্রুত বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহা যদি দেশের জনসাধারণ বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে এই জাতীয় সম্পদ্-রক্ষার জন্য ব্যাপক চেষ্টা ও বিধিমত ব্যবস্থা হইতে পারে—সংগৃহীত ও নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত পুথিগুলির আলোচনার দিকে উৎসাহী ছাত্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। কেন্দ্রীয় কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

করিতে পারিলে সুফল লাভের আশা করিতে পারা যায়।[২] পুরাতত্ত্ব বিভাগের লেখশাখার মত (Epigraphic Department) একটী পুথিশাখার (Manuscripts Department) প্রতিষ্ঠা ও ভারতীয় লেখমালা পত্রিকার মত (Epigraphia Indica) একটী পুথিবিবরণ পত্রিকা (Manuscriptia Indica) প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে কার্যের অনেক সুবিধা হইতে পারে। এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান পুথিরক্ষা ও পুথির বিবরণসংকলন-বিষয়ে আদর্শপদ্ধতি নির্দেশ করিতে পারেন।[৩] অন্য দেশে কিভাবে কার্য হয় তাহার আলোচনা দ্বারা অনেক উপকার লাভ হইতে পারে। পুথির বিবরণসংকলন-বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট সুশৃঙ্খল পদ্ধতি নির্ধারিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। নানা প্রতিষ্ঠান হইতে বর্ত্তমানে পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু পুথি লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহারা জানেন এই সব বিবরণ অনেক ক্ষেত্রেই নিতান্ত বাহ্যিক। অতি সাধাবণ লোকের সাহায্যে এই জাতীয় বিবরণ সংকলিত। ইহার মধ্যে থাকে পুথির পাতার মাপ, পঙ্‌ক্তিসংখ্যা, পত্রসংখ্যা, অক্ষরসংখ্যা, প্রারম্ভ ও অন্ত। পুথি পড়িয়া তাহার বিষয় বুঝিবার প্রয়োজন হয় না—অথবা অতি সাধারণভাবে পুথির বিষয় নির্দেশ কবিয়াই কাজ শেষ করা হয়। প্রকাশিত গ্রন্থের সহিত পুথির পার্থক্য কোথায়—পুথির আলোচ্য বিষয়ের বৈশিষ্ট্য কি—এ সব বিষয় প্রায়শই এই সকল বিবরণগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। নামহীন অনেক পুথির নাম পর্যন্ত বাহির করিবাব পরিশ্রম স্বীকার করা হয় না। ফলে সাধাবণ তালিকা অপেক্ষা সেগুলির মূল্য অনেক ক্ষেত্রেই বেশী নহে। তাব পর তাহাদের মধ্যে যে সমস্ত ভুল থাকে তাহা বিশেষ কৌতুককর। বিবরণবচায়তাব নাম উল্লেখ না করিয়া আমি এস্থলে মাত্র দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। 'শিবার্চনচন্দ্রিকা' নামক বিবিধ দেবতার উপাসনার বিবরণপূর্ণ বিস্তৃত

২। ভারত সরকারের প্রযোজকতায় ও নেতৃত্বে ১৮৬৮-৬৯ সালে পুথির অনুসন্ধান ও অনুশীলনের কার্য নবীন উদ্দীপনাব সহিত বিভিন্ন প্রদেশে সূচনা করা হয়। ইহার ফলে কয়েক বৎসরে সারা ভারতে যে কাজ হয় তাহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ কেন্দ্রীয় ভারত সরকার কর্তৃক ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন স্থায়ী কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতি বা প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় নাই।

৩। ১৮৭০ সালে কিলহোর্ন সাহেব বিবরণসংকলনের এক সাধাবণ পদ্ধতি নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং সাধারণতঃ যে সকল ত্রুটি বিবরণগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আভাস দিয়াছিলেন (Gough সাহেব-সংকলিত পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের ১৯২—৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

তান্ত্রিক নিবন্ধগ্রন্থকে একজন শৈব নিবন্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৪] 'হরমেখলা' নামক দুর্বোধ্য আভিচারিক গ্রন্থের বিবরণ দিতে যাইয়া একজন এইমাত্র লিখিয়াছেন যে, ইহা ব্যক্তিবিশেষের উপযোগী হইতে পারে। আর একজন লিখিয়াছেন—ইহা বৈদ্যক গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কাব্য 'গোবিন্দলীলামৃতে'র রচয়িতার নাম রঘুনাথ দাস বলিয়া একাধিক বিবরণগ্রন্থে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অবশ্য এই সব ভুলের জন্য বিবরণ-রচয়িতার অজ্ঞতা অপেক্ষা শৈথিল্য ও ব্যস্ততা অধিক পরিমাণে দায়ী। এই সব বিবরণগ্রন্থের ত্রুটিবিচ্যুতি সহজে ধরা পড়ে না—কালে ভদ্রে কেহ বিবরণের অন্তর্গত কোনও পুথির আলোচনা করিতে গেলে তবেই এই সমস্ত দোষ ধরা পড়ে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের তৈয়ারী বিবরণেরও এইরূপ ত্রুটি মাঝে মাঝে ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগোরাম নামক প্রসিদ্ধ পুথির তালিকাগ্রন্থে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু এসব ত্রুটি অনেকটা অপরিহার্যবোধে সাধারণের গা-সহা হইয়া গিয়াছে। ত্রুটির জন্য যেখানে কৈফিয়ৎ দিবার আশঙ্কা নাই—উৎকর্ষের জন্য যেখানে প্রশংসালাভের সম্ভাবনা নাই—সেখানে শৈথিল্য স্বাভাবিক। বিশেষতঃ, কর্তৃপক্ষ অনেক স্থলেই বিবরণগ্রন্থের বিস্তৃতিদর্শনেই পরিতৃপ্ত—দ্রুত কার্য-পরিসমাপ্তির জন্য তাঁহারা উৎসুক। ফলে, বিবরণের ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষগণ অনেক ক্ষেত্রে উৎকর্ষাপকর্ষের দিকে দৃষ্টি না দিয়া যে কোন প্রকারে কার্য সমাধা করিয়া থাকেন। অবশ্য দীর্ঘ সময়ের সুযোগ প্রদান করিলেই যে কার্য সুসম্পন্ন হইবে এমন বলা যায় না। সকল বিশেষজ্ঞের কাজের মত এ কাজেও বিবরণ-রচয়িতার সাধুতা ও কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই।

তার পর সমালোচকের শ্যেনদৃষ্টি এবং উচ্চ আদর্শ অনেক পরিমাণে কার্যের উৎকর্ষসম্পাদনে সহায়তা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুথির বিবরণের কার্য অনেকের নিকট একটা অতি সাধারণ অনতিগৌরবজনক কার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তাই ইহার ভালমন্দ-বিচারের জন্যও বেশী লোক ব্যস্ত নহেন। উচ্চ আদর্শের অভাবও পদে পদে অনুভূত হয়। সত্য বটে, এগ্‌লিং, আউফ্রেক্‌ট, ওএবর প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ যে সমস্ত কার্য করিয়া গিয়াছেন তাহা আদর্শ-রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু সে আদর্শ আমাদের দেশে তেমন অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ, তদনুসারে আমাদের দেশে

। কেবল নামদৃষ্টে গ্রন্থের বিষয়ের ইঙ্গিত দিতে গিয়া অনেকে এইরূপ ভ্রান্ত হইয়াছেন।

বেশী কাজ হয় নাই। ফলে আমাদের দেশে একটা উচ্চ আদর্শ গড়িয়া না উঠায় কার্যের তেমন উৎকর্ষ সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে না। প্রাচীন-লেখমালা পত্রিকায় (Epigraphia Indica) যেরূপ লেখসমূহের আদর্শ সংস্করণ প্রকাশিত হয় সেইরূপ প্রস্তাবিত পুথি-পত্রিকায় (Manuscriptia Indica) পুথির আদর্শ বিবরণ প্রকাশিত হইলে কর্মীদিগের সেই আদর্শ অনুসারে কার্য করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত হইতে পারে এবং আদর্শবিবরণ প্রস্তুত করার যে পরিশ্রম তাহা সার্থক হইতে পারে। বস্তুতঃ প্ররোচনা ও উৎসাহ না পাইলে গতানুগতিক পদ্ধতির উন্নতির আশা কম।

পুথির বিবরণ-সংকলনের কার্যে যাঁহারা রত তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্মের গুরুত্বের কথা ভুলিলে চলিবে না। বিবৃত পুথিগুলি যে সকল সময়ই উৎকৃষ্ট তাহা নহে। অনেক সময় বিবরণ-রচয়িতাকে আবর্জনা-পরিষ্কারের কাজ করিতে হয়। কত অপাঠ্য ভ্রম-পরিপূর্ণ অপ্রয়োজনীয় পুথি পড়িয়া তাঁহাকে তাহাদের বিবরণ সংকলন করিতে হয়। অপ্রয়োজনীয় বা বাজে বলিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। অনেক সময় বিবরণ-রচয়িতার দীর্ঘ পরিশ্রম নিষ্ফল হয়। কোন প্রকাশিতপূর্ব বা বিবৃতপূর্ব পুথির নামহীন অংশবিশেষ পাইয়া তিনি প্রথমে আনন্দে অধীর হইতে পারেন—কিন্তু দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর যখন অভিনবত্বের মোহ কাটিয়া যায় তখন তাঁহার সেই নিষ্ফল (?) পরিশ্রমের মূল্য যদি জনসাধারণ তাঁহাকে প্রদান না করে তবে তাঁহার কার্যে আগ্রহ আসিবে কোথা হইতে? এইরূপ পুথির প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করিয়া বিবরণ সংকলয়িতা ভবিষ্যৎ কর্মীর পথ পরিষ্কৃত করিয়া থাকেন, ইহা অস্বীকার করা চলে না। একই পুথি বা একই গ্রন্থকার অনেক সময়ে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন নামে পরিচিত[৫]। পুথির বিবরণ-সংকলনকালে এ রহস্যের উদ্‌ভেদ না করিলে ভবিষ্যতে কাজের অনেক অসুবিধা হয়। উদাহরণের দ্বারা আমি পাঠকেব ধৈর্যচ্যুতি ও প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাই না। তবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পাইলে পুথির বিবরণ-রচয়িতার নিকট হইতে এইরূপ অনেক উপযোগী

৫। খণ্ডিত পুথিতে অনেক সময় যে নাম পাওয়া যায় তাহা পরিচ্ছেদমাত্রের নাম—পূর্ণ গ্রন্থের নাম নহে। অথচ এই নাম অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থের আসল নামরূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ফলে একই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন বিবরণগ্রন্থে বিভিন্ন নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই নামসমস্যার সমাধান কালসাপেক্ষ হইলেও উপেক্ষণীয় নহে।

বষয়ে খবর পাওয়া যাইতে পারে। মোট কথা সর্বাঙ্গসুন্দর বিবরণ-সংকলনের জন্য সাধারণের উৎসাহ ও সহানুভূতি অবশ্যপ্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ, পুথিতত্ত্ব একটা স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এদিকে দৃষ্টিপাত করা এবং পুথিতত্ত্বপ্রবীণ এক দল ছাত্র গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা দরকার। এ বিষয়ে ধীর-স্থির নিপুণ কর্মীর প্রাচুর্য নাই—একথা অস্বীকার করা চলে না। অথচ পুথির সম্বন্ধে জানিবার ও বুঝিবার বিষয় অনেক আছে। সেই সকল দিকে অল্পের মধ্যে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য—কাহারও নিন্দা বা দোষপ্রদর্শন আদৌ ইহার লক্ষ্য নহে।

———

পুথির শেষ কথা

আমরা প্রাচীন পুথির বিষয়বস্তু, লিপিকাল ও উপকরণ লইয়া আলোচনা করি—মলাটের চিত্র ও কারুকার্যের বিচার করি। কিন্তু পুথির লেখক বা মালিকের কথা তেমন চিন্তা করি না। পুথির বিবরণ যাঁহারা সংকলন করেন, তাঁহারাও এদিকে তেমন দৃষ্টি দেন না। ফলে ইঁহাদের নিজস্ব কথা, যাহা সাধারণতঃ পুথির শেষের দিকে পাওয়া যায়, তাহা বিবরণের মধ্যে তেমন স্থান অধিকার করে না—অনেক ক্ষেত্রেই ইহা পূরাপূরি উদ্ধৃতও হয় না। এই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনাও এ পর্যন্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমি বর্তমান প্রবন্ধে পুথির এই অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত প্রসঙ্গের প্রতি পুথিরসিক-দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি, ভবিষ্যতে যাঁহারা পুথির বিবরণ সংকলন করিবেন, তাঁহারা এই বিষয়টি সম্পর্কে যথোচিত অবহিত হইবেন।

পুথির শেষের দিকে লিপিকর বা পুথির মালিকের যে সমস্ত উক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইতে সামাজিক ইতিহাসের দিক্ দিয়া মূল্যবান্ অনেক তথ্য সংকলিত হইতে পারে। পুথি সাধারণতঃ নিজের ব্যবহারের জন্যই নকল করা হইত—তবে অনেক ক্ষেত্রে পুণ্যার্জন বা দানও ইহার উদ্দেশ্য ছিল দেখা যায়। পুথি নিরতিশয় শ্রদ্ধার বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইত। ধর্মশাস্ত্রে পুস্তকদানের অশেষ মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। লিপিকরেরাও তাহার উল্লেখ করিতে ক্রটি করেন নাই। আমেদাবাদ হইতে প্রকাশিত 'প্রশস্তিসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে লিপিকরদিগের এইরূপ বহু উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৯, ২৭, ৩১, ৩৮, ৪৩, ৪৬, ৭১)। পুথি নকল করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, তাহার উল্লেখও এই সব উক্তির মধ্যে রহিয়াছে। উপযুক্ত পণ্ডিতকে বা দেবমন্দিরে পুথি দান করিয়া অনেকে গৌরব বোধ করিতেন (প্রশস্তিসংগ্রহ, ২।৩৭৫, ৩৮০ ৭৩৭, সোসাইটি [রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গলের পুথির বিবরণ] ৫।৩৭৩৫)। মুদ্রাযন্ত্র-প্রবর্তনের পরেও বিত্তবান্ ব্যক্তিরা বিপুল ব্যয়ে গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া বিতরণ কারয়া গিয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই প্রসঙ্গে বর্ধমানের মহারাজা কর্তৃক প্রকাশিত মহাভারত ও তাহার অনুবাদ, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদ, রাধাকান্তদেবের শব্দকল্পদ্রুম ও

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের ভাগবত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানেও শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে গীতা প্রভৃতি গ্রন্থদানের রীতি প্রচলিত আছে।

তবে গৌরবজনক না হইলেও পুথিবিক্রয়ের প্রথাও যে ছিল না এমন নয়। অনেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক লইয়া পুথি লিখিয়া দিতেন—অনেকে পুথি বিক্রয় করিতেন। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুথি আলোচনা করিলে এ সম্পর্কে বিস্তর কৌতুককর বিবরণ সংকলন করা যাইতে পারে। আমি এখানে এই প্রসঙ্গে কিছু আভাস মাত্র দিতেছি। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে অর্থের বিনিময়ে পুথির আদান-প্রদান চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'প্রশস্তিসংগ্রহ' নামক পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নকল-করা এইরূপ দুইখানি পুথির সাক্ষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে (১।১৬১, ১৫৩)। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পুথি-নকলের পারিশ্রমিকের হার অত্যন্ত বেশী ছিল বলিয়া রেভারেণ্ড ওআর্ড তাঁহার হিন্দুদিগের ইতিহাস সাহিত্য ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, সেই সময়ে ৩২০০০ অক্ষর নকল করাইতে বার আনা বা এক টাকা দিতে হইত। তাঁহার মতে এই হারে মহাভারতের মত বিশাল গ্রন্থের পুথি নকল করাইতে প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই হার বাড়িয়া চতুর্গুণ হইয়াছিল। এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল-এর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উক্তি হইতে জানা যায় যে, তখন এই হার ছিল হাজার শ্লোক প্রতি চার টাকা।

পুথির মধ্যে এই সম্পর্কে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়, এইবার তাহার কিছু কিছু উল্লিখিত হইতেছে।

১১৫৯ বঙ্গাব্দে নকল-করা কৃষ্ণরামদাসের কালিকামঙ্গলের লিপিকর আত্মারাম ঘোষ লিখিয়াছেন ঃ—

> ইহার দক্ষিণা ১ জোড় কাপড় আর ২ তঙ্কা। (সোসাইটি ৯।৫২২)

১১২৪ বঙ্গাব্দে নকল-করা মহাভারতের লিপিকরের উক্তি ঃ—

> ইহার দক্ষিণা সমাণ্যতা ক্রমে অন্নসত্রে পরিপাল্য হৈয়া সশ্রদ্ধ্যা হইয়া পুস্তক লেখিয়া দিলাম নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তার পর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবার আগ্যা হইল।

(সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—৪৬৫ পৃঃ, পাদটীকা ৪)

লিপিকর দর্পনারায়ণ দাস মজুমদার ১১৩৫ সালে (রাজড়া সন ১১৩৫ সাল,

মন্দারণ সন ১২৩৬ সাল) চারিকাণ্ড রামায়ণ লিখিয়া কিরূপ পুরস্কার পাইয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লঙ্কাকাণ্ডের পুথির শেষে পাওয়া যায়। দর্পনারায়ণ লিখিতেছেন :—

সেই মত আনন্দেতে রাখ গুরুচরণ দাসে।
কোন প্রকারে পুস্তক লইলে আমার পাশে ॥
দাসবাবু আমাকে দিলেন সাত টাকা।
সেই মত দাসের পাপ খণ্ডাহ প্রভু একা ॥
পুস্তক লেখাইয়া আমার কৈলেন উপগার।
অনেক জঞ্জালে ত্রাণ করিলে বাবু কর্মকার ॥
কর্মকার বাবুরে রাম তুমি কর দয়া।
পুস্তকসাঙ্গতে বাবু দিবেন বস্ত্র মোয়া ॥
আমাকে গামছা দিবেন বহুবাদ ঘুষি।
অতএব রাম দয়া কর সগোষ্ঠী পরিবারে আসি ॥
বালিট্যা গ্রামবাসী আমি জাতি যে কায়স্থ।
চারি কাণ্ড রামায়ণ লিখিলাম সমস্ত ॥

—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্তরঞ্জন-সংগ্রহ, পুথিসংখ্যা ৩০৩।

পুথির মূল্য সম্বন্ধে ওআর্ডের লেখা হইতে জানা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এক খণ্ড অমরকোষ বা মুগ্ধবোধের পুথির দাম ছিল তিন টাকা। ১৮১২ সালে পূজারি গোস্বামীর গীতগোবিন্দটীকার এক খণ্ড পুথি দশ আনায় বিক্রীত হইয়াছিল, এ কথা পুথিতেই লিপিবদ্ধ আছে (সোসাইটি ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪)। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নিম্ননির্দিষ্ট পুথিগুলি পার্শ্বোক্ত মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন [১] :—

কাব্যাদর্শ (২০০০ শ্লোক)···	১।০
কবিবল্লভ চক্রবর্তীর মাঘটীকা···	৫৲
নাগেশ ভট্টের রসমঞ্জরীপ্রকাশ (৯০০ অক্ষর)··	॥০
মল্লিনাথের কিরাতটীকা ··	২॥০

১। মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রচারের ফলে পুথির চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় পুথিগুলি অপেক্ষাকৃত কম মূল্যেই পাইয়াছিলেন দেখা যাইতেছে। পুথিগুলি বর্তমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের বিদ্যাসাগর-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে দুইখানিতে নকল করাইবার খরচেরও উল্লেখ আছে। মাঘটীকার পুথি ১২১৮ বঙ্গাব্দে পনর টাকায় নকল করান হইয়াছিল। আর ১৭৩৬ শকাব্দে কিরাতটীকার জন্য ব্যয় হইয়াছিল সাত টাকা।

১২১৮ বঙ্গাব্দে লিপীকৃত কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ রামায়ণ পাচ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল—বিক্রয়ের সময় অবশ্য জানা নাই। পুথির প্রথম পত্রে এ বিষয়ে এইরূপ লেখা আছে :—

শ্রীউমাকান্ত চৌধুরী বিক্রদার খড়িদ শ্রীগকুলচন্দ্র সিল। মূল্য ৫ পাঁচ টাকা মাত্র। সাং বরকামত গ্রামাৎ। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫৭৪-সংখ্যক পুথি)।

লেখক বা মালিক হিসাবে পুথির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। পুথি-নকলের কারণ সাধারণতঃ পুণ্যার্জনের লালসা। পাণ্ডিত্যানুরাগই পুথিসংগ্রহের মুখ্য কারণ। তবে ধনী ব্যক্তিরা অন্য পাঁচটা জিনিসের মত পুথি সংগ্রহ করিয়াও তৃপ্তি পাইতেন। একজনের সংগৃহীত সকল পুথিই যে বর্তমানে একই স্থানে আছে, এমন নয়—অনেক স্থলে এগুলি নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন পুথির সন্ধান করিয়া যেমন একজনের গ্রন্থকারের পূর্ণ পরিচয় সংকলিত হয়, সেইরূপ ভাবে এক এক জন সংগ্রহকর্তার সংগ্রহেরও বিস্তৃত বিবরণ সংকলিত হইতে পারে এবং অনেক অজ্ঞাত পুথিশালার সন্ধান মিলিতে পারে। বিশিষ্ট পণ্ডিত সর্ববিদ্যানিধান কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতীর পুথিশালার কতকগুলি পুথির একটি তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে। বিভিন্ন পুথিশালা সযত্নে অনুসন্ধান করিলে তাঁহার পুথিগুলির হদিশ মিলিতে পারে। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পুথিশালায় আমরা কবীন্দ্রাচার্যের নামমুদ্রাঙ্কিত কয়েকখানি পুথি দেখিয়াছি।[২] নেপালের যুবরাজ বাহাদুর সাহের জন্য ১৭১১ শকাব্দে লিখিত একখানি পুথি ও রণোদ্যোত সাহের আদেশক্রমে ১৮৭৭ বিক্রমাব্দে লিখিত আর একখানি পুথি এসিয়াটিক সোসাইটির পুথিশালায় আছে (সোসাইটি ৮।৬৬৩৪,৬৩০৮)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় বিষ্ণুপুররাজ চৈতন্য সিংহের একখানি, গোপাল সিংহদেবের রাণীর একখানি এবং মহারাণী আনন্দকুমারীর জন্য লিখিত দুইখানি পুথি আছে (২৩৮, ২৬২, ১৩৬, ১৩৭)। মুসলমান নরপতিদের মধ্যেও কেহ কেহ পুথি সংগ্রহ করিতেন এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের

২। বৃহতী (III B. 125), ঋগ্বেদসায়ণভাষ্য [৭৮৯—১ (১)], বাশিষ্ঠলিঙ্গপুরাণ (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মসংগ্রহ ১৭৩৪)। প্রকাশিত কবীন্দ্রাচার্যগ্রন্থসূচীতে বৃহতীর কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া, কামসূত্রের একখানি পুথি (৩১৩) বিদ্যানিধানের পুথির নকল বলিয়া মনে হয়।

সংগৃহীত কোন পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। বিভিন্ন প্রান্তের ভূম্যধিকারীদের মধ্যেও কেহ কেহ পুঁথি লেখাইয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। মেদিনীপুরের মহারাজ রাজনারায়ণের লেখান কয়েকখানি পুথি মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদে দেখিয়াছিলাম (সাহিত্য পরিষৎপত্রিকা, ৫৮।১৭—১৮)।

পুথির লিখন-পঠন রমণীসমাজেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহদেবের পত্নী ধ্বজামণি পট্টমহাদেবীর স্বহস্তলিখিত প্রেমবিলাসের একখানি পুথি আছে (২৬২)। মহিলাদের পাঠের জন্য লিখিত পুথি সংস্কৃত ও প্রাদেশিক উভয় ভাষাতেই বিস্তর পাওয়া যায়। জয়ন্তী দেবীর পাঠের জন্য লিখিত শঙ্করাচার্যের 'সৌন্দর্যলহরী'র একখানি পুথি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটিতে আছে (সোসাইটি ৮।৬৬৮২)। রমণীদের পাঠার্থে লিখিত বহু জৈনগ্রন্থের উল্লেখ প্রশস্তিসংগ্রহে পাওয়া যায় (২।পৃঃ ১২৭, ১০২, ১৩৪, ১৪২ প্রভৃতি)। মহারাণী আনন্দকুমারীর জন্য লিখিত দুইখানি পুথির কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, আধুনিকপূর্ব যুগেও মহিলাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলনের একান্ত অভাব ছিল না। সাধারণ লেখা-পড়া যে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অল্পবিস্তর প্রচলিত ছিল, তাহার সাক্ষী রামনারায়ণ ধুপী-লিখিত রামায়ণের অযোধ্যা হইতে উত্তরাকাণ্ডের পুথি (পরিষৎ ১৫১), শ্রীসাহ মহম্মদ-লিখিত রামায়ণ সুন্দরকাণ্ডের পুথি (পরিষৎ ৫২), শ্রীকাতিক নাইর জন্য বা তৎকর্তৃক লিখিত 'চৈতন্যমঙ্গল' (পরিষৎ ২২৪), শ্রীচন্দ্রনারায়ণ পুণ্ডরির 'জগন্নাথবিজয়' (২৮৩), গোবর্ধন জুগীর 'চৈতন্যমঙ্গল' (২২০) ও শ্রীটোকানি জুগীর 'ভ্রমরগীতা' (২৯১) প্রভৃতি পুথি।

অনেক পুথির শেষে সুন্দর সুন্দর কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে আছে লিপিকরদের ত্রুটি স্বীকার, পুথির দীর্ঘজীবন কামনা ও ইহার সংরক্ষণের আবেদন, পুথি-অপহরণকারীর প্রতি অভিশাপ-বর্ষণ, এবং লেখক পাঠক মালিক সকলের মঙ্গলকামনা। ইহাদের রচয়িতা বা রচনার কাল সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারা যায় না। তবে কয়েক শত বৎসরের প্রাচীন পুথিতেও এগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন প্রান্তের পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এগুলি প্রাচীনতর হওয়া সম্ভব। সুপরিচিত 'যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তিদোষকঃ' ইত্যাদি

কবিতাটি একাদশ শতাব্দীর একখানি পুথিতে পাওয়া যায় (সোসাইটি ৮।৬১১০)। 'লেখকো নাস্তিদোষকঃ' এই অংশটি পুরুষোত্তম দেবের (আনুমানিক দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর) ভাষাবৃত্তি গ্রন্থে (২.২.২৪) উদ্ধৃত হইয়াছে। 'প্রশস্তিসংগ্রহে' উল্লিখিত দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর একাধিক গ্রন্থে কতকগুলি কবিতা পাওয়া যায় (১।৪, ১৪, ১৫, ১৭, ২৩, ৯২, ১১১, ১৫৪ প্রভৃতি)। বাংলা পুথিতে ইহাদের অনেকগুলি বিকৃত রূপে বা অনূদিত আকারে স্থান পাইয়াছে। কিছু কিছু নূতন নূতন অভিশাপ বা দিব্যও ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। কবিতাসরস্বতীর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া গদ্যের মারফতও 'দিব্য'-বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। সংস্কৃতে একখানি দ্বাদশ শতাব্দীর পুথিতে পুথিরক্ষার একটি আবেদন গদ্যে নিবদ্ধ হইয়াছে (সোসাইটি ৩।১৯২৪)।

বর্তমান প্রবন্ধে নিদর্শনস্বরূপে কয়েকটি বহুলব্যবহৃত উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে। ইহাদের ব্যাপক সংগ্রহ ও সমালোচনা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়।

লিপিকরের ত্রুটি স্বীকার :—

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তিদোষকঃ।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥ (সোসাইটি ৮।৬১১০)

যাদৃশং পুস্তকে দৃষ্টং তাদৃশং লিখিতং ময়া।
যদি শুদ্ধমশুদ্ধং বা মম দোষো ন দীয়তে॥
(প্রশস্তিসংগ্রহ ১।১৭, ১৮, ২০, ২২, ৯২, ১১১)।

অদৃষ্টদোষাৎ স্মৃতিবিভ্রমাদ্ বা
যদর্থহীনং লিখিতং ময়াত্র।
তৎ সর্বমার্যৈঃ পরিশোধনীয়ং
কোপো ন কার্যঃ খলু লেখকায়॥
(প্রশস্তিসংগ্রহ ২।৫২৫, ১২৬১, তাঞ্জোর বিবরণ ১ পৃ. ২২, ৪ পৃ. ২৩৬৮)

জথা দিষ্ট তথা লিখিত কহেন দ্বিজবর।
দোষগুণ না লইবেন ঘাইট বা জীত অক্ষর॥
(পরিষৎ-পুথি, ২২৯)

লিখিলাম পোথা দোষ ক্ষেমিবে আমার।
মনীনাঞ্চ মতিভ্রম আমি কোন ছাড়॥ (পরিষৎ-পুথি—৭০)

ভিম যাদি জুর্দ্দ নানা রোনে হয় ভঙ্গ।
মুনিগণের ভ্রম হয় আমি কি পতঙ্গ॥ (পরিষৎ-পুথি—২৮৫)
শাস্ত্র অধিকারী দেবী সরস্বতী মাতা।
তথাপি তাহার বিচলিত হয় কথা॥
মহাবল হয় দেখ হস্তী মহাশয়।
তথাপি তাহার পদ বিচলিত হয়॥
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথির বিবরণ—৩খ, পৃঃ ৬৫৪-৫৫)।
লিখনের নাঞি দোষ এই ত বিচারি।
কদাচিৎ তায় যদি হয় ভুল ভ্রান্তি।
ভীমের সমরে ভঙ্গ মুনিভ্রমে মতি॥
শশীর সন্ধান তাহে অমর মিলন।
এত দূরে এই পুথি হইল লিখন॥
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—৫৫২-সংখ্যক পুথি)।

অপরহরণকারীর তিরস্কার :—

যত্নেন লিখিতং চেদং যশ্চোবয়তি পুস্তকম্।
শূকরী তস্য মাতা চ পিতা তস্য চ গর্দভঃ॥
(সোসাইটির পুথি-সংখ্যা ৫২০৪)
পুস্তকং হবতে যস্ত কাণো দুঃখী ভবেন্নরঃ।
মৃতঃ স্বর্গং ন গচ্ছেত্তু পিতবং নরকং নয়েৎ॥
(কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথিব বিববণ,৫।৭৬)
অর্জিতং ভূরিকষ্টেন পুস্তকং যচ্চ মেঽনঘ।
হর্তুমিচ্ছতি যঃ পাপী তস্য বংশক্ষয়ো ভবেৎ॥
(তাঞ্জোর বিবরণ, ১৮।১৪৫৮৫, সোসাইটি, ৮।৬০৬২)
আত্মনো হ্যপকারায়োপকারায় পরস্য চ।
ইদং হরতি যো মূঢ়স্তস্য তাতঃ পশুর্ধ্রুবম্॥
(সোসাইটি, ৭।৪৯৭৫)
চৌর্যেণ নীত্বা বিষমেব ভুক্ত্বা।
পিত্রা চ গৃধ্রং সহ নারকী স্যাৎ॥ (সোসাইটি, ৭।৫৫৮৯)
দুক্ষে লিখিতং পুস্তকং চোরে নিয়তং জদি মাতা গাধিং পিতা স্থকরং জর্মে জর্মে
(পরিষৎ-পুথি—১৭২)

এই পুস্তক যে বেক্তি চুরি করিবে সে সাসুরে হইবেক য়ার পুত্রবধূকে হরণ করিবে (পরিষৎ-পুথি—২৮৫)।

এই গ্রন্থ জে জানিবার স্বরূপ চুরি করিআ রাখিবেক সেই মহাপাপের পাতকি। সে বিয়ান্ধঁা হইবেক (পরিষৎ-পুথি—৩৩১)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথির বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের ৬৬৭-সংখ্যক পুথির বিবরণেও অনুরূপ উক্তি লক্ষণীয়।

এ পুস্তক যে হরিবেক তাহাকে গোব্রাহ্মণ বধ লাগিবেক।
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথির বিবরণ—৩।৫৫২)।

চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও এই জাতীয় 'দিব্য' বাঙ্গালীর মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। মনে পড়ে, আমরা বাল্যকালে আমাদের ছাপা বইয়েও কিছু কিছু লিখিয়া রাখিতাম। এখনও আধুনিক ধরনের দুচারটি ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়। ইংরাজিতেও বই সম্বন্ধে নানারূপ ছড়ার প্রচলন আছে বা ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে Wilson Bulletin for Books নামক পত্রে কয়েকটি ছড়া বা Books Rhyme সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তুলনার জন্য আমি এখানে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

Steal not this book, my honest friend
For fear the gallows should be your end.
And when you die the Lord will say
And where's that book you stole away ?
Look ye, my friend,
If this book I lend,
Be sure to return,
Or in hell you will burn.
Remember, Book, my cozy shelves
From which my friends help themselves.
And like a dove with wings unloosed
Return, come back, fly home to roost.

পুথির সংরক্ষণ ও দীর্ঘজীবন-কামনা :—

ভগ্নপৃষ্ঠকটিগ্রীবং স্তব্ধদৃষ্টিরধোমুখম্ ।
কষ্টেন লিখিতং গ্রন্থং যত্নেন প্রতিপালয় ॥
(সোসাইটি, ৮।৬১১৪, প্রশস্তিসংগ্রহ, ১।১১১, ২।৬৬৬) ।

উদকানলচৌরেভ্যো মূষকেভ্যস্তথৈব চ ।
রক্ষণীয়া প্রযত্নেন যস্মাৎ কষ্টেন লিখ্যতে ॥
(প্রশস্তিসংগ্রহ, ১।১০৮, ১৪২)

তৈলাদ্ রক্ষেজ্জলাদ্ রক্ষেদ্ রক্ষেচ্ছিথিলবন্ধনাৎ ।
মূর্খহস্তে ন দাতব্যমেবং বদতি পুস্তকম্ ॥
(প্রশস্তিসংগ্রহ, ২।১৫৪, ২০০, ৬৩৭, ৬৬৬, ৭৪০)

যাবল্লবণসমুদ্রো যাবন্নক্ষত্রমণ্ডিতো মেরুঃ ।
যাবচ্চন্দ্রাদিত্যৌ তাবদিদং পুস্তকং জয়তু ॥
(সোসাইটি, ৮।৬১৪০, প্রশস্তিসংগ্রহ, ২।১০৮২)

মঙ্গলপ্রার্থনা :—

শ্রীরস্তু সর্বজগতাং শ্রীরস্তু লেখকে ময়ি ।
শ্রীরস্তু লিখিতং যস্য তস্য কৃষ্ণপ্রসাদতঃ ॥
(সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা—৩৪।১৬২-৩)

মঙ্গলং লেখকানাং চ পাঠকানাং চ মঙ্গলম্ ।
মঙ্গলং সর্বলোকানাং ভূমিভূপতিমঙ্গলম্ ॥
(প্রশস্তিসংগ্রহ, ২।১১১৮, ১১৩৭, ১২২৮, ১২ ৫) ।

সেকালে পণ্ডিতের আদর

দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ এবং বিস্তৃতিসাধন অনেক পরিমাণে নির্ভর করে দেশের বৈষয়িক সম্প্রদায়ের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার উপর। দেশের মধ্যে যাঁহারা সম্পন্ন তাঁহাদের আন্তরিক উৎসাহ ও সাহায্য পাইলে তবেই দেশের পণ্ডিতসমাজ নিশ্চিন্তমনে ও সাগ্রহে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় মনোনিবেশ করিতে পারেন। এক দিকে উদরান্নসংস্থানের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা এবং অন্য দিকে দেশের জনসাধারণের—বিশেষ করিয়া বৈষয়িক সমাজের অবজ্ঞা, 'উপেক্ষা বা অনুগ্রহদৃষ্টিপাত—এই উভয়ের মধ্যে পড়িয়া যেখানে শিক্ষিত সমাজকে অশান্ত ও অস্থির হইয়া উঠিতে হয় সেখানে প্রকৃত পাণ্ডিত্যের আশা খুবই কম। বড়ই দুর্ভাগ্য ও দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে বর্তমান কালে প্রাচীন ধরনের পণ্ডিতমণ্ডলীর অবস্থা অনেকটা এইরূপ—তাই প্রকৃত পাণ্ডিত্যলাভের আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আগ্রহ আজ অনেক বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

অথচ অনতিপ্রাচীন কালেও এই দেশে জনসাধারণের মধ্যে পণ্ডিতের যেরূপ সম্মান ছিল তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়—অনেক সময় সেই সম্মানের বিবরণ পড়িতে পড়িতে উপকথা বলিয়া সন্দেহ হয়। প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থ তখন নানা উপায়ে দেশের শিক্ষার উন্নতিকল্পে সাহায্য করিতেন। দ্বারপণ্ডিত ও সভাপণ্ডিত প্রত্যেক ভূস্বামীর পাণ্ডিত্যপ্রিয়তার সাক্ষ্য দিত। পূজাপার্বণ ও বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষ্যে পণ্ডিত-বিদায়ের প্রথা এবং এই প্রসঙ্গে সমবেত পণ্ডিতবর্গের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিচারের দ্বারা পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষাপকর্ষ-নির্ণয় ও বিশিষ্ট পণ্ডিতের বিশিষ্ট সম্মান-প্রদর্শনের রীতি পণ্ডিত-গণকে উৎসাহিত করিত—দেশমধ্যে পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষসাধনের সহায়তা করিত। অনেক সমর্থ গৃহস্থ পণ্ডিতদিগের বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া বা নিজব্যয়ে চতুষ্পাঠী-পরিচালনের বন্দোবস্ত করিয়া দেশে পাণ্ডিত্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। বৈষয়িক সমাজ এইরূপ কার্যকে অন্যতম অপরিহার্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। ফলে কালোচিত পাণ্ডিত্যপ্রবাহ দেশে অব্যাহত থাকিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে—

"আমাদের যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত

নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মত বহিয়া গেল, তবু আমাদের সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের আম-কাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণীখনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভঙ্করী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডী-মণ্ডপে রামায়ণ-পাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত।"

এ দেশে পণ্ডিতগণের কিরূপ আদর ও সম্মান ছিল প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে তাহার আংশিক পরিচয় বর্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত হইবে।

প্রসিদ্ধ কবি রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা' নামক গ্রন্থের 'রাজচর্যা'-প্রকরণে পণ্ডিতবর্গের উৎসাহ ও সাহায্য-দান সম্বন্ধে রাজার কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—রাজাকে কবিসমাজ বা কবিসভা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, কাব্যপরীক্ষার জন্য সভা স্থাপন করিতে হইবে। এইজন্য নির্মিত বিস্তৃত সভাগৃহে কবি বেদবিৎ পৌরাণিক স্মার্ত ভিষক্ জ্যোতিষী ও শিল্পী প্রভৃতির জন্য স্থান নির্দিষ্ট থাকিবে। এই সভার যাঁহারা সভ্য অর্থাৎ দেশের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্ এবং শিক্ষিত তাঁহাদিগকে (মধুর উৎসাহপূর্ণ বাক্যে) তুষ্ট এবং (অর্থাদি সাহায্যদ্বারা) পুষ্ট করিতে হইবে—উপযুক্ত পাত্রে পারিতোষিক প্রদান করিতে হইবে—উৎকৃষ্ট কবি ও তাঁহার কাব্যের যথোপযুক্ত সম্মান করিতে হইবে। অন্য দেশ হইতে সমাগত বিদ্বান্‌দিগের সহিত রাজা নিজে অথবা কর্মচারীদিগের মারফত আলাপ-পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা করিবেন এবং যতদিন তাঁহারা সেই রাজার শাসিত দেশে অবস্থান করেন ততদিন তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ বৃত্তিকামী অর্থাৎ সাহায্যপ্রার্থী হন তাহা হইলে তাঁহাকে সেই দেশেই অধিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কারণ রাজা সমুদ্র-সদৃশ—সমুদ্র যেরূপ রত্নের আকর রাজাও সেইরূপ পুরুষরত্নের একমাত্র আশ্রয়স্থল।[১] রাজা এইরূপ আচরণ করিলে রাজার যাহারা উপজীবী সেই সামন্ত প্রভৃতিও রাজার অনুকরণ করিবে এবং পণ্ডিতপালন-ব্রতে ব্রতী হইবে। মহানগরে কাব্যশাস্ত্র-পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং সেই পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদিগকে ব্রহ্মরথে চড়াইতে হইবে ও মাথায় পাগড়ি পরাইয়া দিতে হইবে।

১। কোন কোন মুসলমান রাজাও নানা দেশ হইতে পণ্ডিত আনাইয়া নিজেদের রাজ্য সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন—তাহার উল্লেখ 'সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা' প্রবন্ধে করা হইয়াছে।

রাজশেখরের এই সকল উক্তি কেবল মতবাদমাত্র কিংবা ভিত্তিহীন আশামাত্র নহে। তাঁহার কথাগুলি প্রায়শই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজগণের আচরণ-অবলম্বনে উপনিবদ্ধ। তাঁহার লেখা হইতেই জানা যায় যে বাসুদেব, সাতবাহন, শূদ্রক, সাহসাঙ্ক[২] প্রভৃতি রাজা পণ্ডিতদিগকে প্রচুর পরিমাণে দান ও সম্মান করিতেন; বস্তুতঃ, এ বিষয়ে তাঁহারা ছিলেন অন্য রাজাদিগের আদর্শ। শাস্ত্রীয় পরীক্ষাও তাঁহার উদ্‌ভাবিত নূতন জিনিস নহে। তাই তিনি লিখিয়াছেন, উজ্জয়িনী নগরীতে কাব্যকার বা কবিদিগের পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কালিদাস, মেণ্ঠ, অমর, রূপ, সূর, ভারবি, হরিচন্দ্র ও চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি অধুনা প্রখ্যাত এবং অপ্রখ্যাত কবিগণ এখানেই পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, অতি প্রাচীনকালে পাটলিপুত্রে শাস্ত্রকারগণের পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এখানে বর্ষ, উপবর্ষ, পাণিনি, পিঙ্গল, ব্যাড়ি, বররুচি ও পতঞ্জলি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পরীক্ষিত হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

রাজারা পণ্ডিতগণকে যেরূপ সম্মান ও অর্থসাহায্য করিতেন তাহার কোনও বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত রাজশেখর দেন নাই। এবিষয়ের কতকগুলি বিবরণ নানা প্রাচীন পুস্তকে পাওয়া যায়।

প্রাচীন তাম্রশাসনে মাতাপিতা ও নিজের পুণ্যযশোভিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের ধর্ম্মকৃত্য-সম্পাদনার্থ রাজাদিগের ভূমিদানের যে উল্লেখ দেখা যায় তাহাতে মনে হয়, শাস্ত্ররক্ষা ও শাস্ত্রালোচনার সৌকর্যবিধান এবং পাণ্ডিত্যের সম্মানপ্রদর্শন এই দানের অন্ততঃ গৌণ উদ্দেশ্য ছিল।

ময়ূরভট্ট-রচিত 'সূর্যশতক' নামক প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থের বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে-কৃত টীকা[৩] হইতে জানা যায় যে মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষ নিজ প্রাসাদ-সমীপে নির্মিত সুন্দর দুই গৃহে সপরিবার বাণভট্ট ও ময়ূরভট্টের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন এবং ময়ূরভট্টের সূর্যশতক-পাঠে নিরতিশয় প্রীত হইয়া

২। এই সাহসাঙ্কই নবরত্নের আশ্রয়দাতা বিক্রমাদিত্য। পণ্ডিতের আশ্রয়দাতা-হিসাবে বিক্রমাদিত্যের নাম সর্বজনবিদিত। বিক্রমাদিত্য এই নাম যেন পণ্ডিতের আশ্রয়দাতারই প্রতিশব্দরূপে পরিণত হইয়াছে। পরবর্তী যুগেও কোন কোন রাজা তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেন। তাঁহারই অনুকরণে বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেন তাঁহার সভায় পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

৩। এই টীকার একখানি পুথি এসিয়াটিক সোসাইটির গভর্ণমেণ্ট-সংগ্রহে আছে।

তাঁহাকে গজ অশ্ব রথ গ্রাম বসন আভরণ দোলা[৪] এবং ধনরত্নাদি দান করিয়াছিলেন। বৈদ্যনাথের এই উক্তির ঐতিহাসিক সত্যতা কতদূর তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার সমসময়ে কি অনতিপূর্বে রাজা ও ভূস্বামিগণ পণ্ডিতদের সম্বন্ধে এইরূপই ব্যবহার করিতেন এবং সেই দৃষ্টান্তেই বৈদ্যনাথ এই বিবরণ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

রাজা দশরথের বীরত্বে প্রীত হইয়া স্বয়ং ইন্দ্র তাঁহাকে নিজ আসনের অংশ গ্রহণ করিবার গৌরব প্রদান করিয়াছিলেন ভট্টিকাব্যে একথা উল্লিখিত হইয়াছে।

'পবনদূত' নামে দূতকাব্যের রচয়িতা ধোয়ী কবি সেনবংশীয় লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ ছিলেন। তিনি তাঁহার পবনদূতের উপসংহারে লিখিয়াছেন[৫]—তিনি গৌড়েশ্বর [লক্ষ্মণসেনের] নিকট হইতে দন্তিব্যূহ, স্বর্ণনির্মিত চামর এবং স্বর্ণদণ্ড লাভ করিয়াছিলেন। নৈষধচরিতকার শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জের রাজার নিকট হইতে তাম্বুলদ্বয় এবং আসনলাভ-রূপ উৎকৃষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৬] ভোজরাজ নূতন কবিতা শুনিয়া এরূপ তৃপ্ত হইতেন যে কবিকে অনেক সময় কবিতার প্রতি অক্ষরের জন্য লক্ষ মুদ্রা দান করিতেন—ভোজরাজ সম্বন্ধে ভোজপ্রবন্ধ-কারের এই উক্তি অতিশয়োক্তিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু একেবারে অলীক নহে। ভোজরাজের পাণ্ডিত্যানুরাগ ও বদান্যতার ফলে তাঁহার সভায় নানা-দেশীয় পণ্ডিত সমবেত হইতেন একথা মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রসিদ্ধ স্মার্ত ও নানাবিধ কাব্যাদির টীকাকার বৃহস্পতি রায়মুকুট 'গৌড়াবনীবাসব' জলালউদ্দীনের নিকট হইতে ছয়টি উপাধি পাইয়াছিলেন। 'রায়মুকুট' উপাধিদানের সময় বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে 'তাঁহাকে হাতীর উপর চড়াইয়া নানাবিধ বৈধ স্নান করান হইয়াছিল। তাঁহাকে একগাছি হার দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতে অনেক

৪। প্রাচীন ভারতের সৌখীন সমাজে দোলার ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত ছিল। গুজরাট-অঞ্চলে এখনও ইহার প্রচলন দেখা যায়। রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে কবির গৃহের যে সাজসজ্জার বর্ণনা দিয়াছেন তাহার মধ্যেও দোলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। দন্তিব্যূহং কনককলিতং চামরং হৈমদণ্ডং
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্তী। (১০১ শ্লোক)

৬। তাম্বুলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ—
—নৈষধচরিতের শেষ শ্লোক।

হীরামাণিক লাগান ছিল; তাহাতে তাহা ঝলমল করিতেছিল। তাঁহাকে যে কুণ্ডল দেওয়া হইয়াছিল—তাহাও ঝকঝক করিত। দুই হাতে 'রতনচূর' দেওয়া হইয়াছিল; দশ আঙুলে দশটি আঙটি ছিল এবং তাহাতে হীরা লাগান ছিল। দুইটি ছাতা দেওয়া হইয়াছিল, অনেকগুলি ঘোড়াও দেওয়া হইয়াছিল।[৭]

শাস্ত্রের ও পাণ্ডিত্যের প্রতি উড়িষ্যার মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। 'ভক্তিবৈভব' নামক নাটকের রচয়িতা কবিডিণ্ডিম রাজগুরু জীবদেব মহারাজের নিকট হইতে আটটি স্বর্ণচামর, স্বর্ণছত্র ও ডিণ্ডিম উপহার পাইয়াছিলেন।[৮] ইহা জীবদেবের নিজের কথা—তিনি ভক্তিবৈভব নাটকের প্রস্তাবনায় এইরূপ লিখিয়াছেন। মনে হয়, তিনি বিশিষ্ট সম্মানজনক উপহার-গুলির কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কবি এবং রাজগুরু হিসাবে তিনি হয়ত রাজার এবং অন্যান্য সম্পন্ন গৃহস্থের নিকট হইতে সাধারণ সাহায্যলাভে বঞ্চিত হন নাই।

এই সেদিনকার কৃষ্ণনগরাধিপতি প্রসিদ্ধ জমিদার কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বাংলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসম্প্রদায়ের লীলানিকেতন হইয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি কিরূপ আগ্রহান্বিত ছিলেন বুনো রামনাথের প্রতি তাঁহার ব্যবহারের সর্ব্বজনবিদিত কাহিনী তাহার প্রমাণ। সম্পন্ন গৃহস্থ ও জমিদারদিগের ব্যয়ে পরিচালিত একাধিক চতুষ্পাঠী বর্তমানকাল পর্যন্ত সেই প্রাচীন ধারা অনেকটা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে। তবে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় যে বর্তমানে এই সমস্ত ব্যাপারে আন্তরিকতার অভাব এবং তাহার স্থলে নিছক নিয়মরক্ষার ভাব অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই এই ধারা বর্তমান থাকিলেও পণ্ডিতদিগের অবস্থা এখন আর পূর্বের মত সচ্ছল নহে। অনতিপ্রাচীন কালেও কিন্তু রাজারাজড়াদের নিকট হইতে নানা অবসরে

৭। বৃহস্পতি রায়মুকুট-কৃত অমরকোষের পদচন্দ্রিকানাম্নী টীকার ভূমিকা দ্রষ্টব্য। এই টীকার পুথি ইণ্ডিয়া অফিস্ লাইব্রেরিতে আছে এবং তাহার বিবরণ ঐ লাইব্রেরির ক্যাটালগের দ্বিতীয় খণ্ডের ৯৫৪-৫৬ সংখ্যক পুথির বিবরণ-মধ্যে আছে। ঐ বিবরণ-অবলম্বনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপরিলিখিত বর্ণনা দিয়াছিলেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৮শ খণ্ড, পৃ ৬০)।

৮। অষ্টৌ হাটকচামরাণি কনকচ্ছত্রং তমড্ডিণ্ডিমং
যো লব্ধা প্রথিতপ্রতাপবিভবশ্রীরুদ্রদেবেশ্বরাৎ।
ভক্তিবৈভব নাটকের একখানি পুথি এসিয়াটিক সোসাইটীর গভর্নমেণ্ট সংগ্রহে আছে।

প্রচুর ও মূল্যবান্ উপহার পাওয়ার ফলে লক্ষ্মী-সরস্বতীর চিরবিরোধ সত্ত্বেও দেশের পণ্ডিতসম্প্রদায়ের অবস্থা তেমন মন্দ হওয়া দূরে থাকুক—অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ সচ্ছলই ছিল। প্রাচীন ভারতের 'কুলপতি'গণ দশ সহস্র ছাত্রের আহারবাসস্থান জোগাইতেন; ইহা হইতে তাঁহাদের সম্পন্ন অবস্থার অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসার কবিচর্যা-প্রকরণে কবির দৈনন্দিন চর্যার যে বিবরণ দিয়াছেন অভাবের গুরুভারে ক্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে। তাঁহার বর্ণিত কবির গৃহ ও সাজসজ্জা আধুনিক যুগের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ও অনশনক্লিষ্ট সাহিত্যিকের কল্পনার বাহিরে। ইহা কি সে-যুগের পণ্ডিতসম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার ইঙ্গিত প্রদান করে না?
